

ডিসেণ্ট অফ ম্যান

যৌন নির্বাচন

দ্বিতীয় খণ্ড

চার্লস ডারউইন

DESCENT OF MAN
(Sexual Selection)
Part II
CHARLES R. DARWIN

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩০৪

প্রকাশক ॥ দীপায়ন ॥ বেণুকা সাহা ॥ ২০ কেশব সেন স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০০৯
মুদ্রাকর ॥ দি নিনউ মডেল প্রিন্টার্স ॥ ৪/১ই বিডন রো ॥ কলিকাতা ৭০০০০৬
প্রচ্ছদপট ॥ সন্দীপন ভট্টাচার্য

পঞ্চাশ টাকা

ডিসেণ্ট অফ ম্যান

মৌন নিৰ্বাচন

দ্বিতীয় খণ্ড

চাৰ্লস ডাৱউইন

ভাষান্তৰ

অসীম চট্টোপাধ্যায়



দীপান্বন ॥ ২০ কেশব সেন ষ্ট্ৰীট ॥ কলিকাতা ৭০০ ০০১

প্রকাশিত অগ্ৰাণ্ণ বই

সুশোভন সরকার

বাংলার রেনেসাঁস

টেরী ইগলটন

মার্কসবাদ ও সাহিত্য-সমালোচনা

অমিয় রায়চৌধুরী

চার্লি চ্যাপলিন—জীবন ও সিনেমা

পল ল্যাফর্গ

সম্পত্তির বিবর্তন ॥ ধর্ম সমাজ ও দর্শন

রমেশচন্দ্র দত্ত

বাংলার কৃষকসমাজ ॥ প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস

(নিজ্যাস্ট্র অফ বেঙ্গল)

(সিভিলাইজেশন অফ এনাসিয়েন্ট ইন্ডিয়া)

লুইস হেনরী মর্গ্যান

এনসিয়েন্ট সোসাইটি (১ম ও ২য় খণ্ড)

এন. গোরচাকভ

স্তানিস্লাভ স্কীর নাট্য পরিচালনা (১ম ও ২য় খণ্ড)

গুরু দেড়শ বছরের রাজনৈতিক ছবির ইতিহাস ও দাঁলের সংকলন সত্তরটি আর্টগ্রেট সহ

ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি

(সম্পাদনা : সম্পাদন ভট্টাচার্য)

সন্তোষকুমার বসু

ভারতশিল্পে দেহজ শ্রম ও অগ্ৰাণ্ণ প্রবন্ধ

এ. সি. মুরহাউস (সম্পাদনা গড্ডন চাইল্ড)

লিখন ও বর্ণমালা

ভি. আই. লেনিন

উনিশশো পঁচের বিপ্লব

অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকে উনিবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালির

শিক্ষাচিন্তা সংগ্রহ ও আলোচনা ও মূল নথিপত্রাদি। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিতব্য ।

বাঙালির শিক্ষাচিন্তা (১ম খণ্ড ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত)

(সম্পাদনা : প্রবীর মূখোপাধ্যায়)

বিদ্যুৎ কুমার নাগ

শতবর্ষের আলোয় ফিল্মারপ্রিন্ট

বসুধা চক্রবর্তী

মানবতাবাদ

পিতামহ
ইরাসমাস ডারউইন

প্রকাশনা প্রসঙ্গে

চার্লস ডারউইনের 'ডিসেন্ট অফ ম্যান' বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ অবশেষে প্রকাশিত হল। এই বইয়ের প্রথম খণ্ডের বাংলা অনুবাদ পূর্বেই প্রকাশ করেছি আমরা। উভয় বাংলারই গুরু পাঠকসমাজের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে সে-বই। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের পর অতিক্রান্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি বছর। এই বছরগুলিতে উভয় বাংলার ডারউইন অনুরাগী পাঠকবৃন্দ বারবার আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন—দ্বিতীয় খণ্ডটি কবে প্রকাশিত হবে। মূল ইংরেজী বইটি সংগ্রহ করতে দেরি হওয়ার কারণে ও আমাদের নানান সমীক্ষামূলক জন্ম এতদিন দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশ করে উঠতে পারিনি। অবশেষে প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভবপর হল।

'ডিসেন্ট অফ ম্যান'-এর প্রথম খণ্ডের মতো এই দ্বিতীয় খণ্ডটিও আলোচনার দিক থেকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ। এই খণ্ডে ডারউইন আলোচনা করেছেন যৌন নির্বাচন নিয়ে। বিভিন্ন ধরনের পশু, পাখি, মাছ, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির জীবনে ও বিবর্তনে যৌন নির্বাচন কিভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, বিভিন্ন ধরনের প্রাণীদের শরীরে প্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহের পাশাপাশি অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী, এমনকি কীটপতঙ্গদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে প্রভাবিত করে চলে তাদের জীবনচক্র ও ক্রম-বিবর্তনকে—সবটুকুই আলোচনার পরিধির মধ্যে আনার চেষ্টা করেছেন ডারউইন। মানুষের প্রসঙ্গও মাঝেমাঝে এসেছে, তবে এই খণ্ডের মূল আলোচনা মানুষকে ঘিরে নয়।

'ডিসেন্ট অফ ম্যান'-এর তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদও খুব দ্রুতই প্রকাশের চেষ্টা করছি আমরা, এই খণ্ডে মানুষের বিষয়টা এসেছে। 'সেইসঙ্গেই ডারউইনের 'অরিজিন অফ স্পিসিস' এবং 'ইনসেক্টিভোরাস প্লান্টস' গ্রন্থ দুটির পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদও কিছুদিনের মধ্যেই পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারব বলে আশা করছি।

এই খণ্ডটির অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যাপারে নানাভাবেই সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধানুধ্যায়ী বন্ধুরা। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। সেইসঙ্গেই উল্লেখ করা দরকার উভয় বাংলার পরিচিত-অপরিচিত অসংখ্য পাঠক-পাঠিকাদের কথা, বাঁদের একান্তিক আগ্রহ ছাড়া এ-বই প্রকাশ করা সম্ভবপর হত না।

আগামী প্রকাশনা

চার্লস ডারউইন

ডিসেন্ট অফ ম্যান (তৃতীয় খণ্ড)

অরিজিন অফ স্পিসিস্ (দ্বিতীয় খণ্ড)

ইনসেক্টিভোরাস প্লান্টস



গর্ডন চাইল্ড

ম্যান মেকস হিমসেল্ফ

হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন হিস্টরি



সিগমুন্ড ফ্রয়েড

প্রসঙ্গ স্বপ্ন

স্বপ্ন-বিশ্লেষণ



হারবার্ট রিড

মিনিং অফ আর্ট

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

নোটবুকস

শিল্পকলা প্রসঙ্গে (১ম ও ২য় খণ্ড)

ব্রাউন্ড রাসেল

কেন আমি ধর্মে বিশ্বাসী নই

(Why I am not a Christian)



নাট্যচিন্তা নাট্যকলা

সারা বিশ্বের নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, নাট্যসমালোচকদের

নির্বাচিত প্রবন্ধাবলীর সংকলন ।



বের্টোল্ট ব্রেন্থট

নির্বাচিত রচনা (নাটকসংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী) [দ্বিতীয় খণ্ড]

বিষয়সূচি

অষ্টম পরিচ্ছেদ
যৌন নির্বাচনের নীতি ১

নবম পরিচ্ছেদ
নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ ৭৫

দশম পরিচ্ছেদ
কীটপতঙ্গদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ ৯৬

ডিসেন্ট অফ ম্যান

যৌন নির্বাচন



দ্বিতীয় খণ্ড

অষ্টম পরিচ্ছেদ যৌন নির্বাচনের নীতি

অপ্রধান যৌন প্রকৃতি—যৌন নির্বাচন—কাব্যপন্থা—পুরুষদের আঁমতাচার—বহুগামীতা—
যৌন নির্বাচন মারফত সাধারণত শুধু পুরুষরাই পরিবর্তিত হয়েছে—পুরুষদের ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা—
পুরুষদের পরিবর্তনশীলতা—নারীদের পছন্দ-অপছন্দ—প্রাকৃতিক নির্বাচনের সঙ্গে যৌন
নির্বাচনের তুলনা—জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, বছরের বিভিন্ন মরসুমে এবং যৌনতার দ্বারা
সীমাবদ্ধ বংশগতি—বংশগতির বিভিন্ন ধরনের মধ্যকার সম্পর্ক—যৌন নির্বাচন মারফত একটি
বিশেষ লিঙ্গের প্রাণীরা এবং অগণবরসীরা পরিবর্তিত হরান কেন—সমগ্র প্রাণিজগতে দুটি
লিঙ্গের আনুপাতিক সংখ্যা প্রসঙ্গে—প্রাকৃতিক নির্বাচনের আলোয় নারী-পুরুষের সংখ্যাগত
অনুপাত ।

যে-সব প্রাণীদের মধ্যে নারী-পুরুষ আলাদা আলাদাভাবে বিদ্যমান,
তাদের মধ্যে পুরুষদের জনন সংক্রান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর নারীদের জনন সংক্রান্ত
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের থেকে পৃথক ধরনের হয়ে থাকে । এগুলোই হচ্ছে
তাদের মূখ্য বা প্রাথমিক যৌন প্রকৃতি । কিন্তু হাণ্টার যেগুলোকে অপ্রধান
যৌন প্রকৃতি বলেছেন, যেগুলো জননপ্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত
নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মধ্যে প্রায়শই নানান পার্থক্য দেখা
যায় । যেমন, অল্পভূতির বা স্থানান্তরে গমনের জন্য পুরুষদের শরীরে এমন
কতকগুলো ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ থাকে যেগুলো নারীদের শরীরে থাকে না, অথবা
নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে এইসব ইন্দ্রিয় বা অঙ্গগুলো অনেক উন্নত
অবস্থায় থাকে যাতে করে প্রয়োজনের মুহূর্তে তারা নারীদের খুঁজে নিতে
পারে কিংবা তাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে । পুরুষদের শরীরে কোনও
কিছুকে আঁকড়ে ধরার উপযোগী কিছু বিশেষ অঙ্গও থাকে যেগুলোর সাহায্যে
তারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে নারীদের । এই শেষোক্ত অঙ্গগুলো বহু
ধরনের হয়ে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে প্রায় মূখ্য অঙ্গের সমপর্যায়ভূক্ত হয়ে ওঠে ।
অনেক সময় মূখ্য অঙ্গগুলোর থেকে এগুলোকে আলাদা করাও দুঃসাধ্য হয়ে
পড়ে । পুরুষ-পতঙ্গদের পেটের উপরের দিকে যে যৌগিক উপাদাগুলো থাকে,
সেগুলোর মধ্যে এর স্পষ্ট প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় । “মূখ্য” অভিধাটিকে
শুধুমাত্র জননসংক্রান্ত গ্রন্থির (gland) ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখলে আলাদা
কথা, কিন্তু তা নাহলে কোন্ অঙ্গগুলোকে মূখ্য আর কোন্ অঙ্গগুলোকে
অপ্রধান অঙ্গ বলা হবে তা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব ।

আবার নারীদের শরীরে সন্তানদের থাওয়ানো বা তাদের রক্ষা করার জন্ত অনেক সময় এমন কতকগুলো অঙ্গ থাকে যেগুলো পুরুষদের শরীরে থাকে না, যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে স্তনগ্রন্থি এবং অঙ্কগর্ভ (marsupial—ক্যাডারু জাতীয়) প্রাণীদের ক্ষেত্রে পেটের থলি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ ধরনের কিছু অঙ্গ পুরুষদের শরীরে থাকে কিন্তু নারীদের শরীরে থাকে না, যেমন কয়েক জাতের পুরুষ-মাছের মধ্যে ডিম্বাণু ধারণের আধার দেখা যায়। কয়েক জাতের পুরুষ-ব্যাঙের মধ্যেও সাময়িকভাবে এই আধার গড়ে ওঠে। বেশির ভাগ প্রজাতির স্ত্রী-মোমাছিদের শরীরে গরাগ সংগ্রহ করা ও তা বহন করার উপযোগী একটা বিশেষ অঙ্গ থাকে এবং শূকরটিকে আর গোটা দলটাকে রক্ষা করার জন্ত তাদের ডিম্বধারকটি (ovipositor) একটি ছলে পরিণত হয়। এ-রকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্তু এখানে তার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে মূখ্য জননঙ্গগুলোর সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন অঙ্গ কিছু পার্থক্যও নারী-পুরুষের মধ্যে থাকে এবং আমাদের আলোচনায় সেগুলোই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইসব পার্থক্যের মধ্যে থাকে নারীর তুলনায় পুরুষের বড় আকৃতি, বেশি শক্তি ও যুদ্ধপ্রিয়তা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের আক্রমণ করার জন্ত পুরুষদের অস্ত্র কিংবা আত্মরক্ষা করার উপায়, পুরুষদের উজ্জল রঙ, নানান চাকচিক্য, গান গাওয়া বা শিস্ দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত মূখ্য ও অপ্রধান লিঙ্গগত পার্থক্যগুলো ছাড়াও কোনও কোনও প্রাণীর পুরুষ আর নারীদের মধ্যে শারীরিক গঠনকাঠামোর পার্থক্যও দেখা যায়। এই পার্থক্যগুলো গড়ে ওঠে জীবনধারণের ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাসের ফল হিসেবেই। প্রজনন সংক্রান্ত কাজকর্মের সঙ্গে এগুলোর কোনও সম্পর্ক নেই, থাকলেও তা নিতান্তই পরোক্ষ সম্পর্ক। যেমন কয়েক জাতের মাছিদের (Culicidae আর Tabanidae) নারীরা রক্তশোষক হয়, কিন্তু তাদের পুরুষরা ফুলের মধু খেয়ে জীবন ধারণ করে বলে তাদের মুখে কোনও নিম্ন-চোয়াল (mandible) থাকে না। কয়েক ধরনের পুরুষ-মথ এবং কঠিন খোলাযুক্ত কয়েক ধরনের প্রাণীর (যেমন Tanais) পুরুষদের মুখটা অসম্পূর্ণ ও সন্ধীর্ণ হয়, ফলে তারা কাউকে খাইয়ে দিতে পারে না। কুঞ্চিত শুঙ্গবিশিষ্ট (Cirripede) কয়েক ধরনের প্রাণীর পুরুষ (complemental) পুরুষরা পুরুষবা পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের মতো হয় স্ত্রী-আকারে নয়তো উভলিঙ্গ আকারে জীবনযাপন করে এবং তাদের মুখ ও আঁকড়ে ধরার অঙ্গ থাকে না। এইসব ক্ষেত্রে পুরুষরাই পরিবর্তিত হয়েছে এবং কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হারিয়েছে যে অঙ্গগুলো স্ত্রী-প্রাণীদেরই থাকে। আবার অল্প কিছু ক্ষেত্রে স্ত্রী-প্রাণীরাই তাদের কোনও কোনও অঙ্গ হারায়। যেমন স্ত্রী-জোনাকিদের কোনও ডানা থাকে না। অনেক স্ত্রী-মথেরও ডানা থাকে না এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন

কখনোই নিজেদের গুটি থেকে বেরিয়ে আসতেও পারে না। কঠিন খোলাযুক্ত পরজীবী বর্গের অনেক স্ত্রী-প্রাণী তাদের সমস্তরূপ পা (অর্থাৎ সঁাতার কাটার পা) হারিয়েছে। কয়েক ধরনের গুবরে পোকাকার (Curculionidae) পুরুষ আর স্ত্রীদের মধ্যে ঠোঁট বা তুণ্ডের (snout) দৈর্ঘ্যে বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এই পার্থক্য এবং এ ধরনের অল্প অনেক পার্থক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝে ওঠা দুষ্কর। জীবনধারণের ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাসের দরুন স্ত্রী আর পুরুষ প্রাণীদের গঠনকাঠামোর মধ্যে যে পার্থক্যগুলো দেখা যায় সেগুলো সাধারণত নিম্ন-শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে কয়েক ধরনের পুরুষ-পাখির ঠোঁট স্ত্রী-পাখিদের ঠোঁটের থেকে অল্পরকম হয়। নিউজিল্যান্ডের হুইয়া (Huia) পাখিদের স্ত্রী আর পুরুষের মধ্যে এই পার্থক্যটা বিরাট। ডঃ বুলার বলেছেন যে পচা কাঠকে খুঁটে খুঁটে ভেতর থেকে কীটপতঙ্গের শুককাঁট বার করে আনার জন্য পুরুষ-পাখিরা তাদের মজবুত ঠোঁটটাকে কাজে লাগায়, আর স্ত্রী-পাখিরা তাদের অনেক বড়, বেশি বাঁকানো এবং নমনীয় ঠোঁটটা চুকিয়ে দেয় কাঠের নরম অংশগুলোর মধ্যে। এইভাবে পরস্পরকে সাহায্য করে তারা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের গঠনকাঠামোর পার্থক্যটা কম-বেশি প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত থাকে সেই প্রজাতির বংশবিস্তারের সঙ্গে। স্ত্রী-প্রাণীদের বেশ কিছু ডিম্বাণুকে পুষ্টি যোগাতে হয় বলে পুরুষদের তুলনায় বেশি খাদ্য প্রয়োজন হয় তাদের, ফলে সেই খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ কিছু উপায় থাকারও দরকার হয় স্ত্রী-প্রাণীদের। পুরুষ-প্রাণীরা, যারা খুব বেশিদিন বাঁচে না, তারা হয়তো অব্যবহারের ফলে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করার অঙ্গগুলো হারিয়ে ফেলতে পারে এবং তার জন্য তাদের তেমন কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু তাদের স্থানান্তরে গমনের অঙ্গ বা সঞ্চরণ-অঙ্গগুলো একেবারে যথাযথ অবস্থাতেই থাকে, কারণ স্ত্রী-প্রাণীদের কাছে পৌছানোর জন্য ওই অঙ্গগুলো তাদের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয়। অতীতকালে স্ত্রী-প্রাণীরাও তাদের গুড়ার, সঁাতার কাটার বা চলাফেরার অঙ্গগুলো হারিয়ে ফেলতে পারে যদি তাদের জীবনধারণের অভ্যাসটা এমন হয় যেখানে এইসব শক্তির কোনও প্রয়োজনই হয় না।

তবে এখানে আমরা কেবলমাত্র যৌন নির্বাচন নিয়েই আলোচনা করতে চাইছি। শুধুমাত্র প্রজননের ব্যাপারে একই প্রজাতির এবং একই লিঙ্গের অঙ্গাঙ্গদের তুলনায় কয়েকজন যে বিশেষ সুবিধেটা পায়, তার ওপরেই এই ব্যাপারটা নির্ভর করে। উপরোল্লিখিত ঘটনাগুলোর মতো যে-সব ক্ষেত্রে জীবনধারণের ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাসের দরুন স্ত্রী-পুরুষের গঠনকাঠামোর মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়, সেইসব ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথ বেয়েই তাদের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটেছে এবং একটি লিঙ্গের

প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু সেই লিঙ্গের প্রাণীরাই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। একইভাবে, মূখ্য যৌনাক্ষণগুলো আর বাচ্চাদের লালনপালন করা বা রক্ষা করার অঙ্গগুলোর ওপরেও একই প্রভাব ক্রিয়া করে। যারা নিজেদের সন্তানদের সবথেকে ভালভাবে জন্ম দিতে বা লালনপালন করতে পারে, তারাই তাদের উৎকৃষ্টতার উত্তরাধিকারী হিসেবে সবথেকে বেশি সংখ্যক সন্তান-সন্ততি রেখে যেতে সক্ষম হয়। আর যারা নিকৃষ্টভাবে সন্তানের জন্ম দেয় বা লালনপালন করে, তারা তাদের দুর্বলতার উত্তরাধিকারী হিসেবে খুব কম সন্তান-সন্ততিই রেখে যেতে পারে। পুরুষদেরকে নারীদের খুঁজে নিতে হয় বলে তাদের শরীরে স্থানান্তর গমনের ও অহুত্বের অঙ্গ থাকা দরকার হয়। কিন্তু এই অঙ্গগুলো যদি জীবনের অন্যান্য ব্যাপারেও কাজে লাগত (যেটাই সাধারণত হয়ে থাকে), তাহলে সেগুলো বিবর্তিত হত প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথ বেয়েই। পুরুষ-প্রাণীরা যখন স্ত্রী-প্রাণীদের খুঁজে পায়, তখন তাদেরকে ভালভাবে ধরার জ্ঞান অনেক সময় আঁকড়ে ধরার উপযোগী বিশেষ অঙ্গের প্রয়োজন হয় পুরুষদের। যেমন ডঃ ওয়ালেস আমাকে জানিয়েছেন যে কিছু কিছু পুরুষ-মথের গোড়ালি বা পায়ের পাতা ভাঙা থাকলে তারা স্ত্রী-মথের সঙ্গে মিলন করতে পারে না। কঠিন খোলাযুক্ত অনেক সামুদ্রিক প্রাণীর পুরুষরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের পা এবং শুক্রগুলো খুব অদ্ভুতভাবে পান্টে যায় এবং স্ত্রী-প্রাণীদের ভালভাবে আঁকড়ে ধরার উপযোগী হয়ে ওঠে। আমাদের মনে হয় এইসব প্রাণীরা সমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কায় সারাক্ষণ ছিটকে পড়ে বলে বংশবিস্তারের জ্ঞান এই ধরনের অঙ্গ থাকাটা তাদের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। যদি তা-ই হয়, তাহলে এই অঙ্গগুলোর এইভাবে বিবর্তিত হওয়াটাকে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল হিসেবেই মেনে নিতে হবে আমাদের। খুব নিম্নশ্রেণীর কিছু প্রাণীদের শরীরেও এই একই কারণে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন কয়েক ধরনের পরজীবী কৃমির পুরুষরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের শরীরের শেষ প্রান্তের নীচের দিকটা খুব কর্কশ বা খরখরে হয়ে ওঠে এবং এর সাহায্যে তারা স্ত্রী-কৃমিদের শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরে রাখতে পারে।^১

১। মিসরুঁ পেরয়ের এই ব্যাপারটাকে উপস্থাপিত করেছেন (‘Revue Scientifique’, ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩, পৃঃ ৮৬৬) যৌন নির্বাচন সংক্রান্ত ধারণার একেবারেই প্রাচীণ। হিসেবে এবং তিন ধরে নিয়েছেন যে যৌন নির্বাচনকেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যকার স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণ বলে মনে করি আমি। তাই অন্যান্য অনেক ফরাসি প্রাণবিজ্ঞানীর মতোই এই বিশিষ্ট প্রাণ-বিজ্ঞানীও যৌন নির্বাচনের প্রাথমিক নীতিগুলোকে বোঝার জন্যও কোনও পরিশ্রম করেননি। জনৈক ইংরেজ প্রাণবিজ্ঞানী জোর দিয়ে বলেছেন যে, কিছু পুরুষ-প্রাণীর শরীরের আঁকড়ে ধরার অঙ্গগুলো স্ত্রী-প্রাণীদের পছন্দ মারফত গড়ে উঠেছে, এটা কিছুতেই হতে পারে না। মস্তব্যটির কথা জানা না থাকলে আমি ভাবতেও পারতাম না যে এই পরিচ্ছদটি গড়ার পর কারুর পক্ষে ভাবা সম্ভব হতে পারে যে আমার মতে পুরুষদের শরীরের আঁকড়ে ধরার উপযোগী অঙ্গগুলো গড়ে ওঠার সঙ্গে স্ত্রী-প্রাণীদের পছন্দ-অপছন্দের কোনও সম্পর্ক আছে।

যখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জীবনধারণের অভ্যাসগুলো একই রকমের হয় এবং স্ত্রীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে স্থানান্তর গমনের বা অহুভূতির অঙ্গগুলো অধিকতর উন্নত অবস্থায় থাকে, তখন তার কারণটা এমন হতে পারে যে স্ত্রী-প্রাণীদেরকে খুঁজে বার করার জন্যে পুরুষ-প্রাণীদের ওই অঙ্গগুলোর উন্নত হওয়াটা নিতান্তই অপরিহার্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা একজন পুরুষের তুলনায় অল্প একজন পুরুষকে বেশি সুবিধে পাওয়ার সুযোগ করে দেয়, কারণ শারীরিকভাবে কম সুবিধাসম্পন্ন পুরুষদের পক্ষে স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতে অনেক বেশি সময় লাগে। আর স্ত্রী-প্রাণীদের শারীরিক গঠনকাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে জীবনধারণের সাধারণ অভ্যাস-আচরণের ব্যাপারে অল্প সময়স্ত ক্ষেত্রে তারাও সমানভাবে অভিযোজিত হয়ে ওঠে। এ-সব ক্ষেত্রে পুরুষরা যেহেতু তাদের বর্তমান গঠনকাঠামোটা অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে টিকে থাকার ব্যাপারে অধিকতর উপযুক্ত হওয়ার জন্য লাভ করে নি, বরং তা লাভ করেছে অল্প পুরুষদের তুলনায় কিছুটা বেশি সুবিধা পাওয়া এবং সেই সুবিধাটা শুধুমাত্র তাদের পুরুষ-সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়ার দরুন, সেহেতু এইসব ক্ষেত্রে যৌন নির্বাচন অবশ্যই তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করেছে। এই পার্থক্যটার গুরুত্বই এই নির্বাচনের এই রূপটাকে যৌন নির্বাচন নামে চিহ্নিত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল আমাকে। এইভাবে বলা যায় যে অঁকড়ে ধরার অঙ্গগুলো থেকে পুরুষ-প্রাণীরা যদি অল্প পুরুষরা এসে পড়ার আগে স্ত্রী-প্রাণীদেরকে অঁকড়ে ধরার কাজেই (অথবা তাদের হাত থেকে স্ত্রী-প্রাণীদের ছাড়িয়ে আনার কাজে) প্রধান সাহায্যটা পেয়ে থাকে, তাহলে বলতেই হবে যে এইসব অঙ্গগুলো যৌন নির্বাচনের পথ বেয়েই যথাযথ হয়ে উঠেছে—অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় কয়েকজনের অর্জিত কিছু বিশেষ সুবিধার পথ বেয়েই যথাযথ হয়ে উঠেছে এগুলো। কিন্তু এ ধরনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যৌন নির্বাচনের প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য করা প্রায় অসম্ভব। অহুভূতি, স্থানান্তর গমন আর অঁকড়ে ধরার অঙ্গের ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্যের খুঁটিনাটি নিয়ে বেশ কিছু পরিচ্ছেদই লিখে ফেলা যায়। তবে জীবনের সাধারণ কাজকর্মের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠা অল্পাল্প অঙ্গগুলোর তুলনায় এই অঙ্গগুলো বেশি চিত্তাকর্ষক নয় বলে এগুলো নিয়ে আমি খুব বেশি আলোচনা করব না, শুধু প্রতিটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কয়েকটি করে উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব।

প্রাণীদের শরীরের আরও অনেক অঙ্গ ও সহজাত প্রবৃত্তিও যৌন নির্বাচনের পথ বেয়েই বিকশিত হয়েছে। যেমন আক্রমণের অস্ত্র ও আত্মরক্ষার উপায়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াই করা ও তাদেরকে হঠিয়ে দেওয়ার জন্য পুরুষ-প্রাণীদের অস্ত্র, তাদের সাহস ও যুদ্ধপ্রিয়তা, তাদের শরীরের নানারকম

চাকচিক্য, কষ্ট থেকে অথবা কোনও যন্ত্র থেকে সঙ্গীত সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের নানান কৌশল, তাদের গন্ধ-ছড়ানোর গ্রাণ্ড (gland) ইত্যাদি। শেযোক্ত ব্যাপারগুলো স্ত্রী-প্রাণীদের প্রলুব্ধ করে তোলার কাজেই ব্যবহৃত হয়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ নির্বাচন মারফত গড়ে ওঠে নি, গড়ে উঠেছে যৌন নির্বাচন মারফতই, কারণ অস্ত্রহীন, চাকচিক্যহীন অথবা অনাকর্ষণীয় পুরুষ-প্রাণীরাও জীবনযুদ্ধে সফল হতে এবং অসংখ্য সন্তান-সন্ততি রেখে যেতে পারত, কিন্তু তাদের তুলনায় অধিকতর গুণ বা সুবিধাসম্পন্ন পুরুষদের উপস্থিতির জগুই তারা তা পারে না। এই সিদ্ধান্তটা আমরা অন্যায়সেই নিতে পারি, কারণ অস্ত্রহীন ও চাকচিক্যহীন স্ত্রী-প্রাণীদের দিকে তাকালে দেখা যায় যে তারা কিন্তু দিব্যি বৈচিত্র্যে থাকে এবং সন্তানের জন্ম দেয়। এই ধরনের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করব আমরা। আলোচনাটা প্রয়োজনীয়, কারণ বিষয়টা চিন্তাকর্ষক তো বটেই, উপরন্তু এটা উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের ইচ্ছা, পছন্দ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপরে নির্ভর করে বলে এর গুরুত্বটাও প্রাণধানযোগ্য। যখন দুটি পুরুষ-প্রাণী একটি স্ত্রী-প্রাণীর ওপরে দখল নেওয়ার জন্য লড়াই করে অথবা যখন একদল স্ত্রী-পাখির সামনে একদল পুরুষ-পাখি তাদের রঙচঙে পালকগুচ্ছ দেখায় আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে, তখন নিঃসন্দেহেই ধরে নেওয়া যায় যে সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হলেও কিসের জন্তে কাজটা করছে তা তাদের জানা থাকে আর তাই সচেতনভাবেই নিজেদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির নজির পেশ করার চেষ্টা করে তারা।

মানুষ যেমন ইচ্ছে করলে মোরগ-লড়াইয়ের বিজয়ী মোরগদের দিয়ে তার লডুয়ে-মোরগদের বংশধরাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে, ঠিক তেমনিভাবে সবথেকে শক্তিশালী ও সবথেকে বেশি জীবনীশক্তিসম্পন্ন অথবা সর্বোত্তম অস্ত্রের অধিকারী পুরুষ-প্রাণীরাই প্রকৃতির রাজত্বে সবথেকে ভাল-ভাবে টিকে থাকতে পেরেছে এবং নিজেদের বংশধরাকে বা প্রজাতিকে উন্নততর করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সামান্য কোনও পরিবর্তনশীলতাও (variability), তা সে যতই সামান্য হোক না কেন, নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথে কোনও প্রাণীকে কিছুটা বাড়তি সুবিধা দেয়ই এবং এই পরিবর্তনশীলতার পিছনে যৌন নির্বাচনের নীতিই কাজ করে চলে। আর অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য-গুলো যে স্পষ্টতই পরিবর্তনশীল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। মানুষ যেভাবে তার নিজের রুচি অনুযায়ী তার ছানা-মোরগদের সুন্দর করে তুলতে পারে, অথবা আরও যথাযথভাবে বললে, ছানাটার পিতামাতার প্রজাতির মধ্যে বিদ্যমান আদত সৌন্দর্যকে পাল্টে দিতে পারে, তার সেব্রাইট মোরগদের-কে নতুন ও চমৎকার একগুচ্ছ পালকের অধিকারী করে তুলতে পারে,

একেবারে সিধে হয়ে চলাফেরা করার শক্তি দিতে পারে, ঠিক সেভাবেই প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা স্ত্রী-পাখিরা নিজেদের সঙ্গী হিসেবে অধিকতর আকর্ষণীয় পুরুষ-পাখিদের নির্বাচন করার এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের বংশধরদের সৌন্দর্য ও অগ্নাত আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো অনেক বাড়িয়ে তুলতে পেরেছে। এই ঘটনার মধ্যে স্ত্রী-পাখিদের পছন্দ এবং রুচির প্রমাণ পাওয়া যায়। কথাটা শুনলে প্রথমটায় একেবারে অসম্ভব বলেই মনে হবে, কিন্তু পরে আরও অনেক প্রমাণ পেশ করে আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে স্ত্রী-পাখিদের মধ্যে এইসব ক্ষমতা সত্যিই আছে। তবে নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ আছে বলার অর্থ এই নয় যে বহুমুখী ও জটিল ধ্যানধারণা বিশিষ্ট কোনও স্ত্রী-পাখি মাঝে মাঝে সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তার তুলনা করা যেতে পারে। পশুপাখিদের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে বরং তুলনা করা যেতে পারে নিম্নতম স্তরের বহু মাছদের, যারা যে-কোনও বাক্যকে বা অভ্যুত্পাদন জিনিস পছন্দ করে এবং তা দিয়ে নিজেদের সাজাতে ভালবাসে।

কতকগুলো বিষয় আমাদের জানা না থাকার দরুন যৌন নির্বাচন ঠিক কিভাবে কাজ করে সেটা বুঝতে আমাদের একটু অসুবিধে হয়। তা সত্ত্বেও একটা কথা আমি জোর দিয়েই বলতে পারি—যে-সব প্রাণিবিজ্ঞানীরা প্রজাতির পরিবর্তনশীলতা বা পরিব্যক্তিতে (mutability) বিশ্বাস করেন, পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলো মন দিয়ে পড়লে আমার সঙ্গে একমত হয়ে তাঁরাও স্বীকার করে নেবেন যে জীবজগতের ইতিহাসে যৌন নির্বাচন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই নারীদের দখল করার জন্য পুরুষদের মধ্যে সংগ্রাম চলে। এই ব্যাপারটা সকলেরই জানা, তাই উদাহরণ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। অনেক পুরুষের মধ্যে থেকে কোনও একজনকে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে নারীদের, অর্থাৎ পছন্দ-অপছন্দের একটা মানসিক ক্ষমতা তাদের থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতির দরুন পুরুষদের মধ্যেকার সংগ্রামটা অত্যন্ত তীব্র রূপ ধারণ করে। পরিযায়ী (migratory) পুরুষ-পাখিরা তাদের প্রজনন-স্থানে স্ত্রী-পাখিদের থেকে আগেই পৌঁছে যায়, ফলে প্রতিটি স্ত্রী-পাখির দখল নিয়ে লড়াই করার জন্য অনেক পুরুষ-পাখি তৈরি হয়ে থাকতে পারে। মি: জেনার ভাইর (Jenner Weir) আমাকে জানিয়েছেন যে পাখি-শিকারীদের কাছ থেকে তিনি জেনেছেন নাইটিংগেল আর ব্ল্যাকক্যাপ পাখিদের ক্ষেত্রে এটা সর্বদাই ঘটে থাকে এবং ব্ল্যাকক্যাপদের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন।

ব্রাইটনের মি: সোয়েসল্যাণ্ড বিগত চল্লিশ বছর ধরে একটা বিশেষ কাজ করে আসছেন। পরিযায়ী পাখিরা প্রথম এনে পৌঁছনো থেকে তিনি তাদের

কাঁদ পেতে ধরার চেষ্টা করেন। এই চল্লিশ বছরে তিনি কখনও কোনও প্রজাতির জ্বী-পাখিদের পুরুষ-পাখিদের থেকে আগে এসে পৌঁছতে দেখেননি। একবার বসন্তকালে একটিও জ্বী-পাখি এসে পৌঁছানোর আগেই তিনি উনচল্লিশটা পুরুষ-দোয়েল বা রে'ড ওয়াগটেল (*Budytes Raii*) শিকার করেছিলেন। এদেশে যে-সব কাঁদাখোঁচা (*snipe*) পাখিরা প্রথম এসে পৌঁছয়, তাদের পরীক্ষা করে মি: গোউল্ড দেখেছেন যে পুরুষ-পাখিরা জ্বী-পাখিদের থেকে আগেই এসে পৌঁছে যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ পরিযায়ী পাখিদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এখানকার নদীগুলোর পুরুষ-স্যামন মাছেদের অধিকাংশই সমুদ্র থেকে চলে আসে জ্বী-মাছেদের আগে এবং মিলনের জন্য তৈরি হয়ে থাকে। ব্যাঙ আর টোডদের (বুকে হেঁটে চলা এক ধরনের ব্যাঙ) ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা চোখে পড়ে। সব ধরনের কীটপতঙ্গদের মধ্যে দেখা যায় মুককীট (*pupa*) অবস্থা থেকে পুরুষরাই প্রথমে বেরিয়ে আসে, ফলে কোনও জ্বী-পতঙ্গের দেখা পাওয়ার আগে কিছুটা সময় পুরুষদের একাই থাকতে হয়।^২ এসে পৌঁছনো এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে ওঠার সময়ের ব্যাপারে জ্বী-পুরুষের মধ্যকার এই পার্থক্যের কারণটা একান্তই স্পষ্ট। যে-সব পুরুষ-প্রাণীরা প্রতি বছর অণুদের আগে কোনও দেশে গিয়ে পৌঁছত অথবা যারা বসন্তকালে মিলনের জন্য প্রথম তৈরি হয়ে উঠত বা সবথেকে বেশি ব্যগ্র হয়ে উঠত, তাদের পক্ষেই সবথেকে বেশি সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেওয়া সম্ভবপর ছিল। তাদের বংশধরদের মধ্যেও এই ধরনের প্রবৃত্তি ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য-গুলো উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হয়েছে। মনে রাখা দরকার বাচ্চার জন্ম দেওয়ার সময়টার (যে সময়টা নির্ধারিত হয় মরসুম অনুযায়ী) হেরফের না ঘটিয়ে জ্বী-প্রাণীদের যৌন পরিপক্বতা বা সঙ্গমের জন্য তৈরি হয়ে ওঠার সময়ের কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো একেবারেই অসম্ভব। এক কথায় বলা যায়, যে-সব প্রাণীদের মধ্যে জ্বী আর পুরুষ আলাদা, তাদের প্রায় সবার ক্ষেত্রেই জ্বী-প্রাণীদের দখল করার জন্য পুরুষদের মধ্যে একটা নিরন্তর সংগ্রামের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

যৌন নির্বাচনকে বুঝে ওঠার ব্যাপারে আমাদের মূল সমস্যাটা একটা জায়গাতেই নিহিত আছে। সমস্যাটা হল—যে পুরুষরা অণু পুরুষদের পরাজিত

২। যে-সব উদ্ভিদের মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষ উদ্ভিদ আলাদা, তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় স্ত্রী-ফুলের ভুলনার পুরুষ-ফুলগুলোই আগে পরিণত হয়ে ওঠে। সি. কে. প্রেন্সেল প্রথম দাবি করেছিলেন যে অনেক উভালঙ্গ উদ্ভিদই বিষমপরিণতিবিশিষ্ট (*dichogamous*) হয়, অর্থাৎ তাদের স্ত্রী ও পুরুষ অঙ্গগুলো একই সময়ে পরিণত হয়ে ওঠে না, ফলে তারা স্ব-স্বপরিণত (*self-fertilised*) হতে পারে না। এইসব ফুলেদের ক্ষেত্রে পরাগরেনুগুলো সাধারণত গর্ভমণ্ডলের থেকে আগেই পরিণত হয়ে ওঠে। তবে কোনও কোনও ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে স্ত্রী-অঙ্গগুলোকেই আগে পরিণত হয়ে উঠতে দেখা যায়।

করে অথবা যারা স্ত্রী-প্রাণীদের কাছে নিজেদেরকে অধিকতর আকর্ষণীয় হিসেবে প্রমাণ করতে পারে, তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের উত্তরাধিকার বহন করার জন্য তাদের পরাজিত ও কম আকর্ষণীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেয় কিভাবে। এই ঘটনাটা না ঘটলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো কয়েকজন পুরুষকে অল্প পুরুষদের থেকে কিছুটা বাড়তি সুবিধা এনে দেয়, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যৌন নির্বাচন মারফত নিখুঁত হয়ে উঠতে এবং আরও মজবুত হয়ে উঠতে পারত না। যে-সব ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা একেবারে সমান সমান থাকে, সেইসব ক্ষেত্রে উন্নত গুণসম্পন্ন পুরুষদের মতোই একেবারে নিকৃষ্ট মানের পুরুষরাও (পুরুষদের বহুগামিতা চালু থাকলে অবশ্য আলাদা কথা) সঙ্গিনী খুঁজে পায় এবং নিজেদের জীবনাচরণের যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসেবে বহু সন্তানের জন্ম দিতে পারে। বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে বিচার-বিবেচনা করে আমি আগে অনুমান করেছিলাম যে যে-সব প্রাণীদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলো যথেষ্ট উন্নত, তাদের অধিকাংশের মধ্যে স্ত্রীদের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক বেশি ছিল। কিন্তু এই ধারণাটা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। কোনও ক্ষেত্রে যদি দু'জন বা তিনজন স্ত্রী-পিছু একজন করে পুরুষ থাকত কিংবা তার চেয়েও কম থাকত, তাহলেও ফলাফলের কোনও হেরফের ঘটত না। কারণ সেক্ষেত্রেও বেশি শক্তিশালী বা অধিকতর আকর্ষণীয় পুরুষরাই সর্বাধিক সংখ্যক সন্তান-সন্ততির জন্ম দিয়ে যেত। তবে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাতের ব্যাপারটা নিয়ে যতদূর সম্ভব যাচাই করে দেখার পর আমার মনে হয়েছে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার মধ্যে খুব বিরাট পার্থক্য সাধারণত থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন নির্বাচন কাজ করে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে।

যে-কোনও একটা প্রজাতির কথা ধরা যাক। ধরা যাক কোনও-একটা পাখির কথা। একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী এই প্রজাতির স্ত্রী-পাখিদেরকে দুটো সমান ভাগে ভাগ করা যাক। প্রথম ভাগটায় থাকবে বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন আর সুপুষ্ট স্ত্রী-পাখিরা, দ্বিতীয়টায় কম প্রাণশক্তিসম্পন্ন আর দুর্বল স্ত্রী-পাখিরা। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহেই বলে দেওয়া যায় যে বসন্তকালে প্রথম ভাগটার পাখিরা দ্বিতীয় ভাগের পাখিদের চেয়ে অনেক আগেই সন্তান প্রসব করবে। এটা মিঃ জেনার ভাইর-এর মত, যিনি বহু বছর ধরে পাখিদের আচার-আচরণ খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সবথেকে বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন, সর্বাধিক সুপুষ্ট এবং সর্বপ্রথম প্রসবকারিণীরাই যে সবথেকে বেশি সংখ্যক সন্তান রেখে যেতে সক্ষম হবে, সে ব্যাপারেও সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।^৩ আমরা আগেই দেখেছি যে পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে

৩। এই সন্তানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে উৎকৃষ্ট প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় অভিজ্ঞ পক্ষীতত্ত্ববিদ মিঃ জে. এ. অ্যালেন-এর লেখায় (‘ম্যামালস অ্যান্ড উইল্ডার বার্ডস অফ ইন্ডিয়া’)

আগেই মিলনের জন্য তৈরি হয়ে যায়। সবথেকে শক্তিশালী এবং কোনও কোনও প্রজাতির ক্ষেত্রে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অস্ত্রে সবথেকে ভালভাবে সজ্জিত পুরুষরা দুর্বল পুরুষদের হাঠিয়ে দেয়। তারপর এই প্রথম শ্রেণীর পুরুষরা মিলিত হয় বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও সুপুষ্ট স্ত্রীদের সঙ্গে, কারণ তারাই প্রথমে সন্তানের জন্ম দিতে পারবে।^৪ পিছিয়ে থাকা বা দুর্বল স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় এই শক্তিসমৃদ্ধ যুগলরা অনেক বেশি সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হবে। স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সমান সমান হলে ওই দুর্বল স্ত্রী-প্রাণীরা তখন পরাজিত ও দুর্বল পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য হবে। ঠিক এই ঘটনাটাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পুরুষ-প্রাণীদের আকার, শক্তি ও সাহস বাড়িয়ে তোলার অথবা তাদের আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অস্ত্রগুলোকে উন্নত করে তোলার পিছনে মূল কারণ হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু বহুক্ষেত্রে অল্প একটা ঘটনাও চোখে পড়ে। স্ত্রী-প্রাণীটির যদি তাকে পছন্দ না হয়, তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করার পরেও পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রীটির ওপরে দখল নিতে পারে না। পশুপাখিদের পূর্বরাগের ব্যাপারটা মোটেই খুব সাদামাটা বা সংক্ষিপ্ত নয়। সবথেকে চাকচিক্যময় অথবা সবথেকে ভাল গায়ক কিংবা অঙ্গভঙ্গী করে অভিনয় দেখানোয় সবথেকে ওস্তাদ পুরুষদের দেখেই স্ত্রী-প্রাণীরা সবথেকে বেশি উত্তেজিত হয় বা তাদের সঙ্গে জোড় বাঁধতে চায়। কিন্তু এমনটাও হতে পারে যে সেইসঙ্গেই তারা অধিকতর প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও উচ্চল পুরুষদেরকেও পছন্দ করবে। বাস্তব পর্যবেক্ষণ থেকে এর কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে।^৫ তাই বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন স্ত্রী-প্রাণীরা, যারা প্রথমে সন্তান প্রসব করে, তারা অনেক পুরুষের মধ্যে থেকে বিশেষ কাউকে বেছে নেওয়ার সুযোগ পায়। সবসময়

ফ্লোরিডা', পৃঃ ২২৯)। প্রথমদিকে জন্মানো পক্ষীশাবকরা ঘটনাচক্রে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর পরের দিকে জন্মানো পক্ষীশাবকদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এই শাবকরা “মরসুমের প্রথমদিকে জন্মানো শাবকদের তুলনায় আকারে ছোট ও ফ্যাশের রঙের হয়। যে-সব ক্ষেত্রে প্রাতঃবহর একাধিকবার বাছার জন্ম দেয় মায়েরা, সেইসব ক্ষেত্রে প্রথম বারের শাবকদের সব ব্যাপারেই অনেক বেশি পরিপূর্ণ ও প্রাণবন্ত হতে দেখা যায়।”

৪। মুককীস্-অবস্থা থেকে প্রতি বছর যে-সব স্ত্রী-মৌমাছি প্রথম বৌরয়ে আসে, তাদের ব্যাপারে এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন হেরমান মুলার। দৃষ্টব্য, তাঁর বিশিষ্ট রচনা, “Anwendung den Darwin’schen Lehre auf Bienen.” “Verh. d. V. Jahrg.” xxix, পৃঃ ৪৫।

৫। এ সম্পর্কে মুরগিদের ব্যাপারে কিছু তথ্য আমার হাতে এসেছে। সেগুলোর কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা যাবে। পাখিদের মধ্যেও এই ব্যাপারটা দেখা যায়। যেমন ঘুঘু-পাখিরা সাধারণত সারা জীবনের জন্যেই জোড় বাঁধে। কিন্তু মিঃ জেনার ভাইর আমাকে জানিয়েছেন যে পুরুষ-পাখিরা কোনওভাবে আহত হলে কিংবা দুর্বল হয়ে পড়লে স্ত্রী-পাখিরা তাদেরকে ত্যাগ করে চলে যায়।

হয়তো তারা সবথেকে শক্তিশালী বা আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অস্ত্রে সবথেকে সুসজ্জিত পুরুষদেরকে বাছে না, তবে প্রাণবন্ত, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং অগ্ন্যন্ত্র ব্যাপারে সবথেকে আকর্ষণীয় পুরুষদেরকে বেছে নিতে তাদের ভুল হয় না। এইভাবে আগে থেকে যারা জোড় বাঁধে, সেইসব স্ত্রী-পুরুষেরা তাদের বংশবৃদ্ধির ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় কিছুটা বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। বছ প্রজন্ম ধরে এই ঘটনাটা চলতে চলতে পুরুষদের শক্তি আর লড়াই করার ক্ষমতা তো বাড়েই, সেইসঙ্গেই তাদের বিভিন্ন অঙ্গসজ্জা বা অগ্ন্যন্ত্র আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলোও উন্নত হয়ে ওঠে।

এর উন্টোদিকে থাকে একটি বিরলতর ঘটনা—পুরুষ-প্রাণী কর্তৃক বিশেষ কোনও স্ত্রী-প্রাণীকে বেছে নেওয়া। এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার একান্তই স্পষ্ট—যে-সব পুরুষেরা সবথেকে বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন এবং যারা অন্যদেরকে পরাজিত করেছে, একমাত্র তাদের সামনেই থাকে সঙ্গিনী বেছে নেওয়ার অবাধ সুযোগ। তারা যে প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও আকর্ষণীয় স্ত্রী-প্রাণীদেরকেই বেছে নেবে, সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। বংশবৃদ্ধির ব্যাপারে এই ধরনের যুগলদের একটা বাড়তি সুবিধা থাকে, বিশেষ করে পুরুষটি যদি স্ত্রীটিকে মিলনের মরহুমে রক্ষা করতে পারে (উন্নততর কিছু জীবজন্তুর ক্ষেত্রে যেমনটা দেখা যায়) অথবা বাচ্চাদের দেখাশোনার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে, তাহলে তো বটেই। প্রতিটি লিঙ্গের সদস্যরা যদি বিপরীত লিঙ্গের বিশেষ কয়েকজনকে পছন্দ করত ও বেছে নিত, তাহলে সেক্ষেত্রেও এই একই নীতি প্রযোজ্য হত। কারণ সেক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হত যে তারা শুধু বিপরীত লিঙ্গের অধিকতর আকর্ষণীয় সদস্যদেরকেই বাছবে না, সেই সঙ্গেই বেছে নেবে অধিকতর প্রাণশক্তিসম্পন্ন স্ত্রী বা পুরুষকেই।

স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাত। আমি আগেই বলেছি যে স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা অনেক বেশি হলে যৌন নির্বাচন ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে উঠত। বেশ কিছু জীবজন্তুর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাত নিয়ে যথাসম্ভব গুছানুগুছান অন্বেষণের চেষ্টা করেছি আমি। তবে এই অন্বেষণের উপাদান ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। এখানে আমি ওই অন্বেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্ত-সারটুকুই শুধু উল্লেখ করে যাব। বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে পরে আলোচনা করব, অন্যথায় আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় থেকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জন্মের সময় স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাতের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যেতে পারে একমাত্র গৃহপালিত পশুদের মধ্যেই। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত নথি নেই। তবে পরোক্ষ উপায়ে আমি বেশ কিছু পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে পেরেছি যা থেকে বোঝা যায় যে আমাদের গৃহপালিত জীবজন্তুদের অধিকাংশের মধ্যেই স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত

অনুপাতটা জন্মের সময় প্রায় সমান সমানই থাকে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াদের ব্যাপারে একটা পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে—একুশ বছরে ২৫৫৬০-টি ঘোড়ার জন্ম হয়েছে, যার মধ্যে পুরুষ আর স্ত্রী-প্রাণীর অনুপাত ৯২'৭ ও ১০০। গ্রেহাউণ্ডদের ক্ষেত্রে অসমতাটা অল্প প্রাণীদের থেকে বেশি। বারো বছরে জন্মানো ৬৮৭৮-টি গ্রেহাউণ্ডের মধ্যে পুরুষ আর স্ত্রী-প্রাণীর অনুপাত ছিল ১১০'১ ও ১০০। তবে গৃহপালিত অবস্থায় না থেকে প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকলেও এই অনুপাতটা একই থাকত বলে ধরে নেওয়াটা খুব নিরাপদ নয়, কারণ অবস্থার খুব সামান্য এবং অজানা কিছু পার্থক্যও স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাতকে প্রভাবিত করে থাকে। মানুষের দিকে তাকালে দেখা যায় প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু পিছু পুরুষ-শিশুর জন্মের হার ইংল্যান্ডে ১০৪'৫ জন, রাশিয়ায় ১০৮'২ জন এবং লিভোনিয়ার ইহুদিদের ক্ষেত্রে ১২০ জন। এই পরিচ্ছেদের সংযোজনী অংশে জন্মের সময় পুরুষদের সংখ্যাধিক্যতার এই কোতূহলোদ্দীপক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমি। তবে উত্তমাশা অন্তরীপে একটু অল্প ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ওখানকার ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে কয়েক বছরে ১০০ জন নারী-শিশু পিছু পুরুষ-শিশু জন্মেছে ২০ থেকে ২২ জন।

আপাতত আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নারী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাত, এবং শুধু জন্মের সময়েই নয়, পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠার পরে নারী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাতও আমাদের বিচার্য বিষয়। এইখানে এসে আরেকটা সন্দেহজনক বিষয় আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, কারণ এটা স্ববিদিত যে যে মানুষের মধ্যে জন্মের আগেই বা প্রসবের সময়ে এবং শৈশবের প্রথম কয়েকটা বছরে পুরুষ-শিশুদের মৃত্যুর হার নারী-শিশুদের মৃত্যুর হারের চেয়ে অনেক বেশি। পুরুষ-ভেড়াদের ক্ষেত্রে এবং সম্ভবত অল্প কিছু জীবজন্তুর ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কয়েকটা প্রজাতির পুরুষরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে পরস্পরকে হত্যা করে কিংবা একেবারে নিশ্বেচ্ছ হয়ে না পড়া পর্যন্ত পরস্পরকে তাড়া করে চলে। স্ত্রী-প্রাণীদের সন্ধানে হুগে হয়ে ঘোরার সময়েও তাদেরকে নিশ্চয়ই নানান বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কয়েক ধরনের মাছের মধ্যে পুরুষ-মাছেরা আকারে স্ত্রী-মাছদের থেকে অনেকটা ছোট হয় এবং খুব সম্ভবত স্ত্রী-মাছেরা অথবা অল্প মাছেরা তাদেরকে অনেক সময় খেয়েও ফেলে। কয়েক ধরনের পাখিদের মধ্যে স্ত্রী-পাখিরা পুরুষ-পাখিদের থেকে আগে মারা যায়। নিজের বাসার মধ্যে অথবা বাচ্চাদের দেখাশোনা করার সময়েও তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রে পুরুষ-শুককীটের চেয়ে স্ত্রী-শুককীটের আকার প্রায়শই বড় হয়, ফলে অল্প কোনও প্রাণীর তাদেরকে খেয়ে ফেলার সম্ভাবনাটাও বেশিই থাকে। অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণবয়স্ক

স্ত্রী-প্রাণীরা পূর্ববয়স্ক পুরুষ-প্রাণীদের তুলনায় কম কর্মক্ষম এবং কম গতিসম্পন্ন হয়, ফলে বিপদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে অসুবিধেটা বেশিই হয় তাদের। এইসব ব্যাপার থেকে বোঝা যায় যে প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা জীবজন্তুদের মধ্যে পূর্ববয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অল্পপাত নির্ণয়ের ব্যাপারে কিছু আনুমানিক হিসেবের ওপরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অল্পপাতের মধ্যে বিরাট কোনও পার্থক্য থাকলে আলাদা কথা, অন্যথায় এ ধরনের হিসেবের বিশ্বাসযোগ্যতা খুবই কম। তা সত্ত্বেও সংযোজনী অংশে প্রদত্ত তথ্যসমূহ থেকে আমরা অন্তত এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কয়েক ধরনের স্ত্রীপায়ী প্রাণী, বেশ কিছু পাখি, কয়েক ধরনের মাছ আর কীটপতঙ্গের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীর তুলনায় পুরুষ-প্রাণীর সংখ্যা অনেক বেশি হয়।

স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অল্পপাতে এক এক বছর অন্তর কিছুটা ওঠানামা ঘটতে দেখা যায়। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াদের ক্ষেত্রে ১০০-টি মার্দ-ঘোড়া পিছু পুরুষ-ঘোড়ার জন্মের হার এক বছরে ১০.৭.১ জন থেকে পরের বছরে ৯২.৬ জনে নেমে যায়, গ্রেহাউণ্ডদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ১১৬.৩ জন থেকে নেমে যায় ৯৫.৩ জনে। তবে ইংল্যান্ডের থেকে বড় কোনও এলাকা জুড়ে সমীক্ষা চালিয়ে এর থেকে বেশি সংখ্যক প্রাণীর জন্ম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে হয়তো দেখা যেত যে সংখ্যাগত অল্পপাতের ক্ষেত্রে তেমন কোনও ওঠানামা ঘটে না। আর তেমনটা হলে প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকার সময় কার্যকরী যৌন নির্বাচন ঘটার সম্ভাবনাও কমে যায়। তথাপি কিছু কিছু বন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে (যেমনটা সংযোজনী অংশে দেখানো হয়েছে) এই সংখ্যাগত অল্পপাতটা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যথেষ্ট ওঠানামা করে এবং তা কার্যকরী যৌন নির্বাচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কারণ দেখা গেছে যে-সব পুরুষরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করতে সক্ষম হয় অথবা নারীদের কাছে যারা সবথেকে বেশি আকর্ষণীয়, তারা কয়েক বছর ধরে কিংবা কোনও বিশেষ অঞ্চলে যে স্ত্রীবিধাটুকু অর্জন করে সেটা তাদের সন্তানদের মধ্যে খুব সম্ভবত সঞ্চারিত হয় এবং পরবর্তীকালেও তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। পরবর্তী ঋতুগুলোতে যখন (স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সমান হওয়ার দরুন) প্রতিটি পুরুষই একটি করে স্ত্রীকে দখল করতে সক্ষম হয়, তখন দুর্বল বা কম আকর্ষণীয় পুরুষদের পক্ষে সন্তানের জন্ম দেওয়ার যতটা সুযোগ থাকবে, আগের ঋতুতে জন্মানো শক্তিশালী ও বেশি আকর্ষণীয় পুরুষদের সুযোগ তার চেয়ে বেশি যদি না-ও হয়, কম অন্তত হবে না।

বহুগামিতা। স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যায় সমতা না থাকলে যা ঘটতে পারে, তারই প্রতিফলন ঘটে বহুগামিতার মধ্যে। প্রতিটি পুরুষ দুই বা ততোধিক

স্ত্রী-প্রাণীকে দখল করে আর অনেক পুরুষ কোনও সঙ্গিনীই জোটাতে পারে না। এই শেযোস্তরা নিশ্চিতভাবেই দুর্বলতর বা কম আকর্ষণীয় পুরুষ। অনেক স্ত্রীপায়ী প্রাণী এবং কয়েক ধরনের পাখির বহুগামী হয়ে থাকে, কিন্তু নিম্ন-শ্রেণীর কোনও প্রাণীদের মধ্যে বহুগামিতার অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি আমি। বেশ কিছু স্ত্রী-প্রাণীকে দখল করে তাদের নিয়ে একটা নিজস্ব হারেম গড়ে তোলার মতো বুদ্ধিমত্তা বোধহয় এইসব প্রাণীদের নেই। বহুগামিতা আর অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকাশের মধ্যে একটা সম্পর্ক যে আছেই, সেটা নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায়। জীৱদের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা বেশি হলে সেটা যে যৌন নির্বাচনের পক্ষে অমুকূলই হয়ে থাকে—এই মতবাদেরও সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় পূর্বোক্ত ধারণাটার মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরোপুরি একগামী অনেক প্রাণীদের মধ্যে, বিশেষত পাখিদের মধ্যে, খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করা যায়, আবার বহুগামী কিছু প্রাণীর মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্য একেবারেই অনুপস্থিত থাকে।

প্রথমে আমরা স্ত্রীপায়ী প্রাণীদের নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব, তারপর আলোচনা করব পাখিদের নিয়ে। গরিলারা বহুগামী বলেই মনে হয় এবং পুরুষ-গরিলাদের সঙ্গে স্ত্রী-গরিলাদের প্রচুর পার্থক্য থাকে। দলবদ্ধভাবে বসবাসকারী কয়েক ধরনের বেবুনের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এদের দলগুলোয় পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের তুলনায় পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার মাইসেটিস কারায়াদের (*Mycetes caraya*) স্ত্রী আর পুরুষ প্রাণীর মধ্যে গায়ের রঙ, মুখমণ্ডলের রোম এবং স্বরযন্ত্রের ব্যাপারে স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। এদের পুরুষ-প্রাণীরা দু-তিনটি স্ত্রী-প্রাণীকে নিয়ে বসবাস করে। সেবুস কাপুসিনাসদের (*Cebus capucinus*) পুরুষরা স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে কিছুটা আলাদা হয় এবং বহুগামী হয়। অক্টাভ বানরদের ব্যাপারে এ সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা নেই, তবে এদের কয়েকটা প্রজাতি পুরোপুরি একগামী হয়। রোমছক প্রাণীরা স্পষ্টতই বহুগামী হয়ে থাকে এবং অল্প যে-কোনও স্ত্রীপায়ী প্রাণীদের চেয়ে এদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্যটাও অনেক স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। আত্মরক্ষা ও আক্রমণের অস্ত্রের ব্যাপারে পার্থক্য তো থাকেই, অক্টাভ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও নানান পার্থক্য লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ হরিণ, গবাদি পশু আর ভেড়ারা বহুগামী হয়, তবে এদের মধ্যে কাউকে কাউকে একগামী হতেও দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার কুম্ভসার যুগদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্ত্রীর অ্যাণ্ড্রু স্মিথ বলেছেন যে প্রায় বারোজনের একেকটা দলে একজনের বেশি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ কদাচিৎ দেখা যায়। এশিয়ার কুম্ভসার সাইগারা (*antelope saiga*) সম্ভবত পৃথিবীর সবথেকে অবাধ অবাধ বহুগামী প্রাণী প্যালাস বলেছেন যে এদের একেকজন পুরুষ তার

সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে হঠিয়ে দিয়ে শ'খানেক স্ত্রী-প্রাণীকে দখল করে এবং তাদেরকে নিয়ে থাকে। এদের স্ত্রী-প্রাণীদের কোনও শিং থাকে না, শরীরের রোমগুলোও পুরুষদের থেকে কোমল হয়, কিন্তু অন্ডাণ্ড ব্যাপারে পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীদের তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না। ফকল্যাও দ্বীপপুঞ্জের এবং উত্তর আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তীয় প্রদেশসমূহের বন্য পুরুষ-ঘোড়ারা বহুগামী হয়, কিন্তু বড় চেহারা আর শরীরের অনুপাতের তফাৎ ছাড়া মাদি-ঘোড়াদের সঙ্গে তাদের অন্ডা তাদের অন্ডা কোনও পার্থক্য থাকে না। বুনো পুরুষ-শুয়োরদের বড় বড় দাঁত আর অন্ডা কয়েকটা ব্যাপারের মধ্যে তাদের লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ইউরোপে ও ভারতবর্ষে এই বুনো পুরুষ-শুয়োররা একমাত্র প্রজননের মরসুমটা বাদ দিয়ে অন্ডা সময়টা একা-একাই বাস করে। স্যার ডব্লিউ এলিয়ট ভারতবর্ষে এই প্রাণীটিকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন প্রজননের মরসুমে এরা প্রত্যেকে বেশ কিছু মাদি-শুয়োরের সঙ্গে বসবাস করে। ইউরোপের বুনো শুয়োরদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য কিনা বলা মুশকিল, তবে সেখানেও এর সমর্থনে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। বুনো শুয়োরের মতোই ভারতবর্ষের পূর্ণবয়স্ক বুনো পুরুষ-হাতিরাও বছরের বেশির ভাগ সময়টা একা-একাই থাকে। কিন্তু ডঃ ক্যাম্পবেল বলেছেন, দলবদ্ধভাবে থাকার সময় “একদল স্ত্রী-হাতির মধ্যে একের বেশি পুরুষ-হাতিকে কদাচিৎই থাকতে দেখা যায়।” আকারে বৃহত্তর পুরুষ-হাতিরা আকারে ছোট ও দুর্বলতর পুরুষদের তাড়িয়ে দেয় কিংবা মেরে ফেলে। স্ত্রীদের সঙ্গে পুরুষদের পার্থক্য থাকে বড় বড় দাঁতে, বড় আকারে, শক্তিতে এবং সহনশীলতায়। সবকিছু মিলিয়ে পার্থক্যটা এতই বেশি যে ধরা পড়ার পর পুরুষ-হাতির দাম স্ত্রী-হাতিদের চেয়ে এক-পঞ্চমাংশ বেশি হয়। অন্ডাণ্ড স্কুলচর্ম প্রাণীদের (গণ্ডার ইত্যাদি) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য খুব একটা থাকে না অথবা আদৌ থাকে না, আর যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয় এরা বহুগামী নয়। হাত, শুঁড় বা দাঁড়ানিষ্ঠ (Cheiroptera), দন্তহীন স্তন্যপায়ী, পতঙ্গভূক এবং তীক্ষ্ণদন্ত প্রাণীদের কোনও প্রজাতির মধ্যেও বহুগামিতার কথা আমার জানা নেই—শুধু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। কয়েকজন ইঁদুর-ধরিয়ে জানিয়েছেন যে তীক্ষ্ণদন্ত প্রাণীদের মধ্যে সাধারণ খেড়ে-ইঁদুরদের পুরুষরা বেশ কয়েকজন স্ত্রী-ইঁদুরকে নিয়ে বসবাস করে। তা সত্ত্বেও দন্তহীন স্তন্যপায়ী শ্রেণীর কিছু কিছু প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কাঁধের রোমগুলোর চরিত্র ও রঙের ব্যাপারে কিছু পার্থক্য থাকে। নানা জাতের বাহুড়দের (Cheiroptera গোত্রের) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বেশ স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এদের পুরুষদের শরীরে গন্ধ-নিঃসরণকারী গ্রন্থি ও দেহস্থ খলি থাকে এবং তাদের গায়ের রঙও কিছুটা

হালকা হয়। তীক্ষ্ণদন্ত প্রাণীদের বিভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রায় কোনও পার্থক্যই থাকে না (অন্তত আমার জানা নেই), থাকলেও বড়জোর লোমের রঙের ছোপে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকতে পারে।

স্বর অ্যাণ্ডু স্মিথ আমাকে জানিয়েছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার সিংহরা কখনও-কখনও একটিমাত্র সিংহীকে নিয়ে থাকলেও সাধারণত তারা একাধিক সিংহীকে নিয়েই থাকে, এবং একটি ক্ষেত্রে একটি সিংহকে একসঙ্গে পাঁচটি সিংহীকে নিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। অর্থাৎ এরা বহুগামী। আমি যতদূর জানি তাতে দক্ষিণ আফ্রিকার এই সিংহরাই স্থলচর মাংসাশী স্তন্যপায়ীদের যাবতীয় প্রজাতির মধ্যে একমাত্র বহুগামী প্রাণী এবং শুধু এদের ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সুস্পষ্ট লিঙ্গগত পার্থক্য চোখে পড়ে। তবে সামুদ্রিক মাংসাশী স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। শীলমাছেদের নানান প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকে এবং এদের পুরুষেরা পুরোপুরি বহুগামী হয়। পেরন-এর মতে, দক্ষিণ সমুদ্রের সমুদ্র-হস্তীদের (sea-elephant) পুরুষরা সর্বদাই বেশ কয়েকটি স্ত্রী-প্রাণীকে নিয়ে থাকে এবং ফস্টারের সি-লায়নদের (ক্ষুদ্র সামুদ্রিক মাছবিশেষ) পুরুষেরা সর্বদাই কুড়ি থেকে তিরিশটি স্ত্রী-প্রাণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। উত্তরাঞ্চলে স্টেলারের পুরুষ মেরু-ভল্লুকদের চারপাশে আরও বেশি সংখ্যক স্ত্রী-প্রাণী থাকে। ডঃ গিল বলেছেন যে একগামী প্রজাতিদের মধ্যে “অথবা যারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বাস করে তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের আকারের তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না। কিন্তু সমাজবদ্ধ প্রজাতিদের মধ্যে, কিংবা বলা ভাল যে-সব প্রজাতির পুরুষরা বেশ কিছু স্ত্রী-প্রাণীকে নিয়ে নিজস্ব হারে মবানায় তাদের মধ্যে, স্ত্রীদের তুলনায় পুরুষরা আকারে অনেক বড় হয়।” ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

পাখিদের যে-সব প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকে, তাদের পুরুষরা সবক্ষেত্রেই একগামী হয়। গ্রেট ব্রিটেনে আমরা সূচকিত লিঙ্গগত পার্থক্যের অনেক নজির খুঁজে পাই, যেমন বুনো হাঁসেরা একটিমাত্র হংসীর সঙ্গেই জোড়ু বাঁধে, এবং সাধারণ শ্রামাপাখি আর বালফিঞ্চ (bullfinch) পাখিরা সারা জীবনের জন্যই একটিমাত্র স্ত্রী-পাখির সঙ্গে জোড়ু বাঁধে বলে শোনা যায়। মিঃ ওয়ালেস আমাকে জানিয়েছেন যে দক্ষিণ আমেরিকার চড়াই (chatterer) বা কোটিংগিডে (cotingidae) পাখিদের ক্ষেত্রে এবং অন্য আরও বেশ কিছু পাখিদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কয়েকটি প্রজাতির প্রাণীরা বহুগামী না একগামী, তা আমি নির্ণয় করে উঠতে পারি নি। লেসন বলেছেন যে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যবিশিষ্ট বার্ড অফ প্যারাডাইসেরা (সুন্দর ডানাওয়ালা বায়সজাতীয় পাখি) বহুগামী হয়, কিন্তু

তার এই মন্তব্য যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক কিনা সে ব্যাপারে মিঃ ওয়ালেস সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মিঃ স্টালভিন আমাকে জানিয়েছেন যে খঞ্জনা পাখিরা (humming-bird) বহুগামী হয়। ল্যাজের পালকগুলোর জন্ত প্রসিদ্ধ পুরুষ উইডো-বার্ডরা (বাবুই জাতীয় পাখি) স্পষ্টতই বহুগামী হয়।^৬ মঃ জেনার ভাইর এবং অন্ত কয়েকজনের কাছ থেকে আমি জেনেছি যে তিনটি স্টার্লিং পাখি প্রায়শই এক বাসায় বাস করে। তবে এটা পুরুষ-পাখিদের বহুগামিতা নাকি স্ত্রী-পাখিদের বহুগামিতা (polyandry), তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি।

হাঁসমুরগি জাতীয় পাখিদের (Gallinaceae) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও বার্ড অফ প্যারাডাইস বা খঞ্জনা পাখিদের মতো সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে। এদের অনেক প্রজাতির পুরুষরা বহুগামী হয়, অন্তরা পুরোপুরি একগামী হয়। বহুগামী ময়ূর বা ফেজ্যাট পাখিদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আর একগামী গিনি-ফাউল (মোরগ জাতীয় পাখি) বা প্যাট্রিজদের (তিতির জাতীয় পাখি) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকে। এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন গ্রাউস (লিঙ্গপাদ পাখিবিশেষ) বর্গের পাখিদের কথা ধরা যাক। এদের মধ্যকার বহুগামী ক্যাপারকেইল্জি (capercaillie) আর ব্ল্যাক কক্কদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিশাল পার্থক্য থাকে, আবার একগামী রেড গ্রাউস আর টারমিগানদের (ptarmigan) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না। কারসোর (cursore) বর্গের পাখিদের মধ্যে বাস্টার্ডরা ছাড়া অন্ত খুব কম প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে, এবং গ্রেট বাস্টার্ডরা (Otis tarda) বহুগামী হয়। গ্রালাটোর (Grallatore) বর্গের বিভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম, শুধু রাফদের Machetes pugnax—কাদাখোঁচা জাতীয় পাখি) স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে। আর, মণ্টাগুর মতে, এই প্রজাতির পুরুষরা বহুগামী হয়। এইসব তথ্য থেকে মনে হয় যে পাখিদের ক্ষেত্রে পুরুষদের বহুগামিতার সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য গড়ে ওঠার একটা খনিঃ সম্পর্ক আছে। চিড়িয়াখানার সঙ্গে যুক্ত মিঃ বালেন্ট পাখিদের ব্যাপারে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম পুরুষ-ঔগোপানরা (হাঁস-মুরগি জাতীয় এক ধরনের পাখি) বহুগামী হয় কিনা। উত্তর শুনে

৬। “দ্য হাবস”, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৩০, প্রোগ্নে উইডো-বার্ড (Progne Widow-bird) প্রসঙ্গে। এছাড়াও দ্রষ্টব্য, ‘ভিডুয়া অ্যান্ডুলারিস’ প্রসঙ্গে, ঐ, খণ্ড ২, পৃঃ ২১১। ক্যাপারকেইল্জি আর গ্রেট বাস্টার্ডদের বহুগামিতা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য এল. লয়েড, “গেব বার্ডস অফ সুইডেন,” পৃঃ ১৯ ও ১৮২। মণ্টাগু এবং সেল্‌বি বলেছেন—ব্ল্যাক গ্রাউসরা বহুগামী আর রেড গ্রাউসরা একগামী হয়ে থাকে।

স্বস্তিত হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, “ঠিক জানি না, তবে ওদের শরীরের রঙের বাহার দেখে মনে হয় ওদের পক্ষে বহুগামী হওয়াটাই ভাবিক।”

গৃহপালিত অবস্থায় পাখিদের মধ্যে একজন মাত্র জী-র সঙ্গে জোড় বাঁধার সহজাত প্রবৃত্তিটা খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বুনো পুরুষ-হাঁসেরা পুরোপুরি একগামী হয়, কিন্তু গৃহপালিত পুরুষ-হাঁসেরা একান্তভাবেই বহুগামী। রেভারেণ্ড ডব্লিউ. ডি. ফক্স আমাকে একটি ঘটনার কথা জানিয়েছেন। তাঁর বাড়ির কাছে একটা বড় পুকুরে আধা-গৃহপালিত কিছু বুনো হাঁস থাকত। শিকারভূমির জটনৈক রক্ষী গুলি করে অনেকগুলো পুরুষ-হাঁসকে মেরে ফেলে। ফলে প্রতি সাত-আটজন হংসী পিছু একটা করে পুরুষ-হাঁস টিকে ছিল। অথচ সেই অবস্থাতেও কিন্তু তাদের ব্যাপক বংশবিস্তার ঘটেছিল। গিনি-ফাউলরা পুরোপুরি একগামী। কিন্তু মিঃ ফক্স দেখেছিলেন দু’ তিনটি মুরগির সঙ্গে একটা মোরগকে রাখলে তারা সবথেকে ভালভাবে বংশবিস্তার করতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকার সময় ক্যানারি পাখিরা একটি পুরুষ আর একটি নারীতে জোড় বাঁধে, কিন্তু ইংল্যান্ডের পক্ষীপালকরা চার-পাঁচটি স্ত্রী-পাখির সঙ্গে একটি পুরুষ-পাখিকে রেখে অত্যন্ত ভাল ফল পেয়েছেন। এইসব ঘটনা থেকে আমার মনে হয়েছে বহু একগামী প্রজাতির পুরুষরা যে-কোনও মুহূর্তেই সাময়িকভাবে অথবা পাকাপাকিভাবে বহুগামী হয়ে উঠতে পারে।

সরীসৃপ আর মাছেদের স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ধরনটা কেমন, সে ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানা নেই আমাদের। তবে এদের মধ্যে গ্টিক্লব্যাক্রা (Gasterosteus) বহুগামী হয় বলে জানা গেছে। তাছাড়া প্রজননের মরসুমে এদের পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীদের পার্থক্যটাও অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে।

অপ্রধান লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যমূহের বিকাশকে কোম কোম উপায়ে প্রভাবিত করেছে যৌন নির্বাচন, তার একটা সারসংক্ষেপ করা যাক এবার। সবথেকে শক্তিশালী, অন্তঃস্থ সবথেকে সুসজ্জিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াইয়ে বিজয়ী পুরুষ-প্রাণীরা সবথেকে বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন, সবথেকে সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন স্ত্রী-প্রাণীদের সঙ্গে যারা প্রজননের মরসুমে অন্যদের থেকে আগেই সন্তানের জন্ম দিতে পারবে) জোড় বাঁধলে যে সবথেকে বেশি সংখ্যক সন্তানের দিতে পারে, তা আমরা আগেই দেখেছি। এইসব স্ত্রী-প্রাণীরা তাদের সঙ্গী হিসেবে অধিকতর আকর্ষণীয় এবং প্রাণশক্তিসম্পন্ন পুরুষদের বেছে নিলে দুর্বলতর স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হবে তারা। দুর্বলতর স্ত্রী-প্রাণীরা তখন কম আকর্ষণীয় ও কম প্রাণশক্তিসম্পন্ন পুরুষদের সঙ্গে জোড় বাঁধতে বাধ্য হবে। আবার অধিকতর প্রাণশক্তিসম্পন্ন

পুরুষরা যদি অধিকতর আকর্ষণীয়, সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন ও প্রাণশক্তিসম্পন্ন স্ত্রী-প্রাণীদের বেছে নেয়, তাহলেও ঘটনাটা একই ঘটবে। পুরুষরা যদি স্ত্রী-প্রাণীদের স্বাধীনভাবে রক্ষা করে এবং বাচ্চাদের জন্মে খাবার সংগ্রহ করতে সাহায্য করে, তাহলে ফলটা আরও ভাল হবে। এইভাবে বেশি সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেওয়া আর তাদের লালনপালনের ব্যাপারে অধিকতর প্রাণ-শক্তিসম্পন্ন যুগলরা যে বাড়তি সুবিধেটা লাভ করে, সেটা যৌন নির্বাচনকে কার্যকরী হয়ে উঠতে সাহায্য করে থাকে। তবে স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা অনেক বেশি হলে-যৌন নির্বাচন আরও বেশি কার্যকরী হয়ে ওঠে। এই সংখ্যাধিক্যটা সাময়িক ও স্থানীয় অথবা স্থায়ী সংখ্যাধিক্য হতে পারে, জন্মের সময় থেকেই থাকতে পারে কিংবা পরবর্তীকালে স্ত্রী-প্রাণীদের বেশি সংখ্যায় ধ্বংসপ্রাপ্তির ফলে হতে পারে, অথবা পুরুষদের বহুগামিতার অপ্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবেও দেখা দিতে পারে। সংখ্যাধিক্যটা যেভাবেই ঘটুক না কেন, তার ফলাফল সবসময় একই হয়—আরও বেশি কার্যকরী হয়ে ওঠে যৌন নির্বাচনের নীতি।

স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীরাই সাধারণত বেশি পরিবর্তিত হয়েছে : সমগ্র প্রাণীজগতের যেখানেই স্ত্রী-পুরুষের বাহ্যিক চেহারায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, সেখানেই দেখা যায় স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীরা অনেক বেশি পরিবর্তিত হয়েছে (ছ'একটা ব্যতিক্রম বাদে)। স্ত্রী-প্রাণীদের সঙ্গে সাধারণত তার নিজের প্রজাতির বাচ্চাদের এবং একই বর্গের অন্যান্য পূর্ববয়স্ক সদস্যদের বেশ ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকে। প্রায় সমস্ত প্রাণীরই পুরুষদের কামনা স্ত্রীদের তুলনায় অনেক তীব্র হয় এবং এর মধ্যেই ওই ঘটনার উৎস নিহিত আছে বলে মনে হয়। ওই কামনা থেকেই পুরুষরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, স্ত্রী-প্রাণীদের সামনে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে নানারকম কায়দা-কসরত করে এবং বিজয়ী পুরুষেরা তাদের নিজেদের উৎকৃষ্টতাটা সঞ্চারিত করে দেয় তাদের পুরুষ-সন্তানদের মধ্যে। পুরুষ-সন্তান ও স্ত্রী-সন্তান উভয়েই কেন তাদের পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সমান উত্তরাধিকারী হয় না, তা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। সমস্ত স্ত্রীপায়ী প্রাণীদের পুরুষরা যে কামার্ত হয়ে স্ত্রী-প্রাণীদের পিছনে ধাওয়া করে, সেটা সকলেরই জানা। পাখিদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তবে মোরগরা অনেক সময় মুরগিদের পিছনে সেভাবে ধাওয়া করে না, বরং নিজেদের পালক দেখিয়ে, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে আর গলা থেকে নানারকম ডাক ছেড়ে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে মুরগিদের। কিছু কিছু মাছেদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যৌনমিলনের জন্যে স্ত্রী-মাছেদের থেকে পুরুষ-মাছেরা অনেক বেশি উদ্গ্রীব হয়ে থাকে। বড় কুমিরদের (alligator) ক্ষেত্রেও এই একই কথা

প্রযোজ্য এবং সম্ভবত উভচরদের (Batrachians) ক্ষেত্রেও। কার্ভি-র মতে, সব ধরনের কীটপতঙ্গদের ক্ষেত্রেই “নিয়মটা হল—পুরুষরা খুঁজে বেড়াবে স্ত্রীদের।” মিঃ ব্ল্যাকওয়েল এবং মিঃ সি. স্পেন্স বের্ট-এর মতো দুজন বিশেষজ্ঞ আমাদের জানিয়েছেন যে মাকড়সা এবং (চিংড়ি, কাঁকড়া জাতীয়) কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় ও অস্থির প্রকৃতির হয়ে থাকে। কীটপতঙ্গ ও কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে যে-সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনও একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে অল্পভূতির ইন্দ্রিয় বা সঞ্চরণ-অঙ্গ আছে এবং অন্য লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে নেই, অথবা, সচরাচর যেমনটা দেখা যায়, একটি লিঙ্গের প্রাণীদের এই অঙ্গগুলো অন্য লিঙ্গের প্রাণীদের থেকে অনেক বেশি উন্নত, তখন প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ওই অঙ্গগুলো পুরুষ-প্রাণীদের শরীরেই আছে বা তাদের মধ্যেই ওই অঙ্গগুলো বেশি উন্নত হয়ে উঠেছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে পুরুষরাই সাধারণত বেশি সক্রিয় হয়ে থাকে।^৭

অন্যদিকে, বিরলতম ছ’একটা ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রণয়ের ব্যাপারে স্ত্রীপ্রাণীদের আগ্রহ পুরুষদের থেকে অনেক কম হয়। হাণ্ডার বছরদিন আগেই বলেছিলেন যে স্ত্রী-প্রাণীদেরকে সাধারণত “প্রণয়ের জগ্ন মিনতি করতে হয়।” তারা লাজুক প্রকৃতির হয় এবং প্রায়শই পুরুষদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জগ্ন দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা চালিয়ে যায়। জীবজন্তুদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ যে-কোনও ব্যক্তিই এ ধরনের অনেক ঘটনার কথা মনে করতে পারবেন। বিভিন্ন তথ্য (পরে এ-রকম কিছু তথ্য পেশ করব, আমরা) ও যৌন নির্বাচনের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে স্ত্রী-প্রাণীরা তুলনামূলকভাবে নিষ্ক্রিয় হলেও তাদের একটা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার থাকে এবং অগ্নাত পুরুষদের ত্যাগ করে বিশেষ কোনও-একটি পুরুষকে গ্রহণ করে তারা। কখনও-কখনও এমনও দেখা যায় যে সবথেকে আকর্ষণীয় পুরুষটিকে গ্রহণ না করে সবথেকে কম অকর্ষক পুরুষটিকে গ্রহণ করে তারা। প্রণয়ের ব্যাপারে পুরুষদের অত্যধিক আগ্রহটা যেমন একটা সাধারণ নিয়ম, স্ত্রীদের এই পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার-

৭। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় এক ধরনের পরজীবী হাইমেনোপ্টেরাস (Hymenopteros) পতঙ্গের মধ্যে (ওয়েস্টউড, “মডার্ন ক্লাস অফ ইনসেক্টস”, খণ্ড ২, পৃঃ ১৬০)। এদের পুরুষদের ডানাগুলো একেবারে প্রাথমিক বা লুপ্তপ্রায় ধরনের হয় এবং যে কোষের মধ্যে এরা জন্মায় তা থেকে কখনও বেরিয়ে আসে না, অথচ এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরে সুগঠিত ডানা দেখা যায়। অতীতের মতে, এই প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গরা তাদের সঙ্গে একই কোষের মধ্যে জাত পুরুষ-পতঙ্গদের সহযোগেই গর্ভবতী হয়। তবে আমার মনে হয় এই প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গরা অন্যান্য কোষে যায় এবং সেখানেই গর্ভবতী হয়, আর তার ফলে জন্মসূত্রে নিকটসম্পর্কিতদের সহযোগে সম্ভাবনাটাকেও পরিহার করতে পারে। পরে আমরা আরও কিছু বর্গের কথা জানতে পারব যাদের স্ত্রীরাই সাধারণত পুরুষদের খুঁজে বেড়ায় এবং প্রণয়প্রার্থনা করে।

টাকেও তেমনই একটা সাধারণ নিয়ম হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

এত ধরনের পৃথক পৃথক বর্গের পুরুষ-প্রাণীরা প্রণয়ের ব্যাপারে কেন স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে বেশি আগ্রহী হয়, কেন তারা স্ত্রী-প্রাণীদের খুঁজে বেড়ায়, প্রেমনিবেদনের ব্যাপারে কেন তারাই সক্রিয় ভূমিকা নেয়—তার কারণটা আমাদের অল্পসন্ধান করে দেখা উচিত। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উভয়কে খুঁজে বেড়ালে সেটা মোটেই স্ববিধেজনক ব্যাপার হত না এবং তার ফলে কিছুটা শক্তিক্ষয়ও ঘটত। কিন্তু তাই বলে পুরুষরাই কেন সবসময় সন্ধানকারীর ভূমিকাটা পালন করে? পরাগিত হওয়ার পর উদ্ভিদদের ডিম্বকণ্ডলোর কিছুদিন পুষ্ট হওয়ার দরকার হয়, তারপর পরাগ এসে পড়ে স্ত্রী-অঙ্গে—কীটপতঙ্গের দ্বারা অথবা পুংকেশরের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ফলে পরাগ এসে পড়ে গর্ভমুণ্ডে। শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা ঘটে শুক্রাণুর সঞ্চরণ-শক্তির সাহায্যে। নিম্নশ্রেণীর জলচর প্রাণীরা, যারা বরাবর একই জায়গায় আবদ্ধ থাকে এবং যাদের লিঙ্গগুলি পৃথক পৃথক হয়, তাদের পুরুষ-উপাদানগুলোই এসে পড়ে স্ত্রী-উপাদানের ওপরে। এক্ষেত্রে কারণটা বুঝে নিতে আমাদের অস্ববিধে হয় না—গর্ভাধানের আগেই যদি ডিম্বাণু বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং তাকে পুষ্টি যোগানো বা রক্ষা করার দরকার যদি না হত, তাহলে পুরুষ-উপাদানকে স্থানান্তরিত করার তুলনায় ওই ডিম্বাণুকে স্থানান্তরিত করাটা অনেক বেশি দুর্লভ হয়ে উঠত, কারণ পুরুষ-উপাদানের থেকে এগুলো আকারে বড় হয় বলে এগুলো তৈরিও হয় কম সংখ্যায়। এ ব্যাপারে উদ্ভিদদের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর বেশ কিছু প্রাণীর সাদৃশ্য দেখা যায়। এক জায়গায় আবদ্ধ ও জলচর প্রাণীদের পুরুষরা যেহেতু তাদের জনন-উপাদানকে এইভাবেই প্রেরণ করতে বাধ্য হয়, সেহেতু তাদের কোনও বংশধর ক্রমপর্যায়ে উন্নত হয়ে ওঠা এবং চলাচল করতে সক্ষম হয়ে ওঠার পরেও তার মধ্যে এই অভ্যাসটা রয়েই যায়। তারা স্ত্রী-প্রাণীদের যতটা সম্ভব কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করে যাতে করে জলের মধ্যে তাদের জনন-উপাদানটা নষ্ট হওয়ার ভয় না থাকে। নিম্নশ্রেণীর কোনও কোনও প্রাণীদের শুধুমাত্র স্ত্রীরাই এক জায়গায় আবদ্ধ থাকে এবং সেইসব ক্ষেত্রে অল্পসন্ধানকারীর ভূমিকাটা পুরুষদের নিতেই হয়। কিন্তু যে-সব প্রজাতির উভয় লিঙ্গের পূর্বপুরুষরা একেবারে প্রথম থেকেই মুক্ত ছিল, সেইসব প্রজাতির ক্ষেত্রেও কেন পুরুষরাই সবসময় স্ত্রীদের খুঁজে বেড়ায় এবং স্ত্রীরা পুরুষদের খোঁজে না, তা বুঝে ওঠা দুষ্কর। তবে পুরুষরা যাতে এই খোঁজার কাজটা যথাযথভাবে করতে পারে, তার জ্ঞান সব ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে খুব তীব্র কামনা থাকার দরকার হয়। যৌনমিলনের জন্য অধিকতর আগ্রহী পুরুষরা কম আগ্রহীদের তুলনায় অনেক বেশি সন্তানের জন্ম দিতে পারে এবং সেই সন্তানরা জন্মসূত্রেই এই ধরনের তীব্র কামনা অর্জন করে থাকে।

যৌনমিলনের জন্ত পুরুষদের এই অত্যধিক আগ্রহের অপ্রত্যাশ্য ফল হিসেবেই স্ত্রীদের তুলনায় অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের মধ্যে অনেক বেশি করে ফুটে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু পুরুষদের পরিবর্তনশীলতা স্ত্রীদের থেকে বেশি হলে (গৃহপালিত জীবজন্তুদেরকে দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে আমি দেখেছি যে পুরুষদের পরিবর্তনশীলতা সত্যিই অনেক বেশি) এইসব বৈশিষ্ট্য-গুলো আরও ভালভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারত। বিস্তৃত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ফন নাথুমিয়াস-ও এই একই মত পোষণ করেন। নোভারা অভিযান^৮ চলার সময় বিভিন্ন জাতির মানুষদের শরীরের বিভিন্ন অংশের মাপ নিয়ে ব্যাপক অন্বেষণ চালানো হয়েছিল। তা থেকে দেখা গিয়েছিল যে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীদের তুলনায় পুরুষদের পরিবর্তনশীলতা অনেক বেশি হয়। এ ব্যাপারটা নিয়ে পরবর্তী কোনও পরিচ্ছেদে আলোচনা করব আমরা। মিঃ জে. উড, যিনি মানুষের পেশীসমূহের পরিবর্তনশীলতা নিয়ে দীর্ঘ অন্বেষণ চালিয়েছেন, তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, “প্রতিটি ব্যাপারে সর্বাধিক সংখ্যক অস্বাভাবিকতা দেখা গেছে পুরুষদের মধ্যেই।” তার আগে তিনি বলেছিলেন, “মোট ১০২ জন মানুষের প্রায় অর্ধেক জনের মধ্যে নারীদের থেকে অনেক বেশি বৈচিত্র্য দেখা গেছে, যা নারীদের পূর্ববর্ণিত অসম্পূর্ণতা সংক্রান্ত তত্ত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়।” একইভাবে অধ্যাপক ম্যাকালিস্টারও বলেছেন যে পেশীর পরিবর্তনশীলতাটা “খুব সম্ভবত নারীদের থেকে পুরুষদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়।” কয়েকটা পেশী মানুষের শরীরে সাধারণত দেখা যায় না, কিন্তু যেখানে দেখা যায় সেখানেও নারীদের থেকে পুরুষদের শরীরেই সেগুলো উন্নততর অবস্থায় থাকে (হৃৎকোষের কণা অবশ্য শোনা গেছে)। ডঃ বার্ট ওয়াইল্ডার হাত-পায়ে কুড়ির বেশি আঙুলবিশিষ্ট ১৭২ জন মানুষের একটা তালিকা তৈরি করেছিলেন যাদের মধ্যে ৮৬ জনই ছিল পুরুষ, ৩৯ জন নারী (অর্থাৎ পুরুষদের অর্ধেকের চেয়েও কম), বাকি ২৭ জন নারী না পুরুষ জানা যায়নি। তবে মনে রাখা দরকার যে এই ধরনের শারীরিক অস্বাভাবিকতাকে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে পুরুষদের তুলনায় নারীরা অনেক বেশি সতর্ক থাকে। ডঃ এল. মেয়ার বলেছেন যে নারীদের তুলনায় পুরুষদের কানের গড়ন বেশি পরিবর্তনশীল হয়। শেষত, নারীদের তুলনায় পুরুষদের শরীরের তাপও বেশিমাাত্রায় পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে।

নারীদের তুলনায় পুরুষদের সাধারণ পরিবর্তনশীলতা বেশি হওয়ার কারণ কী, তা আমাদের জানা নেই। তবে আমরা জানি অপ্রধান লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য-

৮। “Reise der Novara : Anthropolog. Theil,” পৃঃ ১১৬-১৬৯। ডঃ কে শার্জার এবং ডঃ শোয়ার্জ^৯ কৃত পরিমাপনের ভিত্তিতে হিসেবটা তৈরি করেছিলেন ডঃ ভাইসবাখ।

গুলো অত্যন্ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতির হয় এবং এই পরিবর্তনশীলতা কেবলমাত্র পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এখন আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে এই পরিবর্তনশীলতার কারণগুলোকে কিছুদূর পর্যন্ত বোঝা সম্ভব। যৌন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল হিসেবে পুরুষ-প্রাণীরা অনেক ব্যাপারেই তাদের নিজ নিজ প্রজাতির স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে বহুলাংশে পৃথক হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই দু'ধরনের নির্বাচনের ফলগুলোকে বাদ দিলেও দেখা যায় যে শারীরিক গঠনকাঠামোর পার্থক্যের দরুন স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে অল্প ধরনের কিছু পার্থক্যও থাকে। ডিম্বাণু তৈরির জন্য স্ত্রী-প্রাণীদের যথেষ্ট শারীরিক উপাদান ব্যয় করতে হয়, অত্যাধিক পুরুষদের শক্তিক্ষয় হয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াইতে গিয়ে, স্ত্রী-প্রাণীদের সন্ধানে এখানে-ওখানে ঘুরতে গিয়ে, গলা চিরে ডাকতে বা শিস্ দিতে গিয়ে, আকর্ষণকারী গন্ধ নিঃসরণ করা ইত্যাদি কাজে। এই শক্তিক্ষয়ের ব্যাপারটা সাধারণত খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। দলবদ্ধ মরসুমে পুরুষদের অতিরিক্ত সক্রিয়তার ফলে প্রায়শই তাদের গায়ের রঙ আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, পক্ষান্তরে স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে ওই সময় তেমন কোনও পরিবর্তন দেখা যায় না।^৯ মাহুয়ের মধ্যে, এমনকি প্রাণীজগতের অনেক নিয়ন্তরের থাকা লেপিডোপ্টেরাদের (Lepidoptera) মধ্যেও পুরুষদের শরীরের উত্তাপ স্ত্রীদের থেকে বেশি হয় এবং সেইসঙ্গে মাহুয়ের ক্ষেত্রে পুরুষদের নাড়ির গতি নারীদের থেকে একটু কম হয়। সবটা মিলিয়ে বলা যায়—স্ত্রী আর পুরুষের শারীরিক উপাদান ও শক্তি ব্যয়টা সম্ভবত প্রায় সমান সমানই, তবে দুটি লিঙ্গের ক্ষেত্রে এই ব্যয়টা কার্যকরী হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে ও ভিন্ন মাত্রায়।

উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য স্ত্রী আর পুরুষের শারীরিক গঠনকাঠামোয় কিছুটা পার্থক্য থাকতে বাধ্য, অস্তুত প্রজননের মরসুমে তো বটেই। এমনকি তারা উভয়ে হুবহু একই অবস্থার মধ্যে থাকলেও তাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকবেই। এইসব পার্থক্যগুলো যদি স্ত্রী ও পুরুষদের কোনও কাজে না লাগে, তাহলে এগুলো যৌন নির্বাচন বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে এড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্যমান কারণগুলো যদি স্থায়ীভাবে কাজ করে চলে তাহলে এই পার্থক্যগুলোও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারে এবং বংশগতির নিয়ম মেনে পুরুষ-প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো পুরুষ-বংশধরদের মধ্যে আর স্ত্রী-প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো স্ত্রী-বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে স্ত্রী আর

৯। অধ্যাপক মাটেয়াগার্লার মতে ("Lettera a Carlo Darwin", "Archivio per l'Anthropologia", ১৮৭১, পৃঃ ৩০৬) শত্রুতরল বা বীষের উপস্থিতি ও তা ধারণ করার ফলেই বহু পুরুষ-প্রাণীর গাত্রবর্ণে এই উজ্জ্বলতা দেখা যায়। কিন্তু তার এই কথাটাকে কিছুতেই সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ অনেক পুরুষ-পাখিরই, যেমন ফেজ্যান্ট পাখিদের, গায়ের রঙ তাদের স্ত্রীনের প্রথম বছরের শরৎকালেই বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

পুরুষ-প্রাণীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু স্থায়ী অথচ গুরুত্বহীন পার্থক্য পাকাপাকিভাবেই থেকে যাবে। যেমন মিঃ অ্যালেন দেখিয়েছেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে ও দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী বেশ কিছু পাখির ক্ষেত্রে দেখা যায় উত্তরাঞ্চলের পাখিদের থেকে দক্ষিণাঞ্চলের পাখিদের গাত্রবর্ণ অনেক বেশি কালচে হয়। দুটো অঞ্চলের তাপমাত্রা, রৌদ্রকিরণ ইত্যাদি পার্থক্যের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই দুটো অঞ্চলে বসবাসকারী পাখিদের গায়ের রঙে এই পার্থক্যটা সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে এই পার্থক্যটা আলাদা আলাদা ভাবে ক্রিয়া করেছে। যেমন দক্ষিণাঞ্চলের এজিলোকাস ফিনিসিয়াস (*Agelocus phoeniceus*) প্রজাতির পুরুষ-পাখিদের গায়ের রঙ খুব উজ্জ্বল, আবার ওই অঞ্চলের কার্ডিনালিস ভার্জিনিয়ানাস (*Cardinalis virginianus*) প্রজাতির স্ত্রী-পাখিদের গায়ের রঙ খুব উজ্জ্বল। কুইস্ক্যালাস মেজর (*Quiscalus major*) প্রজাতির স্ত্রী-পাখিদের গায়ের রঙ অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, কিন্তু এই প্রজাতির পুরুষ-পাখিদের গায়ের রঙে সাধারণত কোনও পরিবর্তন ঘটে না।

কয়েক ধরনের প্রাণীদের মধ্যে একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এদের ক্ষেত্রে পুরুষদের পরিবর্তে স্ত্রী-প্রাণীরাই সূক্ষ্মপটু অপ্রধান লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে, যেমন উজ্জ্বলতর গাত্রবর্ণ, বড় আকার, বেশি শক্তি বা যুদ্ধপ্রিয়তা ইত্যাদি। পাখিদের মধ্যে অনেক সময় উভয় লিঙ্গের নিজস্ব সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর একটা সামগ্রিক স্থানপরিবর্তন ঘটে যেতে দেখা যায়। এইসব ক্ষেত্রে প্রেম নিবেদনের ব্যাপারে স্ত্রী-পাখিরাই বেশি উন্মুখ হয়ে ওঠে আর পুরুষ-পাখিরা তুলনামূলকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, তবে ফলাফলের বিচার করলে দেখা যায় যে নিষ্ক্রিয় থাকলেও সঙ্গিনী হিসেবে তারা অধিকতর আকর্ষণীয় স্ত্রী-পাখিদেরকেই বেছে নেয়। এইভাবেই কয়েক জাতের মোরগদের থেকে সেইসব জাতের মুরগিরা অনেক বেশি উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ বা অল্প ধরনের চাকচিক্যের অধিকারিণী হয়ে উঠেছে, সেইসঙ্গেই হয়ে উঠেছে মোরগদের তুলনায় বেশি শক্তিশালী ও বেশি যুদ্ধপ্রিয়। এদের এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো শুধুমাত্র তাদের স্ত্রী-স্বস্ত্রানদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচনের একটা দ্বিমুখী প্রক্রিয়াও দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ এইসব ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাণীরা নির্বাচন করবে অধিকতর আকর্ষণীয় স্ত্রী-প্রাণীদের আর স্ত্রী-প্রাণীরা নির্বাচন করবে অধিকতর আকর্ষণীয় পুরুষ-প্রাণীদের। এই প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে দুটি লিঙ্গের প্রাণীদেরই কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে ঠিকই, কিন্তু এই প্রক্রিয়ার ফলে একটি লিঙ্গের প্রাণীদের সঙ্গে অপর লিঙ্গের প্রাণীদের কোনও পার্থক্য গড়ে উঠবে না—সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাদের কচির মধ্যে পার্থক্য থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্য কোনও

প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে অনেক প্রাণীর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়, উভয়েই একই ধরনের চাকচিক্যে ভূষিত হয়। এই সাদৃশ্য গড়ে ওঠে যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবেই। এই ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে খানিকটা সঙ্গতভাবেই হয়তো বলা চলে যে যৌন নির্বাচনের একটা দ্বিমুখী বা পারস্পরিক প্রক্রিয়া এর পিছনে কাজ করেছে, বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও অকালপক স্ত্রী-প্রাণীরা নির্বাচন করেছে অধিকতর আকর্ষণীয় ও বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন পুরুষ-প্রাণীদের আর পুরুষ-প্রাণীরা একমাত্র অধিকতর আকর্ষণীয় স্ত্রী-প্রাণী ছাড়া অন্যদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু জীবজন্তুদের বর্তাবচরিত্র অনুযায়ী বিচার করলে এই মতটাকে সঠিক বলে গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভবই হয়ে পড়ে, কারণ পুরুষ-প্রাণীরা সাধারণত যে-কোনও স্ত্রী-প্রাণীর সঙ্গেই মিলিত হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। বরং এর থেকে অনেক বেশি সম্ভাব্য যুক্তি হল এই যে, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান চাকচিক্যগুলো প্রথমে কোনও একটা লিঙ্গের প্রাণীরাই (সাধারণত পুরুষরাই) অর্জন করেছিল, পরে তাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের সম্ভানদের মধ্যেই সেগুলো সঞ্চারিত হয়ে গেছে। কোথাও যদি এমনটা হয়ে থাকে যে বেশ দীর্ঘ একটা সময়কাল জুড়ে কোনও প্রজাতির পুরুষদের সংখ্যা স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে গেল, তারপর সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় একটা দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে স্ত্রী-প্রাণীরা পুরুষ-প্রাণীদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি হয়ে উঠল, তাহলে সেক্ষেত্রে যৌন নির্বাচনের একটা দ্বিমুখী প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়ে উঠবে (তবে সেই প্রক্রিয়া দুটো যুগপৎ ঘটবে না), যার ফল হিসেবে দুটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য গড়ে উঠতে বাধ্য।

এর পরে আমরা দেখতে পাব যে এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের স্ত্রী বা পুরুষ কাকুরই গাত্রবর্ণ খুব উজ্জ্বল হয় না কিংবা শরীরে বিশেষ কোনও চাকচিক্য থাকে না, তা সত্ত্বেও তাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অথবা কোনও একটি লিঙ্গের প্রাণীরা যৌন নির্বাচন মারফত সাদামাটা গাত্রবর্ণের, যেমন সাদা বা কালো রঙের, অধিকারী হয়। উজ্জ্বল রঙ অথবা শরীরের অন্যান্য চাকচিক্যের অভাবটা কেন দেখা দেয়? হয়তো সঠিক ধরনের পরিবর্তন কখনও ঘটে না বলেই এই অভাবটা দেখা দেয়, কিংবা ওইসব প্রাণীরা বরাবর নিছক সাদা বা কালো রঙের সঙ্গীদের পছন্দ করে এসেছে বলেই এই অভাবটা দেখা দিয়েছে। হালকা গাত্রবর্ণ প্রায়শই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত গড়ে ওঠে। যৌন নির্বাচন মারফত অনেক প্রাণী খুব নজরকাড়া গাত্রবর্ণের অধিকারী হয়, কিন্তু সেইরঙই অনেক সময় তাদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ওই উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ আশ্বে আশ্বে হারিয়ে ফেলে তারা। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাণীরা বহু বহু

বছর ধরে স্ত্রী-প্রাণীদের দখল করার জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই করে গেছে অথচ তার কোনও ফল ফলে নি। এর ফল ফলতে পারে একমাত্র তখনই, যখন বেশি সফল পুরুষরা তাদের উৎকৃষ্টতার উত্তরাধিকারী হিসেবে কম সফল পুরুষদের চেয়ে বেশি সংখ্যক সন্তানসন্ততি রেখে যেতে পারে। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে এই বেশি সংখ্যক সন্তানসন্ততি রেখে যাওয়ার ব্যাপারটা বেশ কিছু জটিল ও অনিশ্চিত সম্ভাবনার ওপরে নির্ভর করে।

যৌন নির্বাচনের কার্যপদ্ধতি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো অত কঠোর নয়। সব যুগেই প্রাকৃতিক নির্বাচন কম সফল অথবা বেশি সফল প্রাণীদের একেবারে জীবন-মৃত্যুর ওপরে নিজের প্রভাব প্রসারিত করে দিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ-প্রাণীদের লড়াইয়ের ফলে মৃত্যুর ঘটনা তো আক্কাঁহারই ঘটে। তবে কম সফল পুরুষরা সাধারণত সঙ্গিনী হিসেবে কোনও স্ত্রী-প্রাণীকে যোগাড় করতে পারে না কিংবা হয়তো মরসুমের শেষের দিকে কোনও অনাকর্ষণীয় ও কম প্রাণ-শক্তিসম্পন্ন সঙ্গিনীকে পায়, আর বহুগামী হলে বেশি সফল পুরুষদের তুলনায় অনেক কম সংখ্যক স্ত্রী-প্রাণীর সঙ্গে মিলন করতে সক্ষম হয়। ফলস্বরূপ এদের সন্তানও হয় সংখ্যায় অল্প ও কম প্রাণশক্তিসম্পন্ন, এমনকি কখনও কখনও এদের কোনও সন্তানই হয় না। সাধারণ বা প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত অর্জিত শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর ব্যাপারে বলা যায় যে জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলো যতদিন একইরকম থাকে, ততদিন পর্যন্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুবিধাজনক পরিবর্তন ঘটে চলার একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকে। কিন্তু যে-সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একজন পুরুষকে অন্য পুরুষদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে সাহায্য করে (তা সে লড়াই করার ব্যাপারেই হোক অথবা স্ত্রী-প্রাণীদের আকৃষ্ট করার ব্যাপারেই হোক), সেগুলোর সুবিধাজনক পরিবর্তন ঘটে চলার কোনও সীমা থাকে না। যতদিন না সবথেকে সুবিধাজনক অবস্থাটা দেখা দেয়, ততদিন পর্যন্ত যৌন নির্বাচন তার কাজ করেছে চলে। অপ্রধান লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যগুলোর ক্ষেত্রে প্রায়শই যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেতে দেখা যায়, তার কিছুটা কারণ হয়তো এই ব্যাপারটার মধ্যেই নিহিত থাকে। স্বথাপি এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি খুব ক্ষতিকর ধরনের হয়, এগুলোর দরুন যদি তাদের প্রাণশক্তির অত্যধিক ক্ষয় ঘটে কিংবা তাদেরকে কোনও মারাত্মক বিপদের মুখে পড়তে হয়, তাহলে বিজয়ী পুরুষরা যাতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে না পারে তার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক নির্বাচন। তবে কয়েকটি অঙ্গের (যেমন কয়েক ধরনের পুরুষ-হরিণের শৃঙ্গ) বিকাশ একেবারে চরম উৎকর্ষের স্তরে পৌঁছে গেছে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে কয়েকটি অঙ্গের বিকাশ এমন একটা স্তরে পৌঁছে গেছে যা জীবনযাপনের সাধারণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ-প্রাণীদের পক্ষে কিছুটা ক্ষতিকরই হয়ে

উঠেছে। এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে অল্প পুরুষদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বা প্রণয়ের ব্যাপারে বিজয়ী এবং তার ফলস্বরূপ বেশি সংখ্যক সন্তান-সন্ততি রেখে যেতে সক্ষম পুরুষরা এই প্রক্রিয়া থেকে যে-সব সুবিধাগুলো অর্জন করে, সেগুলো জীবনযাপনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যথাযথ অংকোক্তনের দরুন প্রাপ্ত সুবিধাগুলোর থেকে পরবর্তীকালে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। একেবারে অভাবনীয় হলেও এটা সত্য যে অল্প পুরুষদের লড়াইতে পরাস্ত করার শক্তির থেকে স্ত্রী-প্রাণীদের মোহিত করে নিজের কাছে টেনে আনার শক্তিটা অনেক সময়েই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

বংশগতির নিয়ম

বিভিন্ন শ্রেণীর নানান প্রাণীদের ওপরে যৌন নির্বাচন কিভাবে প্রভাব ফেলেছে এবং সময়ের গতিপথে কিভাবে তা এক কোতুহলোদীপক ফলাফল সৃষ্টি করেছে, সেটা বুঝতে হলে বংশগতির নিয়মগুলো আমাদের অবশ্যই ভেনে নিতে হবে। “বংশগতি” অভিধাটির মধ্যে দুটি পৃথক বিষয় নিহিত থাকে — বংশধরদের মধ্যে জন্মস্থানে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হস্তান্তর এবং সেই বৈশিষ্ট্য-গুলির বিকাশ। তবে এই দুটো ব্যাপার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত বলে এদের পার্থক্যটা অনেক সময়ই তেমন গুরুত্ব পায় না। যে-সব বৈশিষ্ট্যগুলো জীবনের প্রথম দিকেই সঞ্চারিত হয় কিন্তু পরিণত বয়স বা বৃদ্ধ বয়সের আগে বিকশিত হয় না, সেগুলোর ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটাকে স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারি আমরা। অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলোর ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটাকে আরও স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়, কারণ এই বৈশিষ্ট্যগুলো দুটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই সঞ্চারিত হলেও বিকশিত হয় যে-কোনও একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দুটি পৃথক প্রজাতির মিশ্রণ বা সঙ্কর প্রজননের ক্ষেত্রে। সুস্পষ্ট যৌন বৈশিষ্ট্য সমন্বিত দুটি পৃথক প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষরা যখন মিলিত হয়, তখন তারা উভয়েই তাদের নিজ নিজ প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষদের বৈশিষ্ট্য-গুলো সঞ্চারিত করে দেয় তাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয় লিঙ্গেরই সঙ্কর সন্তানদের মধ্যে। স্ত্রী-প্রাণীরা বৃদ্ধ হলে বা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাদের মধ্যে কখনও-কখনও পুরুষ-প্রাণীমূলভ বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠতে দেখা যায় এবং এই ঘটনার মধ্যেও ওই একই বিষয় পরিস্ফুট হয়। যেমন, সাধারণ মুরগিরা বৃদ্ধ হলে বা অস্থস্থ হয়ে পড়লে মোরগদের মতো ল্যাঙ্গের ঢেউখেলানো পালক, ঘাড়ের পালক, মাথার ঝুঁটি, পায়ের পিছন দিকের নখরতুল্য অঙ্গ, কণ্ঠধর, এমনকি যুদ্ধপ্রিয় স্বভাবটা পর্যন্ত দেখা দেয় তাদের মধ্যে। আবার খোজা-করা পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যেও অনেক সময় স্ত্রীমূলভ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে দেখা যায়।

বুদ্ধ বয়স বা অস্থূল অবস্থা ছাড়াও অনেক সময় পুরুষ-প্রাণীদের কিছু বৈশিষ্ট্য স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। যেমন কয়েক ধরনের অল্পবয়সী ও স্বাস্থ্যবতী মুরগিদের পায়ের পিছনদিকে মোরগদের মতো নখরতুল্য অঙ্গ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই অঙ্গটা কিন্তু ওইসব মুরগিদের মধ্যে বিকশিতই হয়, কারণ এই নখরতুল্য অঙ্গের গঠনকাঠামোর প্রতিটা খুঁটিনাটি ব্যাপার স্ত্রী-প্রাণীদের কাছ থেকেই তাদের পুরুষ-সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে আমরা এমন অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করব যেখানে স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে পুরুষ-প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো কমবেশি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো নিশ্চয়ই পুরুষদের মধ্যেই প্রথমে দেখা দিয়েছিল, তারপর সেগুলো সঞ্চারিত হয়েছে স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যেও। এর উল্টো ঘটনাটা, অর্থাৎ স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে প্রথমে বিকশিত হয়ে ওঠা বৈশিষ্ট্যগুলো পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার ঘটনা সংখ্যায় অনেক কম। এ ব্যাপারে একটা চমৎকার উদাহরণ পেশ করা যায়। মোমাছিদের মধ্যে একমাত্র স্ত্রী-মোমাছিদের শরীরেই পরাগ সংগ্রহের অঙ্গ থাকে, যার সাহায্যে শুককীটদের জ্ঞপ্ত পরাগ সংগ্রহ করে তারা। পুরুষদের শরীরে এই অঙ্গটা থাকার কোনও উপযোগিতা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ প্রজাতির পুরুষ-মোমাছিদের শরীরে এই অঙ্গটাকে আংশিক বিকশিত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়, আর বম্বাস (Bombus) বা ভ্রমরদের পুরুষদের শরীরে এই অঙ্গটা নিখুঁতভাবে বিকশিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। হাইমেনোপ্টেরা (Hymenoptera) বর্গের আব কোনও পতঙ্গের মধ্যে এই পরাগ সংগ্রহের অঙ্গ দেখা যায় না, এমনকি মোমাছিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যবৃত্ত বোলতাদের মধ্যেও নয়। কিন্তু এ থেকে এমন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছানো যায় না যে একেবারে প্রথমদিকে পুরুষ-পতঙ্গরাও স্ত্রী-পতঙ্গদের মতোই পরাগ সংগ্রহ করে বেড়াত। তবে স্ত্রীপায়ী পুরুষ-প্রাণীরা যে একেবারে প্রথমদিকে স্ত্রী-প্রাণীদের মতোই তাদের সন্তানদের স্ত্রীপান করাত, এমনটা ভাবার কিছু কারণ আমাদের আছে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সঞ্চারিত হওয়া ও বিকশিত হওয়ার মধ্যকার এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের ব্যাপারটা সবথেকে ভালভাবে বোঝা যায় সর্বসৃষ্টিবাদ বা প্যানজেনেসিস (pangeneses) প্রকল্পের সাহায্যে। এই প্রকল্প অনুযায়ী, শরীরের প্রতিটি একক বা কোষ গেমিউল (gemmule) বা অবিকশিত অনু পরিত্যাগ করে, সেগুলো উভয় লিঙ্গেরই সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং স্ব-বিভাজনের সাহায্যে সেগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। জীবনের প্রথম বছরগুলোতে অথবা পরবর্তী কয়েকটি প্রজন্মের মধ্যে এগুলো অবিকশিত অবস্থাতেই রয়ে যেতে পারে। যে-সব একক বা কোষ থেকে তাদের উদ্ভব, সেইসব একক বা কোষের মতোই এদেরও এককে বা কোষে বিকশিত হওয়াটা নির্ভর করে বৃদ্ধির স্বাভাবিক

নিয়মের আগেই বিকশিত অন্ত্র একক বা কোষের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্যের ওপরে এবং সেই একক বা কোষগুলোর সঙ্গে তাদের মিলনের ওপরে।

জীবনের বিভিন্ন অনুরূপ পর্যায়ে বংশগতি : এই প্রবণতাটির অস্তিত্ব যথেষ্ট ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। ধরা যাক কোনও অল্পবয়সী প্রাণীর মধ্যে একটা নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। বৈশিষ্ট্যটা তার সারা জীবন ধরেই টিকে থাকুক কিংবা ক্ষণস্থায়ী হোক, ওই বৈশিষ্ট্যটা তার সন্তানদের মধ্যেও একই বয়সে দেখা দেয় এবং একই সময়কাল জুড়ে টিকে থাকে। অন্যদিকে, পরিণত বয়সে কিংবা এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও কোনও প্রাণীর মধ্যে যদি কোনও নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, তাহলে তার সেই বৈশিষ্ট্যটাও তার সন্তানের মধ্যে ওই একই বয়সে ফুটে উঠতে শুরু করে। এই নিয়মের যদি কোনও ব্যতিক্রম ঘটে, তাহলে সঞ্চারিত বৈশিষ্ট্যটি তার সন্তানের মধ্যে সাধারণত ওই বয়সের আগেই ফুটে ওঠে, পরে নয়। এই বিষয়টা নিয়ে অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমি, তাই এখানে শুধু পাঠককে একটু স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য ছ'একটা উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব। কয়েক ধরনের মুরগিদের মধ্যে একটা ব্যাপার লক্ষ করা যায়। পালকাবে মুরগিছানাদের প্রথম পালক-গুলো পরস্পরের থেকে আলাদা ধরনের হয়, পূর্ববয়স্ক মুরগিরাও পরস্পরের থেকে এবং তাদের সার্বজনীন পূর্বপুরুষ 'গ্যালাস ব্যাক্কিভা'-দের (Gallus Bankiva) থেকে অনেকটাই পৃথক ধরনের হয়ে থাকে। তাদের এই বৈশিষ্ট্য-গুলো তাদের সন্তানদের মধ্যেও ওই নির্দিষ্ট বয়সে ফুটে উঠতে দেখা যায়। যেমন গায়ে চুম্বিকর মতো দাগ-বিশিষ্ট হামবার্গ (Hamburg) মুরগিছানাদের শরীরে যখন পালকে ঢেকে যায়, তখন তাদের মাথা ও নিতম্বে কতকগুলো কালো-কালো দাগ ফুটে ওঠে, তবে মুরগিদের অন্ত্র বর্ণের মতো কোনও আড়াআড়ি ডোরা তাদের শরীরে দেখা যায় না। হামবার্গ মুরগিছানাদের শরীরে যখন প্রথম পালক দেখা দেয়, তখন "তাদের গায়ে চমৎকার তুলির কাজ ফুটে ওঠে", অর্থাৎ প্রতিটি পালকে বেশ কিছু আড়াআড়ি কালো ডোরা দেখা দেয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার পালক উদ্গমের সময় প্রতিটি পালকে^{১০} চুম্বিকর মতো কিংবা কালো-কালো গোল দাগ ফুটে ওঠে।^{১০} অর্থাৎ এই বর্ণের মুরগিদের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য দেখা দিয়েছে এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে জীবনের তিনটি পৃথক পৃথক পর্যায়ে। পায়রাদের মধ্যে আরও চমকপ্রদ একটা ব্যাপার লক্ষ করা যায়। এদের মূল প্রজাতিটির মধ্যে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পালকের কোনও পরিবর্তন ঘটে না, শুধু পরিণত বয়সে এদের বৃকের

১০। সর্বাধিক মুরগি-পালক মিঃ টিবে এই তথ্যগুলি জানিয়েছেন। দ্রষ্টব্য, টিপেট-মেইয়ার-এর "পোলাট্রি বুক", পৃঃ ১৬৮।

কাছটা আরও বেশি বর্ণময় হয়ে ওঠে। অথচ এই মূল প্রজাতি থেকে উদ্ভূত অন্যান্য কিছু বর্ণের পায়রা ছবার, তিনবার কিংবা চারবার পালক না খমানো পর্যন্ত নিজেদের বৈশিষ্ট্যসূচক রঙটি অর্জন করতে পারে না। পালকের এই পরিবর্তনগুলো তাদের বংশধরদের মধ্যে নিয়মিতভাবে সঞ্চারিতও হয়ে থাকে।

বছরের বিভিন্ন অনুরূপ মরসুমে বংশগতি : প্রকৃতির বুকে মুক্ত অবস্থায় থাকা পশুপাখিদের মধ্যে বছরের বিভিন্ন মরসুমে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা চোখে পড়ে। পুরুষ-হরিণের শিং আর উত্তর মেঝুর পশুদের লোমের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা লক্ষ করা যায়। শীতকালে পুরুষ-হরিণের শিং আর উত্তর মেঝুর পশুদের গায়ের লোম পুরু ও সাদা হয়ে যায়। শুধুমাত্র প্রজননের মরসুমে অনেক পাখিদের গায়ের রঙ উজ্জল হয়ে ওঠে এবং শরীরের অন্যান্য চাকচিক্যও বেড়ে ওঠে। প্যালাস বলেছেন যে শীতকালে সাইবেরিয়ার গৃহপালিত গবাদি পশু আর ঘোড়াদের গায়ের রঙ হালকা হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের নানা জাতের টাট্টুঘোড়াদের গায়ের রঙ যে বাদামি বা লালচে-বাদামি থেকে একেবারে ধবধবে সাদা হয়ে যায়, এ ঘটনা আমি নিজেও দেখেছি এবং এ-রকম অনেক ঘটনার কথা অন্যদের কাছে শুনেওছি। বছরের বিভিন্ন মরসুমে গাভ্রবর্ণ পরিবর্তনের এই প্রবণতাটা উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হয় কিনা তা আমার জানা নেই ঠিকই, তবে সম্ভবত সঞ্চারিত হয়, কারণ ঘোড়ারা তাদের গাভ্রবর্ণের যাবতীয় বৈচিত্র্যই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে থাকে। উত্তরাধিকারসূত্রে গাভ্রবর্ণ পরিবর্তনের এই ব্যাপারটা শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ কিছু মরসুমেই ঘটে থাকে বলে বিশেষ বিশেষ বয়সে বা লিঙ্গগত কারণে উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার থেকে এই ব্যাপারটার গুরুত্ব অনেকটাই কম।

লিঙ্গগত বংশগতি : প্রাণীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সমানভাবে সঞ্চারিত হওয়াটা বংশগতির সবথেকে সার্বজনীন রূপ। যে-সব প্রাণীদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য কোনও পার্থক্য থাকে না, তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তবে কোনও কোনও বৈশিষ্ট্য যে লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে প্রথম দেখা দেয়, শুধুমাত্র সেই লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সাধারণত সঞ্চারিত হয়ে থাকে। আমার “ভ্যারিয়েশনস আণ্ডার ডোমেস্টিকেশন” রচনায় এ ব্যাপারে প্রচুর নজির উপস্থাপিত করেছি আমি, তবু, এখানেও দু’একটা দৃষ্টান্ত পেশ করার চেষ্টা করছি। কয়েক ধরনের ভেড়া আর ছাগলের মধ্যে পুরুষ-প্রাণীদের মাথার শিঙের আকারের সঙ্গে স্ত্রী-প্রাণীদের শিঙের আকারের বিপুল পার্থক্য

থাকে। গৃহপালিত অবস্থায় অর্জিত এই পার্থক্যগুলো তাদের পুরুষ ও স্ত্রী-বংশধরদের মধ্যে নিয়মিতভাবে সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। বেড়ালদের মধ্যে সাধারণত শুধু কিছু মাদি-বেড়ালের গায়ের রঙই কচ্ছপের খোলার মতন হয় আর তাদের পুরুষ-বেড়ালদের গায়ের রঙ হয় লালচে ধরনের। বেশির ভাগ মুরগিদের মধ্যে একেকটি লিঙ্গের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো শুধুমাত্র সেই লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে থাকে। মুরগিদের মধ্যে এই ব্যাপারটা প্রায় সার্বজনীন। অল্প কিছু ক্ষেত্রে এদের বৈশিষ্ট্যগুলো উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় বটে, তবে তা নিতান্তই ব্যতিক্রম মাত্র। মুরগিদের কয়েকটি উপ-বর্গের পুরুষ-প্রাণীদের পরস্পরের মধ্যে প্রায় কোনও পার্থক্যই থাকে না, কিন্তু তাদের স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে গায়ের রঙের যথেষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। পায়রাদের মূল প্রজাতিটির স্ত্রী-পুরুষের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে কোনও পার্থক্য থাকে না, আবার কয়েক ধরনের গৃহপালিত পুরুষ-পায়রাদের গায়ের রঙ স্ত্রী-পায়রাদের থেকে অনেকটাই আলাদা হয়। ইংলিশ ক্যারিয়ার পায়রাদের (English Carrier pigeon) মাথার মাংসল উপাঙ্গ (wattle) আর নোটন পায়রাদের (Pouter) দেহের মধ্যকার থলির উপাঙ্গ—এই ছোটো জিনিসই স্ত্রী-পায়রাদের থেকে পুরুষ-পায়রাদের শরীরে অনেক বেশি সুবিকশিত অবস্থায় থাকে। মানুষ কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদি নির্বাচন মারফতই এরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করেছে সত্যি, তবু স্ত্রী আর পুরুষ-পায়রাদের মধ্যকার ছোটখাটো পার্থক্য-গুলো পুরোপুরিভাবেই উত্তরাধিকারস্বত্রে সঞ্চারিত হয়েছে। কারণ এই পার্থক্যগুলো তাদের প্রতিপালকের ইচ্ছানুসারে উদ্ভূত হয় নি, বরং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এগুলো উদ্ভূত হয়েছে।

আমাদের গৃহপালিত পশুদের অধিকাংশ বর্গই গড়ে উঠেছে বহু ছোটখাটো পার্থক্যের পুঞ্জীভবনের ফলে। পরবর্তীকালের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয়েছে শুধুমাত্র বিশেষ একটি লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে, আবার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয়েছে উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই। এর ফলে একই প্রজাতির প্রাণীদের বিভিন্ন বর্গের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পর্যন্ত যাবতীয় ক্রমবিচ্ছিন্নতার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। মুরগি আর পায়রাদের কথা তো আমরা আগেই বলেছি। প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা প্রাণীদের মধ্যেও এ-রকম ঘটনা অনেক দেখা যায়। মুক্ত অবস্থায় থাকা প্রাণীদের ক্ষেত্রে কী হয় তা বলতে পারব না, তবে গৃহপালিত পশুদের ক্ষেত্রে অনেক সময় কোনও একটি লিঙ্গের প্রাণীরা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে ফেলে এবং তার ফলে অন্য লিঙ্গের প্রাণীদের সঙ্গে তাদের আর প্রায় কোনও পার্থক্য থাকে না। যেমন, কয়েক ধরনের মোরগরা তাদের পুরুষোচিত ল্যাজের পালক ও ঘাড়ের পালক হারিয়ে ফেলেছে। আবার গৃহপালিত

অবস্থায় জুটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যকার পার্থক্যটা বেড়ে যেতেও পারে, যেমনটা ঘটেছে মেরিনো-ভেড়াদের ক্ষেত্রে। এদের জ্ঞা-প্রাণীরা তাদের মাথার শিং হারিয়ে ফেলার দরুন পুরুষদের সঙ্গে তাদের পার্থক্যটা আরও বেড়ে গেছে। আবার কখনও-কখনও কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-গুলো আকস্মিকভাবে ফুটে উঠতে পারে অল্প লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে। যেমন, কয়েক ধরনের মুরগিরা অল্পবয়সে মোরগদের মতো পায়ের পিছনদিকের নখর-তুল্য অঙ্গটা লাভ করে থাকে। পোলিশ মুরগিদের কয়েকটি উপ-বর্গের জ্ঞা-প্রাণীরাই প্রথমে মাথার খুঁটি অর্জন করেছিল (এটা মনে করার সঙ্গত কারণও আছে), পরে তাদের কাছ থেকে পুরুষরাও সেটা লাভ করে। এইসব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায় একমাত্র সর্বসৃষ্টিবাদের (pangenesis) প্রকল্পের সাহায্যেই, কারণ উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকলেও এগুলো আসলে নির্ভর করে কয়েকটি অঙ্গের ভ্রূণরূপের ওপরে, যেগুলো গৃহপালিত অবস্থায় থাকার প্রভাবে যে-কোনও একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠে আসতে পারে এবং সেটা নিয়ে পরবর্তী কোনও পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করাটাই সুবিধাজনক। প্রশ্নটা হল—কোনও-একটা বৈশিষ্ট্য প্রথমে উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই দেখা দেওয়ার পর সেটার বিকাশ নির্বাচন মারফত শুধুমাত্র কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে কিনা। ধরা যাক একজন পায়রা-পালক স্থির করল যে তার কয়েকটা পায়রার গায়ের রঙ নীলচে করে তোলা দরকার (পায়রাদের বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে সমানভাবেই সঞ্চারিত হয়ে থাকে)। এ-রকম অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি নির্বাচনের সাহায্যে সে কি পায়রাদের এমন একটা বর্ণ সৃষ্টি করতে পারবে যাদের মধ্যে শুধু পুরুষদের গাত্রবর্ণই নীলচে হবে আর জ্ঞা-পায়রাদের গায়ের রঙ অপরিবর্তিতই রয়ে যাবে? এর উত্তরে এখানে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে এ-রকম একটা ঘটনা ঘটানো একেবারে অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত দুর্লভ, কারণ নীলচে গাত্রবর্ণের পুরুষদের দিয়ে বংশবিস্তার করানোর চেষ্টা করার অর্থ হল ওই বর্গের জ্ঞা ও পুরুষ সমস্ত পায়রাদেরই গাত্রবর্ণ নীলচে হয়ে যাওয়া। তবু ধরা যাক সেই প্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটল, প্রথম থেকেই নীলচে রঙটা সীমাবদ্ধ রইল শুধু পুরুষ-পায়রাদের মধ্যেই। এ-রকমটা যদি সত্যিই ঘটে, তাহলে আলাদা গাত্রবর্ণের জ্ঞা-পুরুষবিশিষ্ট একটা বর্ণ গড়ে তোলাটা আর অসম্ভব হবে না। বেলজিয়ান বর্গের এক ধরনের পায়রাদের মধ্যে ঠিক এই ঘটনাটাই দেখা যায়, যাদের মধ্যে শুধু পুরুষ-পায়রাদের শরীরেই কালো রঙের ডোরা থাকে। একইভাবে, কোনও জ্ঞা-পায়রার মধ্যে যদি কোনও-একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য

ফুটে ওঠে যে বৈশিষ্ট্যটা প্রথম থেকে শুধুমাত্র জী-পায়রাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহলে তাকে দিয়ে পায়রাদের এমন একটা বর্ণ সৃষ্টি করা যেতে পারে যেখানে ওই বৈশিষ্ট্যটা শুধুমাত্র জী-পায়রাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। কিন্তু ওই বৈশিষ্ট্যটা যদি প্রথম থেকে শুধু জী-পায়রাদের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে জী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই থেকে থাকে, তাহলে এ-রকম একটা বর্ণ সৃষ্টি করা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে উঠবে তো বটেই, এমনকি ব্যাপারটাকে একেবারে অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না।^{১১}

কোনও-একটি বৈশিষ্ট্যের বিকশিত হলে ওঠার সময়কাল এবং কোনও-একটি লিঙ্গের অথবা উভয় লিঙ্গেরই বংশধরদের মধ্যে তা সঞ্চারিত হওয়ার মধ্যকার সম্পর্ক প্রসঙ্গে : প্রাণীদের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য কেন তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধররাই উত্তরাধিকারস্বত্বে লাভ করবে, আবার কেনই বা অল্প কয়েকটা বৈশিষ্ট্য লাভ করবে শুধু বিশেষ একটি লিঙ্গের বংশধররাই (অর্থাৎ যে লিঙ্গের পূর্বপুরুষদের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যটি প্রথম দেখা দিয়েছিল, শুধু সেই লিঙ্গের বংশধররাই)—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার কারণটা আমাদের অজানা। পায়রাদের কয়েকটা উপ-বর্ণের মধ্যে গায়ের কালো ডোরাগুলো জী-পায়রাদের মারফত সঞ্চারিত হলেও কেন শুধু পুরুষদের মধ্যেই তা বিকশিত হয় অথচ অল্পাংশ যাবতীয় বৈশিষ্ট্য জী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে সঞ্চারিত হয়—তার কারণটা অনুমান করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বেড়ালদের ক্ষেত্রে দু'একটা ব্যতিক্রম বাদে কেন শুধু মাদি-বেড়ালদের শরীরেই কচ্ছপের খোলার মতো রঙ ফুটে ওঠে, আমরা জানি না। মানুষের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। কোনও কোনও পরিবারে হাতে বা পায়ে বেশি বা কম আঙুল থাকা, বর্ণান্ধতা ইত্যাদি কিছু বৈশিষ্ট্য কেন সেই পরিবারের শুধুমাত্র পুরুষ-সদস্যদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়, আবার অল্প কোনও পরিবারে ওই বৈশিষ্ট্যগুলোই কেন শুধুমাত্র জী-সদস্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় (যদিও উভয় ক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো সঞ্চারিত হয়

১১। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর মিঃ টেগেটমেরার-এর মতো একজন অভিজ্ঞ পায়রা-পালকের দ্বাব মন্তব্যজনক একটা মন্তব্য আমার নজরে এসেছে। পায়রাদের জীবনের কিছুর বিচিত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। গাছবর্ণ বিভাবে শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয় এবং তারপর বিভাবে ওই বৈশিষ্ট্যটি মিশ্রিত একটি উপ-বর্ণ গড়ে ওঠে, তার বিবরণ দেওয়ার পর তিনি মন্তব্য করেছেন : “কৃত্রিম নির্বাচন মারফত পায়রাদের জী-পুরুষের গাছবর্ণের পায়রাদের ঘটানোর যে সম্ভাবনাটার কথা মিঃ ডারউইন উল্লেখ করেছেন, তা সত্যিই এক চমকপ্রদ বস্তু। ওই কথাগুলো যখন তিনি লিখেছিলেন, তখন আমার দ্বারা উপস্থাপিত এইসব তথ্যগুলোর কথা তাঁর জানাও ছিল না। অথচ তা সত্ত্বেও এই ব্যাপারটা ঘটানোর সঠিক পদ্ধতিটা কী হতে পারে, তা প্রায় নির্ভুলভাবেই তুলে ধরতে পেরেছিলেন তিনি।”

বিপরীত লিঙ্গ ও সমলিঙ্গ—উভয় লিঙ্গেরই পূর্বপুরুষদের মারফত)—তার কারণও আমাদের জানা নেই। তবে এ-রকম অনেক কিছু আমাদের জানা না থাকলেও দুটো নিয়ম এ-সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেই মনে হয়। প্রথমত, যে-সব বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথমে কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে বেশি বয়সে দেখা দেয়, সেইসব বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু সেই লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়। দ্বিতীয়ত, যে-সব বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথমে কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে অল্প বয়সে দেখা দেয়, সেইসব বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের উভয় লিঙ্গেরই বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। তবে এ দুটোই যে এইসব ঘটনার একমাত্র নিয়ম বা কারণ, এমন কথা আমি মোটেই বলতে চাইছি না। যেহেতু এ বিষয়টা নিয়ে আমি অন্য কোথাও আলোচনা করিনি এবং যেহেতু যৌন নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু এটা নিয়ে এখানে একটু বিস্তৃত ও জটিল আলোচনায় যেতে বাধ্য হচ্ছি আমি।

একটা সম্ভাবনার কথা বলি। প্রাণীদের মধ্যে অল্প বয়সে কোনও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলে সেই বৈশিষ্ট্যটা তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধররাই উত্তরাধিকারস্বত্বে লাভ করতে পারে, কারণ প্রজনন-ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠার আগে পৰ্বস্তু স্ত্রী-পুরুষের গঠনকাঠামোয় তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না। অন্যদিকে, প্রজনন-ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পর যখন স্ত্রী ও পুরুষের গঠনকাঠামোর মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়, তখন একটি লিঙ্গের সদস্যদের যে অঙ্গগুলি অন্য লিঙ্গের সদস্যদের থেকে আলাদা সেই অঙ্গগুলি থেকে নির্গত কোষগুলোর (gemmule—সর্বসৃষ্টিবাদের পরিভাষায় বললে) মধ্যে একই লিঙ্গের কলাগুলির (tissue) সঙ্গে মিলিত হওয়ার সক্ষমতা থাকাটা একান্তই স্বাভাবিক এবং তার ফলে বিপরীত লিঙ্গের কলাসমূহ ছাড়াই সেগুলি বিকশিত হয়ে উঠতে পারে।

আমি অনুমান করেছিলাম যে এ-রকম একটা সম্পর্কের অস্তিত্ব থাকলেও থাকতে পারে। কেন অনুমান করেছিলাম? আসলে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের পার্থক্যটা যখনই ষটুক না কেন, সেই পার্থক্যটা যে প্রকৃতির হয় ঠিক সেই প্রকৃতির পার্থক্যই তাদের থাকে অল্পবয়সী পুরুষ ও নারী, উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের সঙ্গেই—এই সূত্রটা থেকেই ওই অনুমানে পৌঁছেছিলাম আমি। এই ব্যাপারটা প্রায় সার্বজনীন। প্রায় সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, উভচর জীব এবং মাছেদের ক্ষেত্রে এটা সত্য। বিভিন্ন ধরনের কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণী (চিংড়ি, কঁাকড়া জাতীয়), মাকড়সা এবং কয়েক ধরনের কীটপতঙ্গ সম্বন্ধেও (যেমন পদ্মপাল, গন্ধাফড়িং ইত্যাদি) এই একই কথা প্রযোজ্য। এদের সবার ক্ষেত্রেই যে-সব পার্থক্যগুলোর পুঞ্জীভবনের ফল হিসেবে পুরুষরা তাদের যথাযথ পুরুষোচিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করেছে, সেইসব

পার্শ্বক্যগুলো নিশ্চয়ই তাদের জীবনে কিছুটা বেশি বয়সেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, অল্পথায় অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যেও এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যেতে পারত। এইসব বৈশিষ্ট্যসূচক পার্শ্বক্যগুলো শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যেই সঞ্চারিত ও বিকশিত হয় এবং এটা এই নিয়মের অস্তিত্বকে আরও সপ্রমাণ করে। আবার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে যখন উভয় লিঙ্গেরই অল্পবয়সী সদস্যদের (দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া যারা সবসময়েই পরস্পরের সদৃশ হয়) ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়, তখন ওই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদেরও সাধারণত সাদৃশ্য থাকে। এই ধরনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে-সব পার্শ্বক্য-গুলোর সাহায্যে অল্পবয়সী ও প্রাপ্তবয়স্করা তাদের বর্তমান চারিত্রিকতা লাভ করেছে, আমাদের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো খুব সম্ভবত অল্প বয়সেই অর্জন করেছিল তারা। তবে এ ব্যাপারে সন্দেহের কিছুটা অবকাশ রয়েছে যায়, কারণ অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো পিতামাতার মধ্যে যে বয়সে প্রথম দেখা দিয়েছিল, তার থেকে কম বয়সেই সেগুলো সঞ্চারিত হয়ে যায় সন্তানদের মধ্যে। অর্থাৎ পিতামাতা যে বৈশিষ্ট্যগুলো বেশি বয়সে অর্জন করেছিল, সন্তানরা সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী হয়ে ওঠে অল্প বয়সেই। তাছাড়া এমন অনেক পশুও আছে যাদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকলেও তাদের অল্পবয়সী সন্তানদের সঙ্গে তাদের উভয়েরই পার্শ্বক্য থাকে। এইসব ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক পশুরা তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিশ্চয়ই বেশি বয়সে অর্জন করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের উভয় লিঙ্গেরই বংশ-ধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় (আমাদের নিয়মের সঙ্গে যা আপাতভাবে সাংঘ্য-পূর্ণ নয়)। তবে উভয় লিঙ্গের সদস্যরা একইরকম অবস্থায় থাকলে একটু বেশি বয়সে তাদের উভয়ের মধ্যেই একইসঙ্গে একই ধরনের আরও নানান বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠাও একেবারে অসম্ভব নয়। এইসব ক্ষেত্রে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের উভয় লিঙ্গেরই সন্তানদের মধ্যে একটু বেশি বয়সে সঞ্চারিত হবে। সেক্ষেত্রে ওই পূর্ববর্তী নিয়মটা, অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যগুলো বেশি বয়সে দেখা দেয়, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু সেই লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয় যে-লিঙ্গের পূর্বপুরুষদের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথম দেখা দিয়েছিল—এই নিয়মটার সঙ্গে আমাদের শেবোক্ত বক্তব্যটার কোনও প্রকৃত বিরোধ থাকে না। দ্বিতীয় নিয়মটা, অর্থাৎ যে-কোনও লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য দেখা দিলে সেটা তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়—এই নিয়ম-টাই বরং আরও বেশি সার্বজনীন সত্য। সমগ্র প্রাণীজগতে এই দুটি নিয়ম ঠিক কতখানি প্রসারিত তার পরিমাপ করা নিতান্তই অসম্ভব। তাই এদের মধ্যে থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তকে পর্যালোচনা করে সেই পর্যালোচনার ফলাফলের ওপরেই নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছি আমি।

এই পর্যালোচনার পক্ষে হরিণরা একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। এদের মাত্র একটি প্রজাতি বাদে বাকি সমস্ত প্রজাতির মধ্যে শুধু পুরুষদের মাথাতেই শৃঙ্গ দেখা যায়—যদিও নিশ্চিতভাবেই তা জী-হরিণদের মারফতই সঞ্চারিত হয় এবং তাদের শরীরেও এই অঙ্গটির অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে পারে। আবার বলগা-হরিণদের ক্ষেত্রে জী-হরিণদের মাথাতেও শৃঙ্গ থাকে। আমাদের প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী বলতে গেলে বলতে হয়—এই প্রজাতির মধ্যে মাথার শৃঙ্গটা নিশ্চয়ই খুব অল্পবয়সেই দেখা দেয়, অর্থাৎ দুটি লিঙ্গের সদস্তরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠে তাদের গঠনকাঠামোয় ব্যাপক পার্থক্য দেখা দেওয়ার অনেক আগে। অন্য সমস্ত প্রজাতির মধ্যে শৃঙ্গটা নিশ্চয়ই বেশি বয়সে দেখা দেয়, ফলে সেটা শুধু সেই লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে যে-লিঙ্গের পূর্বপুরুষদের মধ্যেই সেটা প্রথম দেখা দিয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী হরিণদের বিভিন্ন বর্গের সাতটি প্রজাতির শুধু পুরুষদের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে। এই শৃঙ্গ-গুলো দেখা দেয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। রৌ প্রজাতির পুরুষ-হরিণদের মাথায় শৃঙ্গটা দেখা দেয় জন্মের ন'মাস পর। আকারে বড় অন্য ছ'টি প্রজাতির পুরুষ-হরিণদের মাথায় শৃঙ্গগুলো দেখা দিতে শুরু করে জন্মের দশ, বারো অথবা আরও কিছু মাস পর থেকে।^{১২} বলগা-হরিণদের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। আমাকে সাহায্য করার জন্য ল্যাপল্যাণ্ড অঞ্চলে এ ব্যাপারে বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন অধ্যাপক নিলসন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে জন্মের চার-পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই এদের জী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই শৃঙ্গ দেখা দেয়। অর্থাৎ এখানে আমরা হরিণদের এমন একটা প্রজাতির সন্ধান পাচ্ছি যাদের মধ্যে নিতান্ত অল্প বয়সেই একটা বিশেষ অঙ্গ দেখা দেয় এবং শুধু এই একটি প্রজাতির ক্ষেত্রেই অঙ্গটা দেখা দেয় উভয় লিঙ্গেরই সদস্তদের মধ্যে।

কয়েক ধরনের কুম্ভার যুগদের শুধু পুরুষদের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে, তবে কুম্ভার যুগদের বেশির ভাগ বর্গের মধ্যে জী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই শৃঙ্গ দেখা যায়। এই শৃঙ্গ তাদের মধ্যে ঠিক কোন্ বয়সে দেখা দেয়, সে ব্যাপারে মিঃ ব্রাইদ আমাকে একটা তথ্য জানিয়েছেন। এক সময় চিড়িয়াখানায় একটা অল্পবয়সী

১২। এ ব্যাপারে মিঃ কাপ্‌ল'স'-এর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। ব্রেভালবেনের মাকুইসের মূখ্য-বনপাল মিঃ রবার্ট'সনের কাছ থেকে স্কটল্যান্ডের রোবাক আর রেড ডিয়ারদের ব্যাপারে তথ্যগুলো তিনিই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন আমার হয়ে। পিজলবর্ণ ফ্যালো-ডিয়ারদের ব্যাপারে তথ্যাদির জন্য আমি মিঃ ইটন ও অন্যান্যদের কাছে ঋণী। উত্তর আমেরিকার 'সার্ভাস আল্‌সেস'-দের (cervus alces) ব্যাপারে দ্রুটব্য, "ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার," ১৮৬৮, পৃঃ ২২৯ ও ২৫৪। ওই মহাদেশেরই 'সি. ভার্জিনিয়ানাস' এবং 'স্ট্রাজিলোসেন্স'-দের ব্যাপারে দ্রুটব্য, জে. ডি. ক্যাপটন-এর প্রবন্ধ, "ওটাওরা অ্যাকাডেমি অফ ন্যাচারাল সায়েন্স", ১৮৬৮, পৃঃ ১০। পেগুর 'সার্ভাস এল্‌ভ'-দের ব্যাপারে দ্রুটব্য, লেফটেন্যান্ট বিডেন, "গ্রাসিডির অফ জুও-লজিক্যাল সোসাইটি", ১৮৬৭, পৃঃ ৭৬২।

কুড়ু হরিণ (*Ant. strepsiceros*) ছিল যাদের শুধু পুরুষদের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে, আর এদের প্রায় সমগোত্রীয় ইল্যাণ্ড (*Ant. oreas*) প্রজাতির একটা অল্পবয়সী হরিণ ছিল যাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে। এদের দুজনের বেলাতেই আমাদের প্রস্তাবিত নিয়মটির সত্যতা লক্ষ করা গিয়েছিল। দশ মাস বয়সী পুরুষ-কুড়ুটির শৃঙ্গগুলো ছিল খুবই ছোট মাপের (অর্থাৎ শৃঙ্গগুলো শেষ পর্যন্ত যতটা বড় হয়, তার তুলনায় ছোট), অথচ ওই পুরুষ ইল্যাণ্ড হরিণটির বয়স মাত্র তিন মাস হওয়া সত্ত্বেও তার শৃঙ্গগুলো কুড়ু হরিণটির শৃঙ্গের চেয়ে অনেক বড় ছিল। আরেকটা উল্লেখযোগ্য তথ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। কাঁটার মতো শৃঙ্গবিশিষ্ট কৃষ্ণসার মৃগদের^{১৩} স্ত্রী-হরিণদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের (মোটামুটি প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনের) মাথায় শৃঙ্গ দেখা যায়। এই শৃঙ্গগুলো একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় থাকলেও কখনও-কখনও প্রায় চার ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। তাই বলা যায় যে শুধুমাত্র পুরুষদের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকার নিয়মটির ব্যাপারে এই প্রজাতির প্রাণীরা একটা মধ্যবর্তী স্তরে আছে এবং জন্মের পর পাঁচ-ছ' মাস না কাটা পর্যন্ত এদের মাথায় শৃঙ্গ দেখা দেয় না। অন্যান্য কৃষ্ণসার মৃগদের মাথায় এবং হরিণ, গবাদি পশু ইত্যাদি প্রাণীদের মাথায় শৃঙ্গের উদ্যম সন্দেহে আমরা যেটুকু জানি, তার সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হয় যে কাঁটার মতো শৃঙ্গবিশিষ্ট কৃষ্ণসার মৃগদের মাথায় শৃঙ্গ দেখা দেয় জীবনের একটা মাঝামাঝি সময়ে—গবাদি পশু আর ভেড়াদের মতো খুব আগেও নয়, আবার বড় বড় হরিণ ও বড় কৃষ্ণসার মৃগদের মতো খুব পরেও নয়। ভেড়া, ছাগল ও গবাদি পশুদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই সুবিকশিত শৃঙ্গ থাকে (স্ত্রী আর পুরুষের শৃঙ্গের মাপ অবশ্য সমান হয় না) এবং সেটা তাদের জন্মের সময়ই বা তার কয়েকদিন পরেই অন্বেষণ করা যায়, এমনকি অনেক সময় দেখাও যায়।^{১৪} তবে কয়েক ধরনের ভেড়াদের বেলায় এই নিয়মটা প্রযোজ্য নয়। যেমন মেরিনো ভেড়াদের শুধু পুরুষদের মাথাতেই শৃঙ্গ দেখা যায়। সাধারণ জাতের যে-সব ভেড়াদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই শৃঙ্গ দেখা যায়, তাদের এই শৃঙ্গ যে-বয়সে ফুটে ওঠে, মেরিনো ভেড়াদের মাথার শৃঙ্গও যে সেই বয়সেই ফুটে ওঠে সেটা আমি

১৩। অ্যান্টিলোকাপ্রা আমেরিকানা (*Antilocapra Americana*)। এদের স্ত্রী-হরিণদের শৃঙ্গের ব্যাপারে তথ্যের জন্য ডঃ ক্যান্টাফিল্ড-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

১৪। উত্তর ওয়েল্‌স অঞ্চলের হরিণদের মাথার শৃঙ্গের আশিত্ব তাদের জন্মের সময়েই অনুভব করা যায়, এমনকি কখনও-কখনও জন্মের সময়েই তা এক ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বাও হয়ে থাকে। ইউয়াট (Youatt) বলেছেন (“ক্যাটল”, ১৮৩৪, পৃঃ ২৭৭) যে গবাদি পশুদের মাথার উঁচু লগাটাস্টিটা তাদের জন্মের সময়ই স্বকের মধ্যে ঢুকে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যেই ওই জায়গায় শৃঙ্গ গঠনের উপাদানগুলি সঞ্চিত হয়।

অহুসঙ্কান চালিয়ে দেখেছি।^{১৫} গৃহপালিত ভেড়াদের ক্ষেত্রে কিন্তু শৃঙ্গের উপস্থিতি বা অহুপস্থিতিটা কোনও অপরিবর্তনীয় নিয়ম নয়। যেমন মেরিনো ভেড়ীদের কয়েকজনের মাথায় ছোট ছোট শৃঙ্গ দেখা যায়, আবার এদের কিছু কিছু পুরুষ-ভেড়া শৃঙ্গহীন হয়। অধিকাংশ বর্গের মধ্যেই মাঝেমাঝে শৃঙ্গহীন ভেড়ী দেখা যায়।

অনেক পাখির মাথায় যে স্ফীত অংশটি দেখা যায়, তা নিয়ে সম্প্রতি ওকটি বিশেষ পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন ডঃ ডব্লিউ. মার্শাল। ওই পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : যে-সব প্রজাতির ক্ষেত্রে এই স্ফীত অংশটি শুধুমাত্র পুরুষদের মাথাতেই দেখা যায়, তাদের ক্ষেত্রে এটির উদগম ঘটে একটু বেশি বয়সে ; কিন্তু যে-সব প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই এই অংশটি দেখা যায়, তাদের ক্ষেত্রে এটির উদগম ঘটে খুব কম বয়সে। বংশপতির যে দুটি নিয়মের কথা আমি বলেছি, মিঃ মার্শালের এই সিদ্ধান্ত সেগুলিকে সত্য হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে।

ফেজ্যান্ট বর্গের অধিকাংশ প্রজাতির পাখিদের ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পাখিদের সঙ্গে পুরুষ-পাখিদের প্রচুর পার্থক্য থাকে এবং পুরুষরা তাদের শরীরের অঙ্গ-সজ্জাগুলো অর্জন করে একটু বেশি বয়সে। তবে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় কর্ণযুক্ত ফেজ্যান্টদের (*Crossoptilon auritum*) ক্ষেত্রে। এদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের শরীরেই ল্যাজের শেষপ্রান্তে পালকগুচ্ছ থাকে, কানে বড় বড় রোমগুচ্ছ থাকে এবং মাথার চারপাশে থাকে টকটকে লাল রোমগুচ্ছ। এই যাবতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো এদের মধ্যে খুব অল্প বয়সেই দেখা দেয় এবং সেটা আমাদের কথিত নিয়মের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণও বটে। তবে পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-পাখিদের থেকে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-পাখিদের আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় তাদের পায়ের পিছনদিকে নখরতুল্য অঙ্গটির উপস্থিতির সাহায্যে। মিঃ বাটলেট আমাদের জানিয়েছেন যে এদের এই অঙ্গটা ছ'মাস বয়সের আগে দেখা দেয় না (যা আমাদের কথিত নিয়মটিকে আবারও সত্য হিসেবে প্রতিপন্ন করে), এবং এমনকি ওই ছ'মাস বয়সেও স্ত্রী-পাখি আর পুরুষ-পাখিদের মধ্যে প্রায় কোনও

১৫। এ ব্যাপারে অধ্যাপক ভিটর ক্যারুস-এর কাছে আমি সর্বশেষ কৃতজ্ঞ। স্যাক্সানির মেরিনো ভেড়াদের সম্বন্ধে উচ্চতম কতৃপক্ষের কাছ থেকে আমার হয়ে তিনিই তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। তবে আফ্রিকার গিনি উপকূলে এক ধরনের ভেড়া দেখা যায় যাদের মধ্যেও মেরিনোদের মতোই শৃঙ্গ পুরুষ-ভেড়াদের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে। মিঃ উইনউড রিড তাঁর দেখা একটা ঘটনার কথা আমাকে জানিয়েছেন। একটি পুরুষ-ভেড়া জন্মেছিল ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখে। মার্চের ৬ তারিখে তার মাথার প্রথম শৃঙ্গ দেখা দেয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শৃঙ্গের উৎপত্তি সাধারণ নিয়মের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ সময়েরই হয়েছে এবং ওয়েলশ ভেড়াদের (যাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে) মাথার জীবনের যে সময়ে শৃঙ্গ দেখা দেয় তার থেকে বেশ খানিকটা পরে এই ভেড়াটির মাথার শৃঙ্গ দেখা দিয়েছে।

পার্থক্যই চোখে পড়ে না।^{১৬} স্ত্রী আর পুরুষ-ময়ূরদের পালকগুচ্ছের প্রতিটি অংশই পরস্পরের থেকে একেবারে আলাদা হয়, মিল থাকে একমাত্র মাথার চমৎকার ঝুঁটিতে। এই ঝুঁটিটা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই দেখা যায় এবং এটার উদগম ঘটে তাদের জীবনের একেবারে প্রথম দিকেই—শরীরের অন্তান্ত অঙ্গসজ্জাগুলোর উদগম ঘটার অনেক আগে (ওই অঙ্গসজ্জাগুলো অবশ্য শুধুমাত্র পুরুষদের শরীরেই দেখা যায়)। বুনো হাঁসেদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার চোখে পড়ে। এদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ডানাতেই সবুজ রঙের চমৎকার ছিট-ছিট দাগ থাকে—স্ত্রী-হাঁসেদের ক্ষেত্রে অবশ্য দাগগুলো কিছুটা ফিকে আর কিছুটা ছোট মাপের হয়। এদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ডানাতেই এই দাগের উদগম হয় খুব অল্প বয়সে, আবার পুরুষ-হাঁসেদের ল্যাজের কুঞ্চিত পালক ও অন্তান্ত অঙ্গসজ্জাগুলোর উদগম হয় একটু বেশি বয়সে।^{১৭} লিঙ্গগত প্রচুর সাদৃশ্য এবং লিঙ্গগত ব্যাপক বৈসাদৃশ্যের এই ধরনের দৃষ্টান্তের (ক্রসোপ্‌টিলন আর ময়ূরদের মতো) মাঝামাঝি জায়গায় বহু অন্তর্বর্তী দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা যায় যে-সব ক্ষেত্রে প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ ঘটে আমাদের কথিত নিয়ম ছুটি অঙ্গসারেই।

১৬। সাধারণ ময়ূরদের (*pavo cristatus*) মধ্যে শুধু পুরুষদেরই পারের পিছনদিকে নখরতুল্য অঙ্গ থাকে, আবার জাভা ময়ূরদের (*P. muticus*) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পারেরই ওই অঙ্গটি দেখা যায়। আমার ধারণা ছিল জাভা ময়ূরদের শরীরে ওই অঙ্গটি অন্য ময়ূরদের তুলনায় অনেক কম বয়সেই দেখা দেয়। কিন্তু আমস্টার্ডামের বাসিন্দা মিঃ হেগ্‌ট্‌ আমাকে একটি ভিন্ন তথ্য জানিয়েছেন। ১৮৬৯ সালের ২৩ এপ্রিল তারিখে তিনি তার আগের বছরে জাত উভর প্রজাতির কিছু অল্পবয়সী ময়ূরকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সেই পর্যবেক্ষণে উভর প্রজাতির ময়ূরদের পারের ওই অঙ্গটির বিকাশে কোনও পার্থক্য তাঁর নজরে পড়েনি। তবে তাদের শরীরে ওই অঙ্গগুলো তখনও পর্যাপ্ত ছোট একটা আব বা সামান্য একটু ক্ষয়িত ছাড়া আর কিছু ছিল না। এই পর্যবেক্ষণের পরবর্তীকালে ওই অঙ্গটির বিকাশের হারে উভর প্রজাতির মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখা গিয়ে থাকলে মিঃ হেগ্‌ট্‌ নিশ্চয়ই আমাকে জানাতেন।

১৭। পাতিহাঁসেদের অন্য কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের ডানার ওই ছিট-ছিট দাগের মধ্যে অনেক বেশি পার্থক্য চোখে পড়ে। আমাদের নিয়ম অনুযায়ী এইসব প্রজাতির পুরুষ-হাঁসেদের ডানার ওই দাগগুলো সাধারণ পুরুষ-পাতিহাঁসেদের থেকে বেশি বয়সে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু বাস্তবে সত্যিই তেমনটা ঘটে কিনা তা আমি আশঙ্কিত করতে পারি নি। তবে এদের সমগোষ্ঠীর ‘মার্গাস কুকুলেটাস’-দের (*Mergus cucullatus*) ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা ব্যাপার লক্ষ করা যায়। এদের স্ত্রী আর পুরুষদের সাধারণ পালকের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকে এবং ডানার ছিট-ছিট দাগেও বেশ কিছু পার্থক্য থাকে—পুরুষদের দাগগুলো ধবধবে সাদা হয় আর স্ত্রীদের দাগগুলো ধূসর-সাদা হয়। এদের অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের সঙ্গে প্রথমদিকে স্ত্রী-প্রাণীদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকে, অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের ডানার দাগগুলোও ধূসর-সাদা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীরা যে বয়সে পৌঁছে তাদের অন্যান্য সম্পৃক্ত লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে, তার থেকে অনেকটা কম বয়সেই তাদের ডানার ওই দাগগুলো ধবধবে সাদা হয়ে যায়। ট্রাউট, অদুব’ (*Audubon*), “অনিথোলজিক্যাল ব্যারেগ্রাফ”, খণ্ড ৩, পৃঃ ২৪৯-২৫০।

কীটপতঙ্গদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্তরকম। অধিকাংশ কীটপতঙ্গই মুককীট (pupa) দশা থেকে পরিণত হয়ে বেরিয়ে আসে। ফলে এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো কোনও একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে কিংবা উভয় লিঙ্গেরই প্রাণীদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার ব্যাপারটা এদের বিকশিত হয়ে ওঠার সময়কালের মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে যায় কিনা, তা বুঝে ওঠা দুষ্কর। এদের ব্যাপারে অনেক কিছুই জানা নেই আমাদের। উদাহরণ হিসেবে প্রজাপতিদের দুটো প্রজাতির কথা বলা যায়। একটা প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের গায়ের রঙ একই হয়, অন্য প্রজাতিটার ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের গায়ের রঙ আলাদা আলাদা হয়। গাভবর্ণের এই এক হওয়া বা না-হওয়ার ব্যাপারটা তাদের গুটি (cocoon) অবস্থায় থাকার সময় একই বয়সে নির্ধারিত হয়ে যায় কিনা, তা আমাদের জানা নেই। আবার যে-সব প্রজাপতিদের ডানার কয়েকটা রঙিন দাগ শুধুমাত্র কোনও-একটা লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই দেখা যায় এবং কয়েকটা রঙিন দাগ উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের দেখা যায়, তাদের এই সমস্ত দাগগুলোর উৎস একই সঙ্গে ঘটে কিনা, তা-ও আমরা জানি না। বিকশিত হয়ে ওঠার সময়েই এই ধরনের একটা পার্থক্য গড়ে ওঠার ব্যাপারটাকে আপাতভাবে অসম্ভব মনে হলেও সত্যিই কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। উদাহরণ হিসেবে অর্থোপ্টেরা বর্গের (আরশোলা, গন্ধাফড়িং, পদ্মপাল জাতীয়) পতঙ্গদের কথা বলা যেতে পারে। পরিণত অবস্থায় উপনীত হওয়ার পথে এদের একবার মাত্র রূপান্তর ঘটে না, বরং বেশ কিছু নির্মোচনের (molt) পথ বেয়েই পরিণত হয়ে ওঠে এরা। এদের কয়েকটি প্রজাতির অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের সঙ্গে প্রথমদিকে স্ত্রী-প্রাণীদের কোনও পার্থক্যই থাকে না, পরবর্তী আরেকটি নির্মোচনের সময় পুরুষ-প্রাণীরা তাদের পুরুষোচিত বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে। কয়েক ধরনের কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের মধ্যেও নির্মোচনের সময়ে এই একই ঘটনা ঘটে থাকে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুক্ত অবস্থায় থাকা বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের বিকশিত হয়ে ওঠার সময়কালের সঙ্গে তাদের নানান বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারিত হওয়ার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা গৃহপালিত জীবজন্তুদের নিয়ে আলোচনা করব। শরীরে স্বাভাবিকের থেকে বেশি সংখ্যক আঙুল থাকা এবং আঙুলের কয়েকটি অস্থি না থাকা—এগুলো অবশ্যই একেবারে ভ্রূণাবস্থাতেই নির্ধারিত হয়ে যায়। অত্যধিক রক্তপাতের প্রবণতা এবং সম্ভবত বর্ণাঙ্কতাও সহজাত ব্যাধি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব বৈশিষ্ট্য এবং এই ধরনের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য প্রায়শই শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। অর্থাৎ জীবনের একেবারে প্রথমদিকে গড়ে ওঠা বৈশিষ্ট্যগুলো উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হওয়ার নিয়মটি এইসব ক্ষেত্রে

একেবারেই প্রযোজ্য নয়। তবে আমরা আগেই বলেছি যে একটু বেশি বয়সে কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে দেখা দেওয়া বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের সমলিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়াটা যতটা সার্বজনীন সত্য, জীবনের প্রথম দিকে অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়াটা ঠিক ততটা সার্বজনীন সত্য নয়। যৌন কার্যকলাপ শুরু হওয়ার অনেক আগেই শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যেই কিছু অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীভূত হওয়া সম্বন্ধে ওপরে আমরা যা বলেছি, তা থেকে অনুমান করা যায় যে একেবারে অল্প বয়স থেকেই স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। কোনও-একটি বিশেষ লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ব্যাধিগুলো জীবনের ঠিক কোন সময় থেকে দেখা দেয়, সে সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছানোর মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে গণ্টেবাত নামক ব্যাধিটা আমাদের নিয়মের আওতার মধ্যেই পড়ে, কারণ এটা সাধারণত যৌবনের অমিতাচারের ফলেই দেখা দেয় এবং এটা পিতার থেকে পুত্রদের মধ্যে যত বেশি করে সঞ্চারিত হয় কন্যাদের মধ্যে তত বেশি করে সঞ্চারিত হয় না।

বিভিন্ন ধরনের গৃহপালিত ভেড়া, ছাগল ও গবাদি পশুদের লক্ষ্য করলে একটা ব্যাপার সহজেই চোখে পড়ে। এদের পুরুষ-প্রাণীদের মাথার শিং, কপাল, কেশর, গলকষল, ল্যাজ ও কাঁধের কুঁজের আকার বা বিকাশ স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে আলাদা ধরনের হয়। একটু বেশি বয়সে না পৌছনো পর্যন্ত এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো পুরোপুরিভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে না এবং এই ব্যাপারটা আমাদের কথিত নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কুকুরদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সাধারণত কোনও পার্থক্য থাকে না, তবে এদের কয়েকটি বর্গের মধ্যে, বিশেষত স্কটল্যান্ডের ডিয়ার-হাউণ্ডদের মধ্যে পুরুষ-কুকুররা মাদি-কুকুরদের থেকে আকারে অনেক বড় এবং ওজনে অনেক ভারী হয়। পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদে আমরা দেখব যে এই বর্গের পুরুষ-কুকুররা অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত আকারে ক্রমাগত বেড়েই চলে এবং, আমাদের নিয়ম অনুযায়ী, এই কারণেই তাদের বর্ধিত আকৃতিটা শুধুমাত্র তাদের পুরুষ-সন্তানদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়। অন্যদিকে, বিড়ালদের ক্ষেত্রে কচ্ছপের খোলার মতো গাভ্রবর্ণটা শুধুমাত্র মাদি-বিড়ালদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে আর তাদের জন্মের সময়েই সেটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়—এবং এই ঘটনাটা আমাদের নিয়মের সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এক জাতীয় পায়রাদের মধ্যে শুধুমাত্র পুরুষ-পায়রাদের গায়েই কালে রঙের ডোরা থাকে। একেবারে ছানা অবস্থাতেও ডোরাগুলো লক্ষ্য করা যায় ঠিকই, তবে প্রতিবার নির্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে ডোরাগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এদের এই ব্যাপারটা আমাদের নিয়মের কিছুটা পক্ষে যায়, আবার কিছুটা

বিপক্ষেও যায়। ইংলিশ ক্যারিয়ার পায়রা আর পাউটার বা নোটন পায়রাদের মাথার মাংসল উপাদান ও দেহমধ্যস্থ থলির মতো কোষটির (crop) পূর্ণ বিকাশ ঘটে একটু বেশি বয়সে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিপূর্ণ রূপে সঞ্চারিত হয় শুধুমাত্র তাদের পুরুষ-বংশধরদের মধ্যেই (যা আমাদের ওই নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ)। নীচে যে উদাহরণগুলো পেশ করা হচ্ছে সেগুলো সম্ভবত পূর্বোল্লিখিত সেই শ্রেণীটির অন্তর্ভুক্ত যেখানে উভয় লিঙ্গের প্রাণীরাই একটু বেশি বয়সে একই পদ্ধতিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করে এবং তাদের এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের উভয় লিঙ্গেরই বংশধরদের মধ্যে ওই একই বয়সে ফুটে উঠতে শুরু করে। যদি তা-ই হয়, তাহলে এই উদাহরণগুলো আমাদের নিয়মের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। পায়রাদের এমন কয়েকটি উপ-বর্গের কথা নিউমেইস্টার উল্লেখ করেছেন যাদের জ্ঞানী-পুরুষ উভয়েরই গায়ের রঙ দু-তিনটি নির্মোচনের সময় পাণ্টে যায় (আমণ্ড টাঘলার পায়রাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা চোখে পড়ে)। এই পরিবর্তনগুলো একটু বেশি বয়সে ঘটলেও উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যেই এটা ঘটে থাকে। লগুন প্রাইজ নামে এক ধরনের ক্যানারি পাখিদের মধ্যেও প্রায় একই ঘটনা চোখে পড়ে।

মুরগিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হবে নাকি শুধু কোনও-একটি লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে, তা সাধারণত নির্ধারিত হয় যে বয়সে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা দেয় সেই বয়সের দ্বারা। এদের যে-সব বর্গের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীদের সঙ্গে জ্ঞানী-প্রাণীদের এবং নিজেদের বন্ধ পূর্বপুরুষদের গায়ের রঙের বিপুল পার্থক্য থাকে, সেইসব বর্গের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদেরও গায়ের রঙের প্রচুর পার্থক্য চোখে পড়ে। এ থেকে বোঝা যায় এই নবাজিত বৈশিষ্ট্যটা তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল একটু বেশি বয়সে। অতীতকালে, যে-সব বর্গের মুরগিদের জ্ঞানী-পুরুষ উভয়ের গায়ের রঙ এক হয়, সেইসব বর্গের অল্পবয়সী মুরগিদের গায়ের রঙের সঙ্গে তাদের পিতামাতার গায়ের রঙের প্রায় কোনও পার্থক্যই থাকে না। এ থেকে বোঝা যায় যে এদের ওই গায়ের রঙটা দেখা দিয়েছিল খুব অল্প বয়সেই। সাদা-কালো রঙবিশিষ্ট প্রতিটি বর্গের মুরগিদের ক্ষেত্রেই এই ব্যাপারটা দেখা যায়—এদের উভয় লিঙ্গের অল্পবয়সী ও বেশি বয়সী মুরগিদের গায়ের রঙ একইরকম হয়। এক্ষেত্রে এমন কথাও বলা যাবে না যে এদের সাদা বা কালো রঙের পালকের মধ্যে এমন বিশেষ কিছু আছে যার দরুন তা তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, কারণ অধিকাংশ সাধারণ প্রজাতির মুরগিদের মধ্যে শুধু পুরুষদের গায়ের রঙই কালো বা সাদা হয় এবং জ্ঞানী-প্রাণীদের গায়ের রঙ অন্তরকম হয়ে থাকে। মুরগিদের তথাকথিত কাকু উপ-বর্গের সদস্যদের পালকে কালো রঙের আড়াআড়ি ডোরা থাকে এবং এদের

স্ত্রী, পুরুষ ও ছানাদের গায়ের রঙ প্রায় একইরকম হয়। গৃহপালিত সেবরাইট মুরগিদের স্ত্রী-পুরুষের শরীরে একইরকম কারুকার্যময় পালক দেখা যায় এবং ছানাদের ডানার পালকেও স্পষ্ট কারুকার্য থাকে (অবশ্য এদের এই কারুকার্যগুলো কিছুটা অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে)। চুম্বিকওয়াল হ্যামবার্গদের মধ্যে অবশ্য এর কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। এদের আদি পূর্বপুরুষদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যতটা সাদৃশ্য ছিল, এদের এখনকার স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে তার থেকে অনেক বেশি সাদৃশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা এদের বৈশিষ্ট্যসূচক পালকগুলো অর্জন করে অনেকটা বেশি বয়সে এবং সেটা বোঝা যায় এদের ছানাদের গায়ে অন্য ধরনের দাগের অস্তিত্ব থেকে। গায়ের রঙ ছাড়া অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাপারে বলা যায়—এদের বন্য-পূর্বপুরুষ প্রজাতির মধ্যে এবং অধিকাংশ গৃহপালিত বর্গের মধ্যে শুধু পুরুষ-প্রাণীদের মাথাতেই স্তবিকশিত ঝুঁটি থাকে, কিন্তু স্প্যানিশ মুরগিদের ছানাদের মাথায় খুব অল্প বয়সেই বিশাল ঝুঁটি দেখা যায় এবং পুরুষদের মাথায় এত অল্প বয়সে ঝুঁটির উদ্ভবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এদের পূর্ববয়স্ক স্ত্রী-প্রাণীদের মাথাতেও অস্বাভাবিক মাপের ঝুঁটি থাকতে দেখা যায়। -লডুয়ে (Game) মুরগিদের মধ্যে একেবারে অল্প বয়স থেকেই যুদ্ধপ্রিয়তার মেজাজটা যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে, সে ব্যাপারে প্রশংসার কোনও অভাব নেই। এদের এই মেজাজটা এদের উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয় এবং তার ফলে মুরগিরা অত্যধিক যুদ্ধপ্রিয় হয়ে ওঠে বলে তাদেরকে এখন আলাদা খাঁচায় রাখা হয়। পোলিশ বর্গের মুরগিদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করা যায়। ডিম ফুটে বাচ্চারা বেরিয়ে আসার আগেই তাদের মাথার অস্থিময় স্ফীত অংশটা (যে অংশটাই ধরে রাখে এদের মাথার ঝুঁটিটাকে) আংশিকভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই ঝুঁটিটাও গড়ে উঠতে শুরু করে যদিও প্রথমদিকে সেটা খুব অস্পষ্ট অবস্থায় থাকে। এই বর্গের উভয় লিঙ্গেরই পূর্ববয়স্ক সদস্যদের মাথায় একটা বড়সড় অস্থিময় স্ফীত অংশ এবং একটা বিশাল ঝুঁটি দেখা যায়।

বিভিন্ন মুক্ত ও গৃহপালিত প্রজাতির মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকশিত হয়ে ওঠার সময়কাল এবং সেগুলি তাদের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার পদ্ধতির মধ্যেই বা কেমন সম্পর্ক থাকে (যেমন যে-সব প্রজাতির হরিণদের শুধু পুরুষদের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে তাদের মাথার শৃঙ্গ যে বয়সে দেখা দেয়, তার থেকে অনেক কম বয়সেই শৃঙ্গ দেখা দেয় বল্গা-হরিণদের মাথায় এবং এদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মাথাতেই শৃঙ্গ থাকে)—তা আমরা এতক্ষণ ধরে দেখলাম। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বেশি বয়সে দেখা দেওয়াটা কোনও-একটি বিশেষ লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো

সঞ্চারিত হওয়ার একমাত্র কারণ না হলেও অন্যতম কারণ বটেই। আবার যেখানে এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়, সেখানে এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের অল্প বয়সে অর্জন করাটা একটা কারণ হিসেবে কাজ করে (যদিও এই কারণটা কিছুটা কম গুরুত্বপূর্ণ) এবং এইসব ক্ষেত্রে উভয় লিঙ্গের সদস্যদের শারীরিক গঠনে ভেদন কোনও পার্থক্য থাকে না। তবে এ-সব সত্ত্বেও আমাদের মনে হয় যে একেবারে জ্ঞানবাহ্যতেও উভয় লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে কিছু-না-কিছু পার্থক্য নিশ্চয়ই থাকে, কেননা এই বয়সে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা দেয় সেগুলো প্রায়ই বিশেষ কোনও-একটি লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়।

সারসংক্ষেপ এবং উপসংহার : বংশগতির বিভিন্ন নিয়ম সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তা থেকে এটা স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে পিতামাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায়শই বা সবসময়েই তাদের সমলিঙ্গের সন্তানদের মধ্যে ফুটে উঠতে চায়, এবং তা ফুটে উঠতে শুরু করে পিতা কিংবা মাতা যে বয়সে, বছরের যে মরসুমে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করেছিল ঠিক সেই বয়সে, ঠিক সেই মরসুমেই। কিন্তু এই নিয়মগুলো কোনও দ্রুত ব্যাপার নয় এবং এই না-হওয়ার কারণটা আমাদের জানা নেই। তাই জন্মেই কোনও প্রজাতির যখন পরিবর্তন ঘটে তখন এই পরিবর্তনগুলো সঞ্চারিত হতে পারে বিভিন্ন ভাবে—কয়েকটা পরিবর্তন হয়তো কোনও-একটি বিশেষ লিঙ্গের সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, আবার কয়েকটা পরিবর্তন সঞ্চারিত হয় উভয় লিঙ্গের সন্তানদের মধ্যেই ; কিছু কিছু পরিবর্তন একটা বিশেষ বয়সের সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, আবার কিছু-কিছু পরিবর্তন সঞ্চারিত হয় যে-কোনও বয়সের সন্তানদের মধ্যেই। বংশগতির নিয়মগুলোই যে শুধু অত্যন্ত জটিল তাই নয়, যে কারণগুলো পরিবর্তনশীলতার জন্ম দেয় ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই কারণগুলোও অত্যন্ত জটিল। এইভাবে উদ্ভূত পরিবর্তনগুলো সংরক্ষিত ও পুঞ্জীভূত হয় যৌন নির্বাচনের সাহায্যে। এই যৌন নির্বাচনও একটা রীতিমতো জটিল প্রক্রিয়া যা নির্ভর করে পুরুষদের ভালবাসার তীব্রতা, সাহস ও পরম্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপরে এবং নারীদের উপলব্ধির ক্ষমতা, ক্রটি ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরে। যৌন নির্বাচন আবার বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা, যে প্রাকৃতিক নির্বাচন কোনও প্রজাতির সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়। অর্থাৎ কোনও-একটি লিঙ্গের অথবা উভয় লিঙ্গেরই সদস্যরা যৌন নির্বাচনের দ্বারা যে প্রক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়, সেই প্রক্রিয়াটি চূড়ান্তরকম জটিল হতে বাধ্য।

কোনও প্রজাতির কোনও-একটি লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে যখন বেশি বয়সে

কোনও পরিবর্তন ঘটে এবং তা তাদের সমলিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে ওই একই বয়সে সঞ্চারিত হয়, তখন অন্য লিঙ্গটির সদস্তরা এবং অল্পবয়সীরা এই পরিবর্তনের আওতার বাইরে থেকে যায়। এই পরিবর্তনগুলো যখন বেশি বয়সে ঘটে কিন্তু উভয় লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে একই বয়সে সঞ্চারিত হয়, তখন শুধু অল্পবয়সীরাই অপরিবর্তিত রয়ে যায়। তবে পরিবর্তন যে-কোনও বয়সেই ঘটতে পারে, ঘটতে পারে শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের সদস্তদের মধ্যে বা উভয় লিঙ্গেরই সদস্তদের মধ্যে এবং তা উভয় লিঙ্গেরই সব বয়সের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে আর সেক্ষেত্রে গোটা প্রজাতিটার সমস্ত সদস্ত একইভাবে একই পরিবর্তনের আওতায় এসে পড়ে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখতে পাব যে প্রকৃতির রাজত্বে এ-ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে।

কোনও প্রাণী প্রজননক্ষম হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত যৌন নির্বাচন তার ওপরে ক্রিয়া করতে পারে না। যৌনতার ব্যাপারে পুরুষদের অতিরিক্ত ব্যগ্রতার দরুন যৌন নির্বাচন সাধারণভাবে পুরুষদের ক্ষেত্রেই বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে, নারীদের ক্ষেত্রে তেমনভাবে হয় নি। তার ফলেই পুরুষরা অর্জন করেছে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াই করার মতো অস্বতুল্য অঙ্গ, সেইসঙ্গেই অর্জন করেছে নারীদেরকে খুঁজে বার করা, আঁকড়ে ধরা এবং তাদেরকে উত্তেজিত করা বা মোহিত করার উপযোগী অঙ্গসমূহ। এইসব অঙ্গের ব্যাপারে যখন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তখন প্রায় সবক্ষেত্রেই পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের সঙ্গে অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদেরও কমবেশি পার্থক্য থাকেই। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পর্যায়ক্রমিক যে-সব পরিবর্তনের পথ চেয়ে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীরা পরিবর্তিত হয়, সেগুলো তারা প্রজননক্ষম হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত সাধারণত দেখা দেয় না। যে-সব ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলো অল্প বয়সে দেখা দেয়, সেইসব ক্ষেত্রে অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীরাও পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যগুলো কমবেশি অর্জন করে থাকে। পূর্ণবয়স্ক ও অল্পবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে এ-ধরনের পার্থক্য বহু প্রজাতির ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়।

অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের শরীরে কখনও-কখনও এমন কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে যেগুলো ওই বয়সে তাদের কোনও কাজে তো লাগেই না, বরং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। যেমন তাদের গায়ের রঙ উজ্জলতর হয়ে উঠলে তারা শত্রুদের চোখে ধরা পড়ে যায় কিংবা মাথায় হঠাৎ বড় বড় শিং দেখা দিলে তাদের জীবনীশক্তি প্রচুর পরিমাণে খরচ হয়ে যায়। অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তন দেখা দিলেও প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে, পূর্ণবয়স্ক ও অভিজ্ঞ পুরুষ-প্রাণীরা এই ধরনের অঙ্গপ্রাপ্তি থেকে যে সুবিধাটা পায় সেটা তাদেরকে নানান বিপদ

থেকে রক্ষা করে এবং জীবনীশক্তির অপব্যয়কে কিছুটা প্রতিহত করে।

যে-সব পরিবর্তনগুলো পুরুষ-প্রাণীদেরকে সক্ষম করে তোলে অল্প পুরুষ-প্রাণীদের পরাজিত করার ব্যাপারে, কিংবা যে পরিবর্তনগুলো তাদেরকে সাহায্য করে স্ত্রী-প্রাণীদের খুঁজে বার করতে, আঁকড়ে ধরতে বা মোহিত করতে, সেই পরিবর্তনগুলো স্ত্রী-প্রাণীদের শরীরে দেখা দিলে ফলটা কী লাগবে? না, এই পরিবর্তনগুলো তাদের কোনও কাজেই লাগবে না এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। গৃহপালিত পশুদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে তাদের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনগুলো যদি খুব সতর্কভাবে নির্বাচন করে ঘটানো না হয়, তাহলে বিভিন্ন বর্গের প্রাণীদের মধ্যে যৌনসম্পর্ক ও আকর্ষিক মৃত্যু মারফত অল্পদিনের মধ্যেই সেগুলো হারিয়ে ফেলবে তারা। প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে যদি এই ধরনের পরিবর্তনগুলো দেখা দেয় এবং সেগুলো যদি শুধুমাত্র তাদের সমলিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হতে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যেও এই পরিবর্তনগুলো বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না, বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীদের এই নবাজিত বৈশিষ্ট্যগুলো যদি তাদের উভয় লিঙ্গেরই সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহলে তাদের পুরুষ-সন্তানদের পক্ষে সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যগুলো যৌন নির্বাচন মারফত টিকে থাকতে পারবে তাদের মধ্যে এবং তার ফলস্বরূপ তাদের উভয় লিঙ্গের বংশধররা একইভাবে পরিবর্তিত হতে পারবে—যদিও এই বৈশিষ্ট্যগুলো স্ত্রী-প্রাণীদের জীবনে কোনও কাজেই লাগবে না। এইসব জটিলতর বিষয়গুলো নিয়ে এখানে আর বিশদ আলোচনা করছি না, এগুলোর প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা যাবে। শেষত, স্ত্রী-প্রাণীরা অনেক সময়েই সঞ্চারণ মারফত পুরুষ-প্রাণীদের কাছ থেকে তাদের নানান বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে এবং বাস্তবে তার অনেক প্রমাণও আছে।

যে-সব পরিবর্তন বেশি বয়সে দেখা দেয় এবং শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, প্রজাতির বংশবিস্তারের ব্যাপারে সেগুলো বরাবরই যৌন নির্বাচনের সহায়তা পেয়েছে এবং যৌন নির্বাচন মারফত পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক বিচারে এ থেকে স্পষ্টতই মনে হয় যে জীবনের সাধারণ অভ্যাস-আচরণের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তনগুলো প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত পুঞ্জীভূত না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তা যদি ঘটত তাহলে দুটি লিঙ্গের প্রাণীদের পরিবর্তনটা ভিন্ন ভিন্ন কারণে প্রায়শই আলাদা আলাদা ধরনের হত, যেমন শিকার ধরার জন্তু বা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্তু এদের পরিবর্তন ঘটত আলাদা আলাদা ভাবে। দুটি লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে এ ধরনের পার্থক্য অবশ্য মাঝে-মাঝে ঘটতে থাকে, বিশেষত নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে। কিন্তু সে-রকমটা ঘটার অর্থ এই

ধাড়ায যে টিকে থাকার সংগ্রামে জ্বী-প্রাণী আর পুরুষ-প্রাণীরা আলাদা আলাদা অভ্যাস-আচরণের পথ বেয়ে এগোয়, যা উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না বললেই চলে। তবে প্রজনন সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা, কারণ প্রজনন সংক্রান্ত ব্যাপারে জ্বী-প্রাণী আর পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য থাকতে বাধ্য। প্রজনন সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের কোনও পরিবর্তন দেখা দিলে সেটা সাধারণত কোনও-একটি লিঙ্গের সদস্যদেরই কাজে লাগে এবং এই পরিবর্তনগুলো একটু বেশি বয়সে দেখা দেয় বলে এগুলো শুধুমাত্র কোনও-একটি লিঙ্গের বংশধরদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়। এই ধরনের পরিবর্তনগুলো পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংরক্ষিত হতে হতে ও সঞ্চারিত হতে হতে অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্ম দেয়।

পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমি সকল শ্রেণীর প্রাণীদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করব এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচিত নীতিগুলিকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করব। নিম্নতম শ্রেণীর প্রাণীদের নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করার দরকার হবে না, কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণীদের নিয়ে, বিশেষত পাখিদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতে হবে আমাকে। যে অসংখ্য অঙ্গের সাহায্যে পুরুষ-প্রাণীরা জ্বী-প্রাণীদের খুঁজে বার করে কিংবা খুঁজে পাওয়ার পর আঁকড়ে ধরে, তার মধ্যে থেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে অল্প কয়েকটা অঙ্গের কথাই উল্লেখ করব আমি। অন্যদিকে, যে-সব অঙ্গ ও সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে পুরুষ-প্রাণীরা অন্য পুরুষ-প্রাণীদের পরাজিত করে এবং যেগুলোর সাহায্যে তারা জ্বী-প্রাণীদেরকে প্রলুব্ধ বা উত্তেজিত করে তোলে সেগুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব, কারণ সব দিক থেকেই এগুলো অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক।

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে দুটি লিঙ্গের সদস্যদের আনুপাতিক সংখ্যা প্রসঙ্গে সংযোজনী অংশ

সমগ্র প্রাণিজগতে জ্বী ও পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যাগত অনুপাত প্রসঙ্গে আজ পর্যন্ত কেউই তেমন কিছু আলোচনা করেন নি। আমি নিজে এ ব্যাপারে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এখানে পেশ করছি, তবে মনে রাখবেন এই তথ্যগুলো মোটেই পূর্ণাঙ্গ বা নিখুঁত নয়। এগুলোর মধ্যে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে যথাযথ হিসাব পাওয়া গেছে এবং সেই সংখ্যাগুলোও খুব বেশি নয়। মানুষের ক্ষেত্রে এই অনুপাতটা স্থানিকভাবে জানা আছে বলে তুলনার মাপকাঠি হিসেবে তাদের কথা দিয়েই শুরু করছি আমি।

মানুষ

ইংল্যাণ্ডে দশ বছরে (১৮৫৭ থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত) জীবিত শিশুদের জন্মের গড় সংখ্যা ছিল ৭০৭.১২০ জন, যার মধ্যে প্রতি ১০৪.৫ জন পুরুষ-শিশু পিছু নারী-শিশু ছিল ১০০ জন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে সারা ইংল্যাণ্ডে পুরুষ-শিশুর জন্মের হার ছিল প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু পিছু ১০৫.২ জন আর ১৮৬৫ সালে ছিল ১০৪.০ জন। আলাদা আলাদা জেলাগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই ওই দশ বছরে বাকিংহামশায়ারে (যেখানে প্রতি বছর প্রায় ৫০০০ করে শিশু জন্মায়) পুরুষ-শিশু পিছু নারী-শিশুর জন্মের গড় অনুপাত ছিল প্রতি ১০২.৮ জন পিছু ১০০ জন। উত্তর ওয়েল্‌সে (যেখানে প্রতি বছরে জন্মের গড় ১২৮.৭৩ জন) এই সংখ্যাটা ছিল ১০৬.২ জন পিছু ১০০ জন। রুটল্যাণ্ডশায়ারের মতো ছোট্ট জেলাটির (যেখানে প্রতি বছরে গড়ে মাত্র ৭৩৯টি শিশু জন্মায়) দিকে তাকালে দেখা যায় ১৮৬৪ সালে প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু পিছু পুরুষ-শিশুর জন্মের অনুপাত ছিল ১১৪.৬ জন আর ১৮৬২ সালে মাত্র ২৭.০ জন। কিন্তু এই জেলাটিতেও ওই দশ বছরে জন্মানো মোট ৭৩৮৫টি শিশুর মধ্যে প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু পিছু পুরুষ-শিশুর জন্মের গড় অনুপাত ছিল ১০৪.৫ জন—অর্থাৎ সারা ইংল্যাণ্ডে ওই দশ বছরে পুরুষ-শিশু আর নারী-শিশুদের জন্মের গড় অনুপাতের সমান। অজানা কিছু কারণে এই অনুপাতটা মাঝেমাঝে কিছুটা এলোমেলো হয়ে যায়। অধ্যাপক ফেয়ি বলেছেন, “নরওয়ের কয়েকটি জেলায় দশ বছরে পুরুষ-শিশুদের সংখ্যায় বেশ কিছুটা ঘাটতি দেখা দিয়েছে, আবার অন্য জেলাগুলিতে চিত্রটা ঠিক তার বিপরীত।” ফ্রান্সে চুয়াল্লিশ বছরে প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু পিছু পুরুষ-শিশুর জন্মের হার ছিল ১০৬.২ জন। কিন্তু সময়কালের মধ্যে একটা বিভাগে পাঁচবার এবং অন্য একটা বিভাগে ছ'বার নারী-শিশুর জন্মের হার পুরুষ-শিশুর জন্মের হারকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। রাশিয়ায় প্রায় ১০০ জন নারী-শিশু পিছু পুরুষ-শিশুর জন্মের হার ১০৮.২ জন আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় ১১০.৫ জন। ইউরোপে প্রায় ৭ কোটি শিশুর জন্ম থেকে হিসেব করে বিকেস্ দেখিয়েছেন যে সেখানে এই অনুপাতটা ছিল প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু পিছু ১০৬ জন পুরুষ-শিশু। অন্যদিকে, উত্তরাংশে অন্তরীপে শ্বেভাঙ্গ পুরুষ-শিশুর জন্মের হার ছিল খুবই কম। পরপর কয়েক বছরে প্রতি ১০০ জন শ্বেভাঙ্গ নারী-শিশু পিছু শ্বেভাঙ্গ পুরুষ-শিশুদের জন্মের হার ছিল ২০ জন থেকে ২২ জন পর্যন্ত। এখানে একটা কোতুলোদ্দীপক তথ্যের কথা উল্লেখ করা যায়—গ্রিস্টানদের থেকে ইহুদিদের মধ্যে পুরুষ-শিশুর জন্মের অনুপাত অনেক বেশি। প্রতি ১০০ জন ইহুদি-

নারী-শিশু পিছু ইহুদি পুরুষ-শিশুদের জন্মের অনুপাত প্রাশিয়ায় ১১৩ জন, ব্রেসলো-এ ১১৪ জন এবং লিভোনিয়ায় ১২০ জন। এইসব দেশে খ্রিস্টান পুরুষ-শিশুদের জন্মের হার কিন্তু অন্য সব জায়গার মতোই স্বাভাবিক, যেমন লিভোনিয়ায় প্রতি ১০০ জন খ্রিস্টান নারী-শিশু পিছু ১০৪ জন করে খ্রিস্টান পুরুষ-শিশু জন্মায়।

অধ্যাপক ফেয়ি বলেছেন, “গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবকালে উভয় লিঙ্গের শিশুদের মৃত্যুর হার সমান হলে পুরুষ-শিশুর সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারত। কিন্তু ঘটনা হল—বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে মৃত অবস্থায় জাত প্রতি ১০০ জন নারী-শিশু পিছু মৃত অবস্থায় জাত পুরুষ-শিশুর সংখ্যা ১৩৪.৬ জন থেকে শুরু করে ১৪৪.২ জন পর্যন্ত হয়ে থাকে। জন্মানোর পর প্রথম চার-পাঁচ বছরের মধ্যে মৃত নারীশিশু মারা যায়, পুরুষ-শিশু মারা যায় তার থেকে অনেক বেশি। যেমন ইংল্যান্ডে জন্মের পর প্রথম এক বছরের মধ্যে ১০০ জন নারী-শিশু মারা গেলে পুরুষ-শিশু মারা যায় ১২৬ জন। ফ্রান্সে এই সংখ্যাটা আরও বেশি।”^{১৮} এই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ স্টকটন-হগ বলেছেন যে নারীদের তুলনায় পুরুষদের শারীরিক বিকাশ প্রায়শই বেশি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং এটা এই ঘটনার আংশিক কারণ হিসেবে কাজ করে। আমরা আগেই দেখেছি যে পুরুষদের শারীরিক গঠনের পরিবর্তনশীলতা নারীদের থেকে অনেক বেশি হয়, আর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহের পরিবর্তনশীলতা স্বাভাবিকভাবেই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। আবার নারী-শিশুদের তুলনায় পুরুষ-শিশুদের শরীরের আয়তন, বিশেষত মাথার আয়তন বড় হওয়াটাও এই ঘটনার অন্যতম কারণ, কেননা এর ফলে প্রসবের সময় পুরুষ-শিশুদের আঘাত লাগার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এর ফলস্বরূপ মৃত অবস্থায় জাত পুরুষ-শিশুর সংখ্যাও অনেক বেশি হয়। ডঃ ক্রিকটন ব্রাউন^{১৯}-এর মতো একজন সুযোগ্য ব্যক্তিও বলেছেন যে

১৮। ডঃ স্টার্ক বলেছেন (“টেন্থ অ্যানুয়াল রিপোর্টস অফ বার্থস, ডেথস, এটসেটরা ইন স্কটল্যান্ড”, পৃঃ ২৮), “এইসব উদাহরণ থেকে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে কোোনও বয়সেই স্কটল্যান্ডের নারীদের থেকে পুরুষদের মৃত্যুর সম্ভাবনা ও মৃত্যু-হার অনেক বেশি। তবে এই ঘটনাটা সবথেকে বেশি করে ঘটে শৈশবাবস্থায়, যখন নারী-শিশু আর পুরুষ-শিশুদের পোশাক, খাদ্য এবং সাধারণ চিকিৎসার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। এ থেকে মনে হয় পুরুষদের মৃত্যু-হার বেশি হওয়ার ব্যাপারটা একটা প্রাকৃতিক ও শারীরিক গঠনগত বৈশিষ্ট্য যা গড়ে ওঠে একমাত্র লিঙ্গগত কারণেই।”

১৯। “ওরেন্ট রাইভিং লুন্যাটিক অ্যাসাইলাম রিপোর্টস”, খণ্ড ১, ১৮৭১, পৃঃ ৮। স্যার জে. সিংসন প্রমাণ করেছেন যে পুরুষ-শিশুর মাথার পরিধি নারী-শিশুর মাথার পরিধির চেয়ে ৩.৮ ইঞ্চি আর আড়াআড়ি ব্যাস ১/৮ ইঞ্চি বড় হয়। কোরেটলেট দেখিয়েছেন যে জন্মের সময় নারী-শিশুদের শরীরের আয়তন পুরুষ-শিশুদের চেয়ে ছোট থাকে।

জন্মের পর কয়েক বছরের মধ্যে নারী-শিশুদের থেকে পুরুষ-শিশুরা অনেক বেশি অসুখে ভোগে। জন্মের সময় ও জন্মের কিছুদিন পরে পুরুষ-শিশুদের মৃত্যু-হারের এই আধিক্যের দরুন এবং বয়স্ক পুরুষদের বেশি মাত্রায় নানান বিপদের মুখোমুখি হওয়া ও দেশান্তরী হওয়ার প্রবণতার দরুন প্রাচীন জনবসতিগুলোয় (যে-সব জায়গার প্রামাণ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়^{২০}) পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যা অনেক বেশি হতে দেখা যায়।

নেপল্‌স্, প্রাশিয়া, ওয়েস্টফালিয়া, হল্যান্ড, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু বিশিষ্ট এই সবকটা দেশেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ে। এইসব দেশে বৈধ নারী-শিশুর তুলনায় বৈধ পুরুষ-শিশুর সংখ্যা বেশি হলেও অবৈধ সন্তানদের মধ্যে পুরুষ-শিশুর সংখ্যা কিন্তু কিছুটা কমই থাকে। প্রথম দর্শনে ঘটনাটাকে রহস্যময় বলেই মনে হয়। বিভিন্ন লেখক ব্যাপারটাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, যেমন কেউ বলেছেন ওই সময় মায়েদের বয়স খুব কম থাকে বলেই এমনটা হয়, কেউ-বা বলেছেন প্রথম গর্ভাবস্থার অল্পপাত অনেক বেশি হওয়াটাই এর কারণ ইত্যাদি। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে পুরুষ-শিশুদের মাথার আয়তন বড় হওয়ার দরুন প্রসবের সময় এরা বেশি কষ্ট পায়। আর গর্ভাবস্থাটা গোপন করার জন্য কোমরে শক্ত করে দড়ি বা লেস বাঁধা, কঠোর পরিশ্রম করা, মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদি নানান কারণে অবৈধ সন্তানের জন্মদাত্রীর অল্প মায়েদের থেকে অনেক বেশি প্রসববেদনা ভোগ করে বলে তাদের পুরুষ-সন্তানরাও নারী-সন্তানদের থেকে বেশি কষ্টের মুখোমুখি হয়। বৈধ অবস্থায় জাত শিশুদের থেকে অবৈধ অবস্থায় জাত শিশুদের মধ্যে পুরুষ-সন্তানরা যে নারী-সন্তানদের চেয়ে কম সংখ্যায় জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়, তার প্রধান কারণ সম্ভবত এটাই। বেশির ভাগ জীবজন্তুদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-প্রাণীদের আয়তন প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে বড় হয়। আসলে স্ত্রী-প্রাণীদের দখল করার সংগ্রামে শক্তিশালী পুরুষ-প্রাণীরা দুর্বলতর পুরুষ-প্রাণীদের পরাজিত করে স্ত্রী-প্রাণীদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং ঠিক এই কারণেই অস্তুত কিছু কিছু জীবজন্তুদের ক্ষেত্রে জন্মের সময়ই স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের শরীরের আয়তনে পার্থক্য থাকতে দেখা যায়। এইসব তথ্য থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে জন্মের সময় নারী-শিশুদের তুলনায় পুরুষ-শিশুদের মৃত্যু-হার বেশি হওয়ার (বিশেষত অবৈধ সন্তানদের ক্ষেত্রে) অস্তুত আংশিক কারণ হিসেবে কাজ করে যৌন নির্বাচন।

২০। তথ্যানিষ্ট আজারা দোঁখরেছেন (‘‘Voyages dans l’Amerique merid,’’ খণ্ড ২, ১৮০৯, পৃঃ ৬০, ১৭৯) যে প্যারাগুয়ের বনা গুয়ারানিস-দের মধ্যে প্রায় ১০ জন পুরুষ গিহু ১৪ জন করে নারী থাকে।

অনেকে মনে করেন যে পিতামাতার আপেক্ষিক বয়স কত তা দিয়েই সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। মানুষ এবং কিছু গৃহপালিত পশুদের সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পেশ করে অধ্যাপক লিউকার্ট দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে পিতামাতার আপেক্ষিক বয়সটা সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের একমাত্র কারণ না হলেও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বটেই। আবার কোন্ অবস্থায় নারীর গর্ভাধান হচ্ছে, যেটাকেও সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের অন্যতম কারণ বলে মনে করতেন অনেকে, তবে সাম্প্রতিক নানান গবেষণায় এই মতটি একেবারেই বাতিল হয়ে গেছে। ডঃ স্টকটন-হগের মতে, বছরের ঋতু, পিতামাতার দারিদ্র্য বা সম্ভ্রমতা, তারা গ্রামের বাসিন্দা নাকি শহরের, বিদেশ থেকে আসা কোনও পুরুষ বা নারীর সঙ্গে সংসর্গ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারই সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের ব্যাপারে প্রভাব ফেলে। মানুষের ক্ষেত্রে পুরুষদের বহুগামিতাকেও নারী-শিশুর সংখ্যাধিক্যের একটা কারণ বলে মনে করেন অনেকে। কিন্তু শ্রামদেশের হারেমগুলোতে এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ডঃ জে. ক্যাম্পবেল জানিয়েছেন যে একবিবাহের ক্ষেত্রে নারী আর পুরুষ-সন্তানের অল্পপাত যা থাকে, এখানেও ঠিক তা-ই থাকে। ইংল্যান্ডের ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াগুলোর থেকে বেশি বহুগামিতা বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোনও প্রাণীর পুরুষদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু এদেরও পুরুষ-সন্তান আর নারী-সন্তানের সংখ্যা প্রায় সমান-সমান থাকে। বিভিন্ন ধরনের প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষের সংখ্যাগত অল্পপাত সম্বন্ধে যে-সব তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এবার পেশ করব পাঠকদের সামনে, অতঃপর সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব এই অল্পপাত নির্ধারণের ব্যাপারে নির্বাচন কতখানি ভূমিকা পালন করেছে তা নিয়ে।

ঘোড়া। আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়ে মিঃ টেগেটমাইয়ার “রেসিং ক্যালেন্ডার” যেঁটে ১৮৪৬ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত একুশ বছরে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াদের জন্মের একটা হিসেব পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে। এর মধ্যে ১৮৪৯ সালটা অবশ্য বাদ আছে, কারণ ওই বছরে ঘোড়াদের জন্মের কোনও হিসেব প্রকাশিত হয়নি। এই একুশ বছরে মোট ২৫৫৬০টি^১ ঘোড়ার জন্ম হয়েছিল, যার

২৯। যে-সব মাদি-ঘোড়া বন্ধ্যা অথবা নির্ধারিত সময়ের আগেই যাদের গর্ভপাত হয়ে গেছে, তাদের এগারো বছরের একটা হিসেব আমাদের হাতে আছে। এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে এইসব সম্বলপালিত ও আন্তঃপ্রজননজাত (interbred) প্রাণীদের প্রজনন-ক্ষমতা ভীষণরকম কমে গেছে, কারণ এইসব মাদি-ঘোড়াদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই জীবিত শাবকের জন্ম দিতে পারেনি। ১৮৬৬ সালে মোট ৮০৯-টি পুরুষ-শাবক ও ৮১৬-টি স্ত্রী-শাবক জন্ম নিরোঁছিল এবং ৭৪০-টি মাদি-ঘোড়া কোনও শাবকের জন্ম দিতে সক্ষম হয়নি। ১৮৬৭ সালে জন্ম নিরোঁছিল মোট ৮০৬-টি পুরুষ-শাবক ও ৯০২-টি স্ত্রী-শাবক এবং ৭৯৪-টি মাদি-ঘোড়া কোনও শাবকের জন্ম দিতে পারেনি।

মধ্যে পুরুষ-ঘোড়া ছিল ১২৭৬৩টি আর মাদি-ঘোড়া ১২৭২৭টি, অর্থাৎ প্রতি ১০০টি মাদি-ঘোড়া পিছু পুরুষ-ঘোড়া জন্মেছিল ২০.৭টি করে। সংখ্যাগুলো যেহেতু যথেষ্টই বেশি এবং যেহেতু এর মধ্যে বেশ কয়েক বছরে ইংল্যান্ডের সব জায়গার পরিসংখ্যানকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেহেতু আমরা জোর দিয়েই বলতে পারি যে গৃহপালিত ঘোড়াদের মধ্যে, বা অন্ততপক্ষে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াদের মধ্যে, জীি আর পুরুষ-প্রাণী প্রায় সমান সংখ্যাতেই জন্মায়। বিভিন্ন বছরে এই অল্পপাতের যে ওঠানামাটা ঘটে সেটা কোনও ছোট ও কম জনসংখ্যাবিশিষ্ট অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে ছেলে-মেয়ের জন্মহারের ওঠানামার মতোই—১৮৫৬ সালে প্রতি ১০০টি মাদি-ঘোড়া পিছু পুরুষ-ঘোড়া জন্মেছিল মাত্র ২২.৬টি। তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই অল্পপাত চক্রাকারে পরিবর্তিত হয়, কারণ পরপর ছ'বছর মাদি-ঘোড়ার থেকে পুরুষ-ঘোড়া বেশি জন্মেছে, আবার পরপর চার বছর করে মোট দুবার পুরুষ-ঘোড়ার থেকে মাদি-ঘোড়া বেশি জন্মেছে। তবে এ ব্যাপারটা নিতান্ত কাকতালীয়ও হতে পারে। ১৮৬৬ সালের রেজিস্ট্রার'স রিপোর্টের দশ বছরের সারণী থেকে মানুষের ব্যাপারে এ ধরনের কোনও নজির আমি অন্তত খুঁজে পাইনি।

কুকুর। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত বারোটা বছরে সারা ইংল্যান্ডে কত গ্রেহাউণ্ড কুকুর জন্মেছিল, তার একটা হিসেব প্রকাশিত হয়েছিল 'ফিল্ড' কাগজে। এই তথ্যগুলোও মিঃ টেগেট্‌মেইয়ারই যথাযথভাবে মাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ওই বারো বছরে মোট ৬৮৭৮টি গ্রেহাউণ্ড কুকুর জন্মেছিল যার মধ্যে ৩৬০৫টি ছিল পুরুষ-কুকুর আর ৩২৭৩টি মাদি-কুকুর, অর্থাৎ প্রতি ১০০টি জীি-কুকুর পিছু পুরুষ-কুকুর জন্মেছিল ১১০.১টি করে। এই পরিসংখ্যানের সবথেকে বড় ওঠানামা ঘটেছিল ১৬৮৪ আর ১৮৬৭ সালে। ১৮৬৪ সালে প্রতি ১০০টি মাদি-কুকুর পিছু পুরুষ-কুকুর জন্মেছিল ২৫.৩টি আর ১৮৬৭ সালে ১১৬.৩টি। ১০০টি মাদি-কুকুর পিছু ১১০.১টি পুরুষ-কুকুর জন্মানোর গড় অল্পপাতটা গ্রেহাউণ্ডদের ক্ষেত্রে সম্ভবত প্রায় নিশ্চিত, তবে অন্যান্য গৃহপালিত কুকুরদের ক্ষেত্রেও এই অল্পপাতটা একই থাকে কিনা তা বলা একটু মুশকিল। বেশ কিছু বিখ্যাত কুকুর-পালকের সঙ্গে কথা বলে মিঃ কাপ্লস্‌ দেখেছেন যে সব ধরনের কুকুরদের মধ্যেই মাদি-কুকুর বেশি জন্মায়। তবে তাঁর মতে কুকুর-পালকদের এই ধারণাটা তৈরি হয়েছে সম্ভবত মাদি-কুকুরের দাম কম বলেই—অর্থাৎ দাম কম বলে মাদি-কুকুর জন্মালে কুকুর-পালকরা কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ে আর তার ফলে তাদের মনে মাদি-কুকুরদের সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা তৈরি হয়ে যায়।

ভেড়া। জন্মের পর বেশ কয়েক মাস না কাটা পর্যন্ত (অর্থাৎ যে-সময় পুরুষ-

ভেড়াদের খাসি করা হয় তার আগে পর্বস্তু) ভেড়াদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। ঠিক সেই কারণেই নীচের হিসেবগুলো থেকে জন্মের সময় ভেড়াদের স্ত্রী-পুরুষের অনুপাতের কোনও হদিশ পাওয়া যাবে না। তাছাড়া স্কটল্যান্ডের কয়েকজন বিখ্যাত ভেড়াপালক, যারা বছরে প্রায় হাজারটা করে ভেড়ার জন্ম দেন, তাঁদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আমি জেনেছি যে জন্মের পর প্রথম দু'এক বছরের মধ্যে স্ত্রী-ভেড়ার তুলনায় অনেক বেশি পুরুষ-ভেড়া মারা যায়। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে খাসি করার সময় পুরুষ-ভেড়ার অনুপাত যত থাকে, জন্মের সময় তার থেকে কিছুটা অন্তত বেশিই থাকে। আমরা আগেই দেখেছি যে মানুষদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকটা একই ঘটে থাকে এবং দুটো ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা সম্ভবত একই কারণেই ঘটে থাকে—সত্যিই এটা একটা আশ্চর্য সমাপতন। ইংল্যান্ডের চারজন ভদ্রলোক যারা নিম্নাঞ্চলের (বিশেষত লিসেস্টার্সের) ভেড়া-পালক হিসেবে সুপরিচিত, তাঁদের কাছে বিগত দশ থেকে বোলো বছরের একটা হিসেব পেয়েছি আমি। এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই সময়ের মধ্যে মোট ৮২৬৫টি ভেড়ার জন্ম হয়েছে যার মধ্যে ৪৪০৭টি পুরুষ-ভেড়া আর ৪৫৫৮টি স্ত্রী-ভেড়া। অর্থাৎ প্রতি ১০০টি স্ত্রী-ভেড়া পিছু ৯৬.৭টি করে পুরুষ-ভেড়ার জন্ম হয়েছে। স্কটল্যান্ডের শেভিয়ট (Cheviot) এবং কালো-মুখ ভেড়াদের ব্যাপারে ছ'জন ভেড়া-পালকের কাছ থেকে, বিশেষত দু'জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি আমি। এই হিসেব মূলত ১৮৬৭-১৮৬৯ সালের সময়কার, তবে এমনকি সেই ১৮৬২ সালের কিছু তথ্যও এর মধ্যে আছে। এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে মোট ৫০৬৮৫টি ভেড়ার জন্ম হয়েছে যার মধ্যে ২৫০৭১টি পুরুষ-ভেড়া আর ২৫৬১৪টি স্ত্রী-ভেড়া—অর্থাৎ প্রতি ১০০টি স্ত্রী-ভেড়া পিছু ৯৭.৯টি করে পুরুষ-ভেড়া। ইংল্যান্ড আর স্কটল্যান্ডের হিসেবকে একত্র করে দেখলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোট ৫২৬৫০টি ভেড়ার জন্ম হয়েছে যার মধ্যে ২৯৪৭৮টি পুরুষ-ভেড়া আর ৩০১৭২টি স্ত্রী-ভেড়া—অর্থাৎ প্রতি ১০০টি স্ত্রী-ভেড়া পিছু ৯৭.৭টি করে পুরুষ-ভেড়া। অর্থাৎ পুরুষদের যখন খাসি করা হয়, সেই বয়সে স্ত্রী-ভেড়ার সংখ্যা পুরুষ-ভেড়াদের চেয়ে বেশি থাকে, তবে জন্মের সময়েও তা-ই থাকে কিনা বলা মুশকিল।^{২২}

গবাদি পশু। গবাদি পশুদের ব্যাপারে ন'জন ভদ্রলোকের কাছ থেকে যে হিসেব আমি পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে মোট গবাদি পশু জন্মেছে ৯৮২টি।

২২। স্কটল্যান্ড থেকে এইসব পরিসংখ্যানগুলো সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য এবং গবাদি পশুদের ব্যাপারেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য মিঃ কাপলান্স-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পুরুষ-ভেড়াদের অকালমৃত্যুর দিকে প্রথম আশ্রয় দৃষ্টি-আকর্ষণ করেন লেইউডের মিঃ আর. এলিয়ট, পরে এই তথ্যটিকে সমর্থন করেন মিঃ এইচিসন ও অন্যান্যরা। ভেড়াদের ব্যাপারে বহু তথ্য যোগানোর জন্য মিঃ এইচিসন ও মিঃ প্যারান-এর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

সংখ্যাটা এতই কম যে বিশ্বাস করা শক্ত। এর মধ্যে ৪৭৭টি এঁড়ে-বাছুর আর ৫০৫টি বকনা-বাছুর, অর্থাৎ প্রতি ১০০টি বকনা-বাছুর পিছু ২৪০টি করে এঁড়ে-বাছুর। রেভারেণ্ড ডব্লিউ. ডি. ফক্স আমাকে জানিয়েছেন যে ১৮৬৭ সালে ডাবি-শায়ারের একটা গোয়ালে জন্মানো ৩৪টি গো-শাবকের মধ্যে এঁড়ে-বাছুর ছিল মাত্র একটি। বেশ কিছু শূকর-পালকের সঙ্গে কথা বলে মিঃ হ্যারিসন ভাইর আমাকে যে তথ্য দিয়েছেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতি ৬টি স্ত্রী-শূকর পিছু পুরুষ-শূকর জন্মায় ৭টি করে। এই মিঃ ভাইর অনেক বছর ধরে খরগোশ পালন করে আসছেন। নিজের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন স্ত্রী-খরগোশের থেকে পুরুষ-খরগোশ অনেক বেশি জন্মায়। তবে এ ব্যাপারে স্থানিদিষ্ট কোনও তথ্য তিনি দেননি।

অন্তান্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী। প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা অন্তান্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ব্যাপারে আমি বিশেষ কোনও তথ্য যোগাড় করে উঠতে পারি নি। সাধারণ ইঁদুরদের ব্যাপারে কিছু পরস্পরবিরোধী তথ্য আমার হাতে এসেছে। লেইউডের মিঃ আর. এলিয়ট আমাকে একটি তথ্য জানিয়েছেন। জর্মনক ইঁদুর-ধরনের কাছ থেকে তিনি জেনেছেন যে সে সবসময়ই ইঁদুরদের মধ্যে পুরুষ-ইঁদুরদেরই সংখ্যাধিক্য দেখেছে, এমনকি গর্তে থাকা ইঁদুরছানাাদের মধ্যেও। এর পর মিঃ এলিয়ট নিজে শ'খানেক পূর্ণবয়স্ক ইঁদুরকে পরীক্ষা করেও এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। মিঃ এফ. বাকুল্যাও বেশ কিছু সাদা ইঁদুর পুষেছিলেন। তাঁর মতে এদের ক্ষেত্রে পুরুষ-ইঁদুরদের সংখ্যা স্ত্রী-ইঁদুরদের থেকে অনেক বেশি হয়ে থাকে। ছুঁচোদের সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে “পুরুষ-ছুঁচোদের সংখ্যা স্ত্রী-ছুঁচোদের থেকে অনেক বেশি হয়।” এইসব প্রাণীদের কাঁদে ফেলে ধরাটা যেহেতু একটা বিশেষ বৃত্তি, সেহেতু এই বৃত্তিতে নিযুক্ত লোকেদের বক্তব্যটাকে সত্যি বলেই ধরে নেওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার এক ধরনের কুম্ভার মৃগ (*Kobus ellipsiprymnus*) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্যর এ. স্মিথ মন্তব্য করেছিলেন যে এই প্রজাতির মধ্যে এবং অন্তান্ত প্রজাতির মধ্যে একেকটা দলে স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা কম হয়ে থাকে। গুথানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা জন্মের সময় থেকেই এদের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীর সংখ্যা বেশি থাকে, আবার অনেকের মতে অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় বলেই স্ত্রী-প্রাণীদের সংখ্যাটা বেশি বলে মনে হয়। স্যর এ. স্মিথ বলেছেন যে শুধুমাত্র অল্পবয়সী কুম্ভার মৃগদের কোনও দল তিনি নিজে দেখেননি বটে, তবে অন্তদের কাছে এ ধরনের দলের অস্তিত্বের কথা শুনেছেন। অল্পবয়সী মৃগরা নিজেদের দল থেকে বিতাড়িত হলে খুব সহজেই বনের হিংস্র জীবজন্তুদের শিকারে পরিণত হতে পারে।

পাখি

পাখিদের মধ্যে মুরগিদের ব্যাপারে মাত্র একটা তথ্যই যোগাড় করতে পেরেছি আমি। মিঃ স্ট্রুচের উচ্চ হারে জন্মদানে সক্ষম কোচিন মুরগিরা আট বছরে মোট ১০০১টি ছানার জন্ম দিয়েছিল, যার মধ্যে ৪৮৭টি ছিল মোরগ আর ৫১৪টি মুরগি, অর্থাৎ প্রতি ১০০টি মুরগি পিছু ২৪৭টি করে মোরগ জন্মেছিল। গৃহপালিত পায়রাদের মধ্যে পুরুষ-পায়রাই যে সংখ্যায় বেশি জন্মায় অথবা বেশিদিন বাঁচে, সে ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই পাখিরা অবধারিতভাবেই জোড় বাঁধে, এবং মিঃ টেগেটমাইয়ার জানিয়েছেন, স্ত্রী-পায়রার থেকে পুরুষ-পায়রার দাম সর্বদাই কম হয়। একই বাসায় দুটো ডিম ফুটে দুটো ছানা বেরোলে সাধারণত তাদের মধ্যে একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রী হয়। কিন্তু মিঃ হ্যারিসন ভাইর-এর মতো একজন অভিজ্ঞ মুরগি-পালক আমাকে জানিয়েছেন যে একই বাসার দুটো ডিম থেকে তিনি প্রায়শই দুটো মোরগকে জন্মাতে দেখেছেন, কিন্তু দুটো মুরগিকে জন্মাতে দেখেছেন খুবই কম। তাছাড়া মোরগ আর মুরগির মধ্যে মুরগিরাই একটু কমজোরি হয়, ফলে মোরগদের তুলনায় এদের মারা যাওয়ার সম্ভাবনাও একটু বেশিই থাকে।

প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা পাখিদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মিঃ গোল্ড ও অ্যান্ডার্সন বলেছেন—এদের মধ্যে পুরুষ-পাখিরাই সংখ্যায় অনেক বেশি থাকে। আর অনেক প্রজাতির অল্পবয়সী পুরুষ-পাখিদের দেখতে ঠিক স্ত্রী-পাখিদের মতো হয় বলে বাইরে থেকে মনে হয় স্ত্রী-পাখিরাই বোধহয় সংখ্যায় বেশি। বন্য ফেড্র্যান্ট পাখিদের পেড়ে যাওয়া ডিম ফুটিয়ে প্রচুর ফেড্র্যান্ট পাখির জন্ম দিয়েছেন লিডেনহল-এর মিঃ বেকার। মিঃ জেনার ভাইর-কে তিনি জানিয়েছেন যে এদের মধ্যে সাধারণত একটি স্ত্রী-পাখি পিছু চার-পাঁচটি করে পুরুষ-পাখি জন্মায়। জনৈক অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক জানিয়েছেন—স্ক্যাগিনেভিয়ার ক্যাপারকেল্জি ও ব্ল্যাক-কক্‌দের মধ্যে স্ত্রী-পাখির থেকে পুরুষ-পাখির সংখ্যা বেশি হয় এবং দাল-রিপা-দের (এক ধরনের টারমিগান পাখি) মধ্যে স্ত্রী-পাখিদের তুলনায় পুরুষ-পাখিরা সঙ্গমের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলে অনেক বেশি সংখ্যায় হাজির থাকে। তবে এই শেষোক্ত ঘটনাটার সম্বন্ধে কয়েকজন বলেছেন যে কীটমূষিকের আক্রমণে প্রচুর সংখ্যক স্ত্রী-পাখি মারা যায় বলেই এদের মধ্যে পুরুষ-পাখির সংখ্যাধিক্য ঘটে। সেলবার্নের হোয়াইট কক্‌রু প্রদত্ত তথ্যসমূহ থেকে দেখা যাচ্ছে ইংল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের তিতির পাখিদের মধ্যে পুরুষ-পাখিরা সংখ্যায় অনেক বেশি। স্কটল্যান্ডের তিতির পাখিদের মধ্যেও এই একই ব্যাপার লক্ষ করা যায়। যে-সব ব্যবসায়ীদের কাছে বিশেষ

বিশেষ মরসুমে প্রচুর রাফ (Machetes pugnax) পাখি চালান আসে, তাদের কাছে খোজখবর নিয়ে মিঃ ভাইর জেনেছেন যে এদের মধ্যেও পুরুষ-পাখিরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকে। এই প্রাণিবিজ্ঞানী মিঃ ভাইর আমার হয়ে কিছু পাখি-ধরিয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। লগুনের বাজারে বিক্রি করার জন্য এই পাখি-ধরিয়েরা প্রতি বছর নানারকম ছোট ছোট প্রজাতির পাখি প্রচুর সংখ্যায় ধরে থাকে। এদের মধ্যে জনৈক বৃদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য পাখি-ধরিয়ে মিঃ ভাইর-এর প্রশ্নের উত্তরে নির্দিষ্ট জানিয়েছিল যে চ্যাম্পিগ পাখিদের মধ্যে পুরুষ-পাখিরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকে—প্রতি ১টি স্ত্রী-পাখি পিছু ২টি করে পুরুষ-পাখি, কিংবা ৩টি স্ত্রী-পাখি পিছু অন্তত ৫টি করে পুরুষ-পাখি থাকেই।^{২৩} সে আরও জানিয়েছিল যে ব্ল্যাকবার্ড বা ভ্রামাপাখিদের মধ্যে পুরুষ-পাখিরা সংখ্যায় আরও বেশি হয়—তা সে কাদ পেতে ধরা পাখিদের মধ্যেই হোক বা রাত্রে জালে ধরা পাখিদের মধ্যেই হোক। কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়, কারণ এই পাখি-ধরিয়েটি একইসঙ্গে এ কথাও জানিয়েছিল যে ভরতপাখি, টুইটপাখি (Linaria montana) আর গোল্ডফিঞ্চদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান থাকে। এর পাশাপাশি সে এ-ও জানিয়েছিল যে সাধারণ লিনিট পাখিদের মধ্যে স্ত্রী-পাখিরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকে, তবে বিভিন্ন বছরে তাদের এই সংখ্যাধিক্যের হেরফের ঘটতে দেখা যায়—কোনও-কোনও বছরে ১টি পুরুষ-পাখি পিছু ৪টি করে স্ত্রী-পাখিও দেখা গেছে। তবে মনে রাখা দরকার পাখি ধরার আসল মরসুমটা সেপ্টেম্বর মাসের আগে শুরু হয় না। তার আগেই হয়তো কোনও-কোনও প্রজাতির পাখিদের দেশান্তর যাত্রাটা আংশিকভাবে শুরু হয়ে যায়, ফলে এই সময়ে অনেক দলে শুধু স্ত্রী-পাখিদেরই নজরে পড়ে। মধ্য আমেরিকার হামিং বার্ডদের বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন মিঃ স্তালভিন। তাঁর মতে এদের অধিকাংশ প্রজাতির মধ্যেই পুরুষদের সংখ্যাধিক্য থাকে। এক বছর তিনি এদের দশটি প্রজাতির মোট ২০৪টি পাখি সংগ্রহ করে ছিলেন যার মধ্যে ১৬৬টি ছিল পুরুষ-পাখি আর ৩৮টি ছিল স্ত্রী-পাখি। এদের অল্প দুটো প্রজাতির মধ্যে স্ত্রী-পাখিদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ করেছিলেন মিঃ স্তালভিন, তবে এইসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন মরসুমে বা বিভিন্ন অঞ্চলভেদে সংখ্যার সংখ্যার অল্পপাতটা পাণ্টে যায়। যেমন একবার ক্যাম্পাই লোপ্টেরাস

২৩। এর পরের বছর অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে এই একই তথ্য জানতে পেরেছিলেন মিঃ জেনার ভাইর। জীবন্ত অবস্থায় ধরা চ্যাম্পিগ পাখিদের ব্যাপারে একটা তথ্য এখানে উল্লেখ করা যায়। ১৮৬৯ সালে দুজন ওয়াশিংটন পাখি-ধরিয়ের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার প্রথমজন একদিনে ধরেছিল ৬২টা পুরুষ-চ্যাম্পিগ, দ্বিতীয়জন ধরেছিল ৪০টা পুরুষ-চ্যাম্পিগ। আর পর্বত একদিনে সবথেকে বেশি সংখ্যক পুরুষ-চ্যাম্পিগ ধরেছিল অন্য একজন পাখি-ধরিয়ে—৭০টা।

হেমিলিউকুরাস প্রজাতির মধ্যে প্রতি ২টি স্ত্রী-পাখি পিছু ৫টি করে পুরুষ-পাখি দেখেছিলেন তিনি, আবার অল্প এক জায়গায় দেখেছিলেন প্রতি ২টি পুরুষ-পাখি পিছু ৫টি করে স্ত্রী-পাখি। এই শেষ ব্যাপারটার সম্বন্ধে অল্প একটা তথ্যও এখানে জানিয়ে রাখা যায়। কোরফু এবং এপিরাসে চ্যাফিকদের স্ত্রী ও পুরুষদের আলাদা করে মিঃ পাওইস দেখেছিলেন, “এদের মধ্যে স্ত্রী-পাখির সংখ্যা অতিরিক্তরকম বেশি।” আবার পালেস্তাইনে মিঃ ক্রিস্টিয়ান দেখেছিলেন, “স্ত্রী-পাখির তুলনায় পুরুষ-পাখির সংখ্যা অনেক বেশি।” কুইস্ক্যালাস মেজর-দের সম্বন্ধে মিঃ জে. টেলর বলেছেন যে ফ্লোরিডায় “পুরুষ-পাখির তুলনায় স্ত্রী-পাখির সংখ্যা নিতান্তই কম।” আবার হগুরাসে এই পাখিদের মধ্যেই স্ত্রী-পাখিদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায় এবং সেখানে পুরুষ-পাখিরা সাধারণত বহুগামী হয়ে থাকে।

মাছ

মাছেদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের আত্মপাতিক সংখ্যা নির্ধারণের একটাই উপায় আছে—প্রাপ্তবয়স্ক অথবা প্রায়-প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় তাদেরকে ধরে এনে পরীক্ষা করে দেখা। এমনকি সেক্ষেত্রেও কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছনো খুব সহজ কাজ নয়।^{২৪} প্রজননশক্তিহীন স্ত্রী-মাছেদেরকে পুরুষ-মাছ বলে ভুল করা একান্তই স্বাভাবিক—ট্রাউট মাছেদের ব্যাপারে ঠিক এই কথাটাই আমাকে জানিয়েছেন ডঃ গুস্টার। অনেকে বলেন কোনও-কোনও প্রজাতির পুরুষ-মাছেরা নাকি স্ত্রী-মাছেদের গর্ভবতী করার পরই মারা যায়। আবার অনেক প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-মাছেদের থেকে পুরুষ-মাছেরা আকারে অনেক ছোট হয়, ফলে যে-জালে স্ত্রী-মাছেরা ধরা পড়ে সেই জাল থেকে সহজেই পালিয়ে যায় তারা। মঁসিয়ে কার্বো-নিয়ের, যিনি বানমাছেদের (*Esox lucius*) ইতিহাস নিয়ে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তিনি জানিয়েছেন যে এদের পুরুষ-মাছেরা আকারে ছোট হয় বলে বড় আকারের স্ত্রী-মাছেরা প্রায়শই তাদেরকে খেয়ে ফেলে। তাঁর মতে, বেশির ভাগ প্রজাতির ক্ষেত্রেই পুরুষ-মাছেরা আকারে ছোট হয় বলে স্ত্রী-মাছেদের তুলনায় তাদেরকে অনেক বেশি বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অল্প যে কয়েকটি ক্ষেত্রে মাছেদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের আত্মপাতিক সংখ্যার হিসেব পাওয়া গেছে, সেইসব ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্ত্রী-মাছেদের তুলনায় পুরুষ-মাছের সংখ্যা অনেক বেশি। স্টারমন্টফিল্ডে অক্সফোর্ড-কার্ণের সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ আর. ব্রুইস্ট বলেছেন—১৮৬৫ সালে ডিবাগু অর্জনের জন্য প্রথম ডাঙায় আসা

২৪। লিউকার্ট এ ব্যাপারে রথ-কে উদ্ধৃত করে (ভাগনার, “Handwörterbuch der Phys.,” খণ্ড ৪, পৃঃ ৭৭৫) বলেছেন যে মাছেদের মধ্যে স্ত্রী-মাছেদের তুলনায় পুরুষ-মাছ থাকে।

৭০টি স্ত্রীমান মাছের মধ্যে ৩০টিরও বেশি ছিল পুরুষ-স্ত্রীমান। ১৮৬৭ সালে তিনি আবার “স্ত্রী-মাছেদের তুলনায় পুরুষ-মাছেদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের দিকে সবার দৃষ্টি-আকর্ষণ করেন। শুরুতেই দেখা যায় প্রতি একটি স্ত্রী-মাছ পিছু অন্তত দশটি করে পুরুষ-মাছ আছে।” পরবর্তীকালে ডিবাণু অর্জনের জন্য আগত যথেষ্ট সংখ্যক স্ত্রী-মাছেদের দেখা পাওয়া যায়। মিঃ বৃইস্ট বলেছেন, “পুরুষ-মাছেদের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার ফলে প্রজননের গোটা এলাকাটা জুড়ে সারাক্ষণই তারা নিজেদের মধ্যে মারদাঙ্গায় ব্যস্ত থাকে।” পুরুষ-মাছেদের এই সংখ্যাধিক্যের একটা কারণ হল এই যে স্ত্রী-মাছেদের থেকে অনেক আগেই তারা নদীতে ঢুকে পড়ে, ফলে তাদেরকেই বেশি করে দেখা যায়—তবে এটাই এই সংখ্যাধিক্যের একমাত্র কারণ কিনা, বলা মুশকিল। ট্রাউট মাছেদের ব্যাপারে মিঃ এফ. বাকল্যাণ্ড বলেছেন, “লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এদের মধ্যে স্ত্রী-মাছেদের তুলনায় পুরুষ-মাছের সংখ্যা অনেক বেশি হয়। জালে করে যখন ট্রাউট মাছেদের ধরা হয়, তখন অবধারিতভাবেই স্ত্রী-মাছেদের তুলনায় অন্তত সাত-আট গুণ বেশি পুরুষ-মাছ ধরা পড়ে। এর কারণ ঠিক কী, আমার জানা নেই। হয়তো স্ত্রী-মাছেদের তুলনায় পুরুষ-মাছের সত্যিই সংখ্যায় অনেক বেশি থাকে, কিংবা হয়তো স্ত্রী-মাছেরা পালানোর চেষ্টা না করে কোথাও লুকিয়ে পড়ে বলেই বেশি সংখ্যায় ধরা পড়ে না।” এরপর তিনি বলেছেন যে নদীর পাড়ে ভালভাবে অনুসন্ধান চালালে ডিবাণু অর্জনের আগত যথেষ্ট সংখ্যক স্ত্রী-মাছের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মিঃ এইচ. লী আমাকে জানিয়েছেন যে লর্ড পোর্টসমাউথ’স পার্ক থেকে এই উদ্দেশ্যের জন্য সংগৃহীত ২১২টি ট্রাউট মাছের মধ্যে ১৫০টি ছিল পুরুষ-মাছ আর ৬২টি ছিল স্ত্রী-মাছ।

সাইপ্রিনিডে (Cyprinidae) মাছেদের মধ্যেও পুরুষ-মাছেদের সংখ্যাধিক্য চোখে পড়ে। তবে এই বর্গের কিছু কিছু মাছ, যেমন ক্র্যাপ, টেনশ্, ব্রিম ও মিনেট, এদের স্ত্রী-মাছেরা সর্বদাই বহুগামী হয়ে থাকে, যা সমগ্র প্রাণিজগতেই এক বিরল ঘটনা। সঙ্গমের মরসুমে প্রতিটি স্ত্রী-মাছের সঙ্গে দুটি করে পুরুষ-মাছ থাকে, একজন এপাশে একজন ওপাশে, আর ব্রিম মাছেদের ক্ষেত্রে তো প্রতিটি স্ত্রী-মাছের সঙ্গে অন্তত তিন-চারটি করে পুরুষ-মাছ থাকে। এই ঘটনাটা রীতিমতো বহুলপ্রচারিত বলেই যে-কোনও পুতুরে একটি স্ত্রী-টেনশ্-এর জন্য দুটি করে পুরুষ-টেনশ্, নিম্নেনপক্ষে দুটি স্ত্রী-টেনশ্-এর জন্য তিনটি করে পুরুষ-টেনশ্ ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জর্নৈক বিশিষ্ট পর্যবেক্ষক জানিয়েছেন যে প্রজনন-ক্ষেত্রে যতগুলি স্ত্রী-মিনেট থাকে তার চেয়ে অন্তত দশ গুণ পুরুষ-মিনেট ঘুরে বেড়ায় সেখানে। কোনও স্ত্রী-মিনেট যখন পুরুষ-মিনেটদের মধ্যে আসে, “তখন দুদিক থেকে দুটো পুরুষ-মাছ চেপে ধরে তাকে। ওইভাবে

কিছুক্ষণ কাটার পর ওই দুটো পুরুষ-মাছকে সরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গাটা দখল করে নেয় অল্প দুটো পুরুষ-মাছ।”

কীটপতঙ্গ

এই বিরাট শ্রেণীটার মধ্যে একমাত্র লেপিডোপ্টেরা বর্গের প্রাণীদেরই স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অসুপাত নির্ণয়ের উপায় আমাদের হাতে আছে, কারণ বেশ কিছু উৎকৃষ্ট পর্যবেক্ষক বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এদেরকে সংগ্রহ করেছেন এবং ডিম বা শুঁয়োপোকা অবস্থা থেকে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নিয়ে এসেছেন। আমি আশা করেছিলাম রেশমপোকা উৎপাদকরা নিশ্চয়ই রেশমপোকাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অসুপাতের ব্যাপারে কিছু নথিপত্র সংরক্ষণ করেন, কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালিতে খোঁজখবর নিয়ে এবং বিভিন্ন লেখাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে এ-রকম কোনও তথ্য আমি খুঁজে পাইনি। লোকে বলে এদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা নাকি প্রায় সমান-সমান হয়, কিন্তু অধ্যাপক কানেস্জিনি আমাকে জানিয়েছেন যে ইতালির বহু রেশমপোকা উৎপাদক মনে করে এদের মধ্যে স্ত্রী-পোকাদেরই সংখ্যাধিক্য থাকে। আবার এই অধ্যাপক কানেস্জিনিই আমাকে জানিয়েছেন যে আইল্যান্থাস রেশমপোকাদের (*Bombyx cynthia*) দু-বছরের জন্মের হিসেবে দেখা গিয়েছিল প্রথম বছরে পুরুষ-পোকারা অনেক বেশি সংখ্যায় জন্মেছে এবং দ্বিতীয় বছরে স্ত্রী-পুরুষ প্রায় সমান সংখ্যায় জন্মেছে অথবা স্ত্রী-পোকাদেরই কিছুটা সংখ্যাধিক্য থেকেছে।

প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা প্রজাপতিদের মধ্যে পুরুষ-প্রজাপতিদের বিপুল সংখ্যাধিক্য লক্ষ করেছেন বেশ কিছু পর্যবেক্ষক।^{২৫} উচ্চ আমাজন অঞ্চলের শ'খানেক প্রজাতির প্রজাপতিদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মিঃ বেট্‌স্‌ বলেছেন, এদের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীর তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা অনেক বেশি, এমনকি কোথাও-কোথাও একটি স্ত্রী-প্রজাপতি পিছু একশোটি করে পুরুষ-প্রজাপতিও দেখা যায়। সুগভীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এডওয়ার্ডস উত্তর আমেরিকার প্যাপিলিও বর্গের প্রজাপতিদের সম্বন্ধে বলেছেন—এদের মধ্যে প্রতি একটি স্ত্রী-প্রাণী পিছু চারটি করে পুরুষ-প্রাণী থাকে। এডওয়ার্ডসের এই মন্তব্যটির কথা আমাকে জানিয়েছেন মিঃ ওয়াল্‌শ্‌। সেইসঙ্গেই মিঃ ওয়াল্‌শ্‌ জানিয়েছেন যে পি. টার্নাস বর্গের প্রজাপতিদের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষের অসুপাত একটি স্ত্রী-প্রাণী পিছু চারটি করে পুরুষ-প্রাণী। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯টি প্রজাতির মধ্যে পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ করেছেন আর. ট্রিমন। এদের একটা প্রজাতি,

২৫। লিউকার্ট এ প্রসঙ্গে মাইনেক-কে উদ্ধৃত করে (ভাগনার, “Handwörterbuch der Phys.”, খণ্ড ৪, পৃঃ ৭৭৫) বলেছেন যে প্রজাপতিদের মধ্যে স্ত্রী-প্রজাপতিদের তুলনায় পুরুষ-প্রজাপতিদের সংখ্যা তিন-চার গুণ বেশি হয়।

স্বারা খোলা জায়গায় ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায়, তাদের মধ্যে প্রতি একটি স্ত্রী-প্রজাপতি পিছু পঞ্চাশটি করে পুরুষ-প্রজাপতির উপস্থিতি চোখে পড়েছিল তাঁর। অল্প আর-একটি প্রজাতি, যাদের মধ্যে কয়েকটা অঞ্চলে পুরুষদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়, তাদের ক্ষেত্রে সাত বছরে মাত্র পাঁচটি স্ত্রী-প্রজাপতি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তিনি। বুর্বে^১। দ্বীপে প্যাপিলিওদের একটি প্রজাতির মধ্যে স্ত্রী-প্রজাপতিদের তুলনায় কুড়ি গুণ বেশি পুরুষ-প্রজাপতির উপস্থিতি লক্ষ করেছিলেন মঁসিয়ে ম্যালিয়ার্ড। নিজের দেখা এবং অন্তদের কাছ থেকে শোনা তথ্যের ভিত্তিতে মিঃ ট্রিমন আমাকে জানিয়েছেন যে প্রজাপতিদের প্রায় কোনও প্রজাতির মধ্যেই পুরুষ-প্রাণীদের থেকে স্ত্রী-প্রাণীদের সংখ্যা বেশি হয় না, তবে দক্ষিণ আফ্রিকার তিনটি প্রজাতির ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। মালয় দ্বীপপুঞ্জের অনিথোপ্‌টেরা ক্রিসাস প্রজাতির প্রজাপতিদের ব্যাপারে মিঃ ওয়ালেস বলেছেন যে এদের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীরাই সংখ্যায় বেশি এবং এদেরকে ধরাও বেশি সহজ—তবে এটা একটি বিরল প্রজাতির প্রজাপতি। আরেকটা তথ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। মথেন্দের একটি বর্গ হাইপেরিথ্রা-দের ব্যাপারে গেনী বলেছেন—ভারতে এদের প্রতি একটি পুরুষ-প্রজাপতি পিছু চার-পাঁচটি করে স্ত্রী-প্রজাপতি দেখা যায়।

কীটপতঙ্গদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অসুপাতের এই প্রসঙ্গটা যখন এণ্টোমোলজিক্যাল সোসাইটিতে উপস্থাপিত হয়, তখন তাঁরা সাধারণভাবে মেনে নিয়েছিলেন যে লেপিডোপ্‌টেরা বর্গের অধিকাংশ প্রজাতির ক্ষেত্রেই স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের (পূর্ববয়স্ক বা সমজ অবস্থায়) অনেক বেশি সংখ্যায় ধরা যায়। তবে অনেক পর্যবেক্ষকই বলেছিলেন যে স্ত্রী-প্রাণীদের অলস স্বভাব এবং গুটি কেটে পুরুষ-প্রাণীদের আগে বেরিয়ে আসাটাই এর প্রধান কারণ। লেপিডোপ্‌টেরা বর্গের বেশির ভাগ প্রজাতির ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য কীট-পতঙ্গদের ক্ষেত্রেও এই শেবোক্ত ব্যাপারটা চোখে পড়ে—গুটি কেটে পুরুষরাই আগে বেরিয়ে আসে। মঁসিয়ে পার্সোন্টা বলেছেন—এই ব্যাপারটার ফলেই গৃহপালিত বঘিক্স ইয়ামামাই প্রজাতির ক্ষেত্রে মরসুমের গোড়ার দিকে পুরুষ-প্রাণীরা সঙ্গিনীর অভাবে বসে থাকে অকর্মণ্য অবস্থায় এবং মরসুমের শেষের দিকে স্ত্রী-প্রাণীরা সঙ্গীর অভাবে বসে থাকে অকর্মণ্য অবস্থায়। তবে কয়েকটি অঞ্চলের নিজস্ব কিছু প্রজাপতিদের যে দৃষ্টান্তগুলো ওপরে উল্লিখিত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে পুরুষদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের পিছনে এটাই একমাত্র কারণ হিসেবে কাজ করে বলে মেনে নিতে আমার কিছুটা আপত্তি আছে। মিঃ স্টেইনটন, যিনি বহু বছর ধরে ক্ষুদ্রাকৃতি মথেন্দের পর্যবেক্ষণ করে আসছেন, তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে সমজ (imago)

অবস্থায় এদেরকে সংগ্রহ করার সময় তাঁর ধারণা ছিল স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীর সংখ্যা অন্তত দশগুণ বেশি হবে, কিন্তু শুঁয়োপোকা অবস্থা থেকে প্রচুর সংখ্যক মথকে ফুটিয়ে তোলার পর তিনি নিশ্চিত হন যে স্ত্রী-প্রাণীরাই সংখ্যায় বেশি। বেশ কিছু পতঙ্গবিদ এই মতকে সমর্থন করেছেন। তবে মিঃ ডাব্লুডে এবং অন্ট কয়েকজন আবার উটো কথা বলেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল—ডিম থেকে এবং শুঁয়োপোকা থেকে যত মথকে তাঁরা ফুটিয়ে তুলেছেন, তাদের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীর থেকে পুরুষ-প্রাণীরাই সংখ্যায় বেশি।

পুরুষ-প্রাণীরা অধিকতর সক্রিয় স্বভাবের হয়, গুটি কেটে তারা আগেই বেরিয়ে আসে, কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বেশি খোলামেলা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় তারা—এগুলো নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তবে সমস্ত অবস্থায় ধরা এবং ডিম বা শুঁয়োপোকা অবস্থা থেকে বড় করে তোলা লেপিডোপ্টেরা বর্গের পতঙ্গদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যার আপাত বা প্রকৃত পার্থক্যের আরও কিছু কারণও আছে। অধ্যাপক কানেস্ট্রিনি আমাকে জানিয়েছেন - ইতালির অনেক রেশমচাষী মনে করে রেশমপোকাদের মধ্যে পুরুষ-শুঁয়োপোকাদের তুলনায় স্ত্রী-শুঁয়োপোকারা রোগে আক্রান্ত হয় অনেক বেশি সংখ্যায়। ডঃ স্টডিংগার জানিয়েছেন—লেপিডোপ্টেরাদের ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাণীদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক স্ত্রী-প্রাণী গুটির মধ্যে মারা যায়। অনেক প্রজাতির মধ্যে পুরুষ-শুঁয়োপোকাদের চেয়ে স্ত্রী-শুঁয়োপোকারা আকারে বড় হয় এবং শুঁয়োপোকা-সংগ্রাহকরা সবথেকে সুন্দর নমুনাগুলোই সংগ্রহ করতে আগ্রহী হওয়ার দরুন স্ত্রী-প্রাণীদেরকেই বেশি সংখ্যায় সংগ্রহ করে নিয়ে যান তাঁরা। তিনজন সংগ্রাহক আমাকে এই কথা জানিয়েছেন। আবার ডঃ ওয়ালেস নিশ্চিতভাবে মনে করেন যে বিরল প্রজাতির শুঁয়োপোকারাই সংগ্রহে যোগ্য এবং বিরল প্রজাতির যে-কোনও শুঁয়োপোকাই সংগ্রহ করেন বেশির ভাগ সংগ্রাহকরা—এ ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের কোনও বাহ্যবিচার তাঁরা করেন না। মুখের কাছে শুঁয়োপোকাদের দঙ্গল দেখলে পাখিরা সম্ভবত সবথেকে বড় শুঁয়োপোকাগুলোকেই খাওয়ার কাজে মন দেয়। অধ্যাপক কানেস্ট্রিনি আমাকে জানিয়েছেন—ইতালির কিছু কিছু রেশমচাষী মনে করে এইল্যান্থাস রেশমপোকাদের প্রথম শুঁয়োপোকাগুলোর মধ্যে পুরুষ-শুঁয়োপোকাদের তুলনায় স্ত্রী-শুঁয়োপোকাদেরকেই অধিক সংখ্যায় নষ্ট করে বোলতার দল (এই তথ্যের স্বপক্ষে খুব বেশি প্রমাণ অবশ্য তাদের হাতে নেই)। ডঃ ওয়ালেস আরও বলেছেন যে পুরুষ-শুঁয়োপোকাদের তুলনায় স্ত্রী-শুঁয়োপোকারা আকারে বড় হয় বলে তাদের বিকশিত হয়ে ওঠার জন্য বেশি সময় লাগে এবং বেশি খাদ্য ও বেশি আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়, ফলে বেজি বা পাখিদের কাছ থেকে বিপদের সম্ভাবনাও তাদের বেশিদিন

ধরে থাকে এবং খাত্তের অভাব দেখা দিলে তারাই বেশি সংখ্যায় মারা পড়ে। এ থেকে মনে হয় যে প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকার সময় লেপিডোপ্টেরা বর্গের মধ্যে পুরুষ-প্রাণীদের তুলনায় কম সংখ্যক স্ত্রী-প্রাণী পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর পক্ষে প্রয়োজনীয় হল এই পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় তাদের স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যাটাই, কারণ একমাত্র পূর্ণবয়স্ক অবস্থাতেই তারা বংশবিস্তারের ক্ষমতাটা অর্জন করে থাকে।

কয়েকজাতের পুরুষ-মথেরা যেভাবে বহুজনে মিলে একটিমাত্র স্ত্রী-মথের চারপাশে জড়ো হয়, তা থেকে মনে হয় এদের মধ্যে স্ত্রীদের থেকে পুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশি—অবশ্য গুটি থেকে স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের আগে বেরিয়ে আসাটাও এর কারণ হতে পারে। মি: স্টেইনটন আমাদের জানিয়েছেন—এলাচিস্টা রুফোসিনেরিয়া-দের (*Elachista rufocinerea*) একটি স্ত্রী-প্রাণীর চারপাশে প্রায়শই কুড়ি-পঁচিশটি পুরুষ-প্রাণীকে জড়ো হতে দেখা যায়। এটা সুবিদিত যে কোনও খাঁচার মধ্যে ল্যাসিওক্যাম্পা কোয়েরকাস (*Lasiocampa quercus*) বা স্যাটারনিয়া কার্পিনি (*Saturnia carpini*) প্রজাতির একটি স্ত্রী-প্রাণীকে রাখা হলে খাঁচাটির চারপাশে প্রচুর সংখ্যক পুরুষ-প্রাণী জড়ো হয়ে যায়, আর স্ত্রী-প্রাণীটিকে কোনও ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখলে পুরুষ-প্রাণীরা সেই ঘরের চিম্নির মধ্যে দিয়ে গলে তার কাছে পৌছনোর চেষ্টা করে। মি: ডাব্‌ল্‌ডে জানিয়েছেন—এই দুটি প্রজাতির একটি করে স্ত্রী-প্রাণীকে একটা ঘরে আটকে রেখে তিনি দেখেছিলেন মাত্র একদিনে পঞ্চাশ থেকে একশোটা পুরুষ-প্রাণী এসে জড়ো হয়েছিল তাদের চারপাশে। উইট দ্বীপে মি: ট্রিমেন একটা পরীক্ষা করেছিলেন। আগের দিন বন্দী করা ল্যাসিওক্যাম্পা প্রজাতির একটা স্ত্রী-পতঙ্গকে একটা বাস্কে রেখে নজর রাখছিলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই প্রজাতির পাঁচটা পুরুষ-পতঙ্গ ওখানে এসে জোটে এবং বাস্কেটার মধ্যে ঢোকার জন্তে নানারকম চেষ্টা শুরু করে দেয়। অস্ট্রেলিয়ায় মঁসিয়ে ভেরু (*Verreaux*) পরীক্ষা করেছিলেন বম্বিক্স (*Bombyx*) প্রজাতির একটা স্ত্রী-পতঙ্গকে নিয়ে। চুঁচুট একটা বম্বিক্স স্ত্রী-পতঙ্গকে একটা বাস্কে পুরে বাস্কেটা নিজের পকেটে রেখে দিয়েছিলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই প্রজাতির একরাশ পুরুষ-পতঙ্গ এসে ভীড় করে তাঁর চারপাশে। তিনি যখন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেন তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২০০টা পুরুষ-পতঙ্গও ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে।

লেপিডোপ্টেরা বর্গের পতঙ্গদের যে তালিকাটা মঁসিয়ে স্টডিংগার তৈরি করেছেন, তার দিকে আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছিলেন মি: ডাব্‌ল্‌ডে। ওই তালিকায় প্রজাপতিদের (*Rhopalocera*) ৩০০টি প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী-

পতঙ্গদের দাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, নিতান্ত সাধারণ প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের দামে কোনও পার্থক্য নেই, কিন্তু ১১৪টি বিরল প্রজাতির প্রজাপতিদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের দামে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এদের মধ্যে মাত্র একটা প্রজাতি বাদে বাকি সবকটা প্রজাতির ক্ষেত্রেই স্ত্রী-প্রজাপতিদের তুলনায় পুরুষ-প্রজাপতিদের দাম কম। এই ১১৩টি প্রজাতির দামের গড় হিসেব করলে দেখা যাবে স্ত্রী-প্রজাপতিদের দাম ১৪২ এবং পুরুষ-প্রজাপতিদের দাম ১০০। দামের এই তফাত থেকে একটা আপাত-সত্য হিসেব বেরিয়ে আসে—প্রতি ১০০টি স্ত্রী-প্রজাপতি পিছু পুরুষ-প্রজাপতি থাকে ১৪২টি। মথের (Heterocera) প্রায় ২ হাজার প্রজাতির নাম তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়েছে (যে-সব প্রজাতির স্ত্রী-মথের ডানা থাকে না, তাদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের আচরণে অনেক পার্থক্য বলে তাদের নাম এই তালিকায় রাখা হয়নি)। এই ২ হাজার প্রজাতির মধ্যে ১৪১টি প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-মথের দামে পার্থক্য লক্ষ করা যায়—১৩০টি প্রজাতির ক্ষেত্রে পুরুষ-মথের দাম স্ত্রী-মথের চেয়ে কম আর মাত্র ১১টি প্রজাতির ক্ষেত্রে পুরুষ-মথের দাম স্ত্রী-মথের চেয়ে বেশি। প্রথমোক্ত ১৩০টি প্রজাতির ক্ষেত্রে পুরুষ-মথের গড় দাম ১০০ এবং স্ত্রী-মথের গড় দাম ১৪৩। এই তালিকায় নথিভুক্ত প্রজাপতিদের ব্যাপারে মিঃ ডাব্লুডে মনে করেন (এ ব্যাপারে সারা ইংল্যান্ডে তাঁর চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা আর কারুরই নেই) যে এদের আচার-আচরণের মধ্যে এমন কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই যার দরুন এদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের দামের এত তারতম্য হতে পারে। তাঁর মতে, পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যা অনেক বেশি হয় বলেই তাদের দাম কম হয়। কিন্তু ডঃ স্টডিংগার আমাকে জানিয়েছেন যে এ ব্যাপারে তিনি ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে—স্ত্রী-পতঙ্গরা একটু অলস স্বভাবের হয় বলে আর গুটি থেকে পুরুষ-পতঙ্গরা আগে বেরিয়ে আসে বলেই প্রজাপতি-সংগ্রাহকরা স্ত্রী-পতঙ্গদের তুলনায় অনেক বেশি পুরুষ-পতঙ্গ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় আর তার ফলেই পুরুষ-পতঙ্গদের দামটা অনেক কম হয়ে যায়। স্ক্যোপোকা অবস্থা থেকে যে-সব প্রজাপতিকে বড় করে তোলা হয়, তাদের ব্যাপারে ডঃ স্টডিংগার মনে করেন যে গুটি অবস্থায় থাকার সময় এদের মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গদের চেয়ে স্ত্রী-পতঙ্গরা অনেক বেশি সংখ্যায় মারা যায়। তিনি আরও বলেছেন যে কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে মাঝেমাঝে কয়েক বছর করে কোনও-একটি লিঙ্গের পতঙ্গদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

লেপিডোপ্টেরা বর্গের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের (ডিম থেকে কিংবা স্ক্যোপোকা অবস্থা থেকে বড় করে তোলা) ব্যাপারে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের যে ক'টি তথ্য আমি হাতে পেয়েছি, এখানে তা পেশ করছি পাঠকদের

সামনে :

	পুরুষ	স্ত্রী
১৮৬৮ সালে এক্সারটার-এর রেভারেণ্ড জে. হেলিনস্‌১৬ মোট ৭৩টি প্রজাতির সমন্বকে (imago) বড় করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল...	১৫৩	১৩৭
১৮৬৮ সালে এল্টহ্যাম-এর মিঃ অ্যালবার্ট জোনস্‌ ২টি প্রজাতির সমন্বকে বড় করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল...	১৫২	১২৬
১৮৬৯ সালে তিনি ৪টি প্রজাতির সমন্বকে বড় করে- ছিলেন, যার মধ্যে ছিল...	১১৪	১১২
১৮৬৯ সালে হ্যান্টস্‌-এর এমস্‌ওয়ার্থ অঞ্চলের মিঃ বাক্লার ৭৪টি প্রজাতির সমন্বকে বড় করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল...	১৮০	১৬৯
কোল্‌চেস্টার-এর ডঃ ওয়ালেস বম্বিক্স সিন্থিয়া প্রজাতির একগুচ্ছ ডিম ফুটিয়ে বার করেছিলেন...	৫২	৪৮
১৮৬৯ সালে চীন থেকে পাঠানো বম্বিক্স পেরনায়ি- দের গুটি থেকে ডঃ ওয়ালেস বার করেছিলেন...	২২৪	১২৩
১৮৬৭ এবং ১৮৬৯ সালে বম্বিক্স ইয়ামামাই-দের দু'গুচ্ছ গুটি থেকে ডঃ ওয়ালেস বার করেছিলেন...	৫২	৪৬
মোট	৯৩৪	৭৬১

এই আটগুচ্ছ গুটি ও ডিমের হিসেবে পুরুষ-পতঙ্গদেরই সংখ্যাধিক্যের প্রমাণ পাচ্ছি আমরা। সবটা মিলিয়ে হিসেব করলে প্রতি ১০০টি স্ত্রী-পতঙ্গ পিছু ১২৭টি করে পুরুষ-পতঙ্গ জন্ম নিয়েছে। তবে এখানের এই সংখ্যাগুলো এতই কম যে এগুলোকে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা শক্ত।

এখানে যাক্কিছু তথ্যপ্রমাণ পেশ করা হল, তা মোটামুটিভাবে একইদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। এ থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছছি যে লেপিডোপ্টেরা বর্গের অধিকাংশ প্রজাতির মধ্যে ডিম ফুটে বেরোনের সময় স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গের সংখ্যাগত অল্পপাত যা-ই থাকুক না কেন, পূর্ববয়স্ক

২৬। এই প্রাণবিক্রানীটি আমার কাছে এর পূর্ববর্তী বছরগুলোর কিছু পরিসংখ্যানও পাঠিয়ে দিয়েছেন, যেখানে স্ত্রী-পতঙ্গদের সংখ্যাধিক্যের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই পরিসংখ্যানের মধ্যে অনেকগুলোই আনুমানিক বলে সেগুলোকে আমি এখানে উপস্থাপিত করিনি।

পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যা পূর্ববয়স্ক স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে সাধারণত বেশিই হয়ে থাকে।

অত্যন্ত কীটপতঙ্গদের ব্যাপারে খুব বেশি নির্ভরযোগ্য তথ্য আমি যোগাড় করে উঠতে পারিনি। স্ট্যাগ-বিটল্-দের (*Lucanus cervus*) মধ্যে “পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যা স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে অনেক বেশি হয়।” তবে ১৮৬৭ সালে কর্নেলিয়াস বলেছিলেন যে ওই বছরে জার্মানির একটা অংশে যখন এই পোকারা প্রচুর সংখ্যায় এসে জুটেছিল, তখন তাদের মধ্যে স্ত্রী-পতঙ্গদের সংখ্যা পুরুষ-পতঙ্গদের চেয়ে প্রায় ছ’গুণ বেশি ছিল। এলাটেরিডে-দের (*Elateridae*) একটি প্রজাতির ব্যাপারে বলা হয় যে এদের মধ্যে স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যা অনেক বেশি হয় এবং “প্রায়শই একটি স্ত্রী-পতঙ্গের সঙ্গে দু-তিনটি পুরুষ-পতঙ্গকে থাকতে দেখা যায়। অর্থাৎ এদের মধ্যে স্ত্রী-পতঙ্গদের বহুগামিতা চালু আছে।” স্ট্যাফিলিনিয়া (*Staphylinidae*) প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের মাথায় হল বা শূঁক থাকে এবং “এদের মধ্যে স্ত্রী-পতঙ্গদের সংখ্যা পুরুষ-পতঙ্গদের চেয়ে অনেক বেশি হয়।” এনটোমলজিক্যাল সোসাইটির সভায় মিঃ জ্যাকসন বলেছেন—বল্লভোজী টমিকাস ভিলোসাস-দের (*Tomicus Villosus*) মধ্যে স্ত্রী-পতঙ্গদের বিপুল সংখ্যাধিক্য থাকে আর পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যা এত কম হয় যে তাদেরকে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না।

কীটপতঙ্গদের কয়েকটি প্রজাতি ও কয়েকটি শাখার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অসুপাতের ব্যাপারে কিছু বলতে যাওয়া নিতান্তই অর্থহীন, কারণ এদের মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গ প্রায় থাকেই না এবং স্ত্রী-পতঙ্গরা যৌনসংসর্গ ব্যতীতই গর্ভবতী হতে পারে। সাইনিপিডে বর্গের বেশ কিছু পতঙ্গদের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা লক্ষ করা যায়। গাছের গায়ে ক্ষীতি তৈরি করতে সক্ষম (*gall-making*) সাইনিপিডে বর্গের যে পতঙ্গদেরকে মিঃ ওয়াল্শ লক্ষ করেছেন, তাদের মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গদের চেয়ে স্ত্রী-পতঙ্গদের সংখ্যা অন্তত চার-পাঁচ গুণ বেশি। তিনি আমাকে আরও জানিয়েছেন যে গাছের গায়ে ক্ষীতি তৈরি করতে সক্ষম মেলিডোমাইডে-দের (*Diptera*) ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। সাধারণ প্রজাতির কয়েক ধরনের করাতে-মাছিদের (*Tenthredinae*) সব মাপের কয়েকশো শূঁককীট থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছি ফুটিয়েছেন মিঃ এফ. স্মিথ, কিন্তু তাদের মধ্যে একটাও পুরুষ-মাছি ছিল না। অত্যাধিক, কুটিস বলেছেন যে তিনি এমন কিছু প্রজাতির (*Athalia*) পূর্ণাঙ্গ মাছি ফুটিয়েছেন যাদের মধ্যে পুরুষ-মাছিদের সংখ্যা স্ত্রী-মাছিদের থেকে ছ’গুণ বেশি ছিল, আবার এইসব প্রজাতিরই পূর্ণাঙ্গ মাছিদেরকে মাঠ-ময়দান থেকে ধরে এনে তিনি দেখেছেন তাদের মধ্যে অসুপাতটা এর ঠিক বিপরীত—স্ত্রী-মাছিদের সংখ্যাই পুরুষ-মাছিদের থেকে ছ’গুণ বেশি। মোমাছিদের নানান প্রজাতির

বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন হারমান মুলার, আবার একইসঙ্গে গুটি অবস্থা থেকে বেশ কিছু মোমাছিকে পূর্ণাঙ্গ করেও তুলেছিলেন তিনি। অতঃপর এইসব প্রজাতির মোমাছদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাটা গুনে দেখার চেষ্টা করেন তিনি। গুনতে গিয়ে তিনি দেখেন কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে পুরুষ-মোমাছদের সংখ্যা স্ত্রী-মোমাছদের থেকে অনেক বেশি, কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-মোমাছদের সংখ্যা পুরুষ-মোমাছদের থেকে অনেক বেশি, আবার কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান-সমান। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ-মোমাছরা স্ত্রী-মোমাছদের থেকে আগে গুটি কেটে বেরিয়ে এসেছিল বলে প্রজনন-মরমুমের শুরুতে পুরুষ-মোমাছরাই সংখ্যায় অধিক ছিল। মুলার আরও দেখেছিলেন যে কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী আর পুরুষ-মোমাছদের সংখ্যাগত অসুপাতটা একেক অঞ্চলে একেকরকম হয়—একটা অঞ্চলের অসুপাতের সঙ্গে অন্য একটা অঞ্চলের অসুপাতের বিপুল পার্থক্য থাকে। তবে হারমান মুলার নিজেই আমাকে জানিয়েছেন যে এইসব হিসেবগুলোকে একেবারে নিখুঁত বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়, কারণ পর্ববেষ্ণনের সময় কোনও-একটা লিঙ্গের পতঙ্গরা সহজেই পর্ববেষ্ণকের নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তাঁর ভাই ফ্রিজ্জ্ মুলার ব্রাজিলে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন একই প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-মোমাছরা মাঝেমাঝে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফুলের ওপরে গিয়ে বসে। অর্থোপ্টেরা বর্গের পতঙ্গদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের আসুপাতিক সংখ্যার ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানা নেই আমার। তবে কোর্তে বলেছেন যে তাঁর দ্বারা পরীক্ষিত ৫০০টি পঙ্গপালের মধ্যে প্রতি ৫টি পুরুষ-পঙ্গপাল পিছু ৬টি করে স্ত্রী-পঙ্গপাল ছিল। নিউরোপ্টেরা বর্গের পতঙ্গদের ব্যাপারে মিঃ ওয়াল্শ বলেছেন যে এদের অনেক প্রজাতির মধ্যেই (তবে ওডোনেটাস শ্রেণীর সব প্রজাতির মধ্যে নয়) পুরুষ-পতঙ্গদের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। এদের হেটেরিনা বর্গের মধ্যে স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যা অন্তত চার গুণ বেশি হয়। গম্ফাস বর্গের মধ্যেও পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়, আবার অন্য দুটি প্রজাতির মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গদের চেয়ে স্ত্রী-পতঙ্গদের সংখ্যা দু-তিন গুণ বেশি হয়। সোকাস (Psocus) বর্গের কয়েকটি ইউরোপীয় প্রজাতির ক্ষেত্রে এমন ঘটনাও দেখা যায় যে কয়েক হাজার স্ত্রী-পতঙ্গকে সংগ্রহ করা হল অথচ একটাও পুরুষ-পতঙ্গ খুঁজে পাওয়া গেল না, আবার এই বর্গেরই অন্য কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে উভয় লিঙ্গের পতঙ্গরা মোটামুটি সমান সংখ্যাতেই বিদ্যমান থাকে। ইংল্যাণ্ডে মিঃ ম্যাকলাখলান ‘আপাটানিয়া মুলিব্রিস’ প্রজাতির বেশ কয়েকশো স্ত্রী-পতঙ্গ সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু একটাও পুরুষ-পতঙ্গ তাঁর চোখে পড়েনি। ‘বোরিয়াস হাইমেলিস’ প্রজাতির মাত্র চার-পাঁচটি পুরুষ-

পতঙ্গের দেখা পেয়েছিলেন তিনি। অথচ এইসব প্রজাতিগুলোর অধিকাংশের ক্ষেত্রেই (একমাত্র টেনথ্রেডাইনে-রা বাদে) এখনও পর্যন্ত এমন কোনও প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি যা থেকে বলা চলে এদের স্ত্রী-পতঙ্গরা যৌনসংসর্গ ব্যতীতই গর্ভবতী হয়। এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে এইসব প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের সংখ্যাগত অসুপাতের এই আপাত বৈষম্যের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কত সীমিত।

আর্টিকুলাটা বর্গের অন্যান্য শ্রেণীগুলোর ব্যাপারে আমার হাতে আরও কম তথ্য আছে। বহু বছর ধরে মাকড়সাদের সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করেছেন মিঃ ব্র্যাকওয়াল। তিনি আমাকে জানিয়েছেন—পুরুষ-মাকড়সা বেশি অস্থির স্বভাবের হয় বলে সাধারণত তাদেরকেই বেশি চোখে পড়ে এবং তার ফলে আমরা মনে করি মাকড়সাদের মধ্যে পুরুষ-মাকড়সারাই সংখ্যায় বেশি থাকে। এদের কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে থাকে। কিন্তু এদের ছয়টি বর্গের এমন কয়েকটি প্রজাতির কথা মিঃ ব্র্যাকওয়াল উল্লেখ করেছেন যাদের মধ্যে স্ত্রী-মাকড়সাদেরই সংখ্যাধিক্য থাকে বলে মনে হয়।^{২৭} স্ত্রী-মাকড়সাদের তুলনায় পুরুষ-মাকড়সাদের শরীরের আকার ছোট হওয়া (যে পার্শ্বকাটা কখনও-কখনও অতিরিক্তরকম স্পষ্ট হয়ে ওঠে এদের মধ্যে) এবং স্ত্রী-মাকড়সাদের সঙ্গে পুরুষ-মাকড়সাদের চেহারার বিপুল পার্থক্য—এই দুটো কারণেই বোধহয় কোনও-কোনও ক্ষেত্রে এদেরকে সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে ওঠে।

নিম্নশ্রেণীর কিছু কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীরা (Crustacean) যৌনসংসর্গের সাহায্যে বংশবিস্তারে সক্ষম হয় এবং ঠিক এই কারণেই তাদের মধ্যে পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম হয়ে থাকে। একুশটি জায়গা থেকে সংগ্রহ করা অ্যাপাস-দের (Apus) ১৩ হাজার নমুনা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন ফন সিবল্ড। এই ১৩ হাজারের মধ্যে পুরুষ-প্রাণী ছিল মাত্র ৩১৯টি। এই বর্গের অন্তর্গত কিছু প্রাণীদের (টানাই ও সাইপ্রি) ব্যাপারে ফ্রিঞ্জ-মুলার আমাকে জানিয়েছেন যে এদের পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে অনেক কম দিন বাঁচে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে জন্মের সময় এদের মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা সমান-সমান থাকে, তাহলে পুরুষ-প্রাণীদের এই কমদিন বাঁচাটাকেই এদের মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হিসেবে মেনে নেওয়া যায়। আবার দাজিলের উপকূল থেকে ডায়াল্টিলাইডে আর সাইপ্রিডিনা-দের যে নমুনাগুলো লার সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে পুরুষ-প্রাণীদের

২৭। এই প্রাণীটির ব্যাপারে আরেকজন বিশেষজ্ঞ উপসালার অধ্যাপক মুলার বলেছেন “অন ইউরোপীয়ান স্পাইডারস”, ১৮৬৯-৭০, পৃষ্ঠা ১, পৃঃ ২০৫) যে এদের মধ্যে প্রায় সমসংখ্যেই পুরুষ-মাকড়সাদের চেয়ে স্ত্রী-মাকড়সাদের সংখ্যা বেশি হয়।

সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। যেমন একই দিনে ধরা ৬৩টি সাইপ্রিডিনার মধ্যে ৫৭টিই ছিল পুরুষ-প্রাণী। তবে তিনি বলেছেন যে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের আচার-আচরণের কোনও অজানা পার্থক্যের জন্মেই হয়তো পুরুষদের এই সংখ্যাধিক্যটা আমাদের চোখে পড়ে। ব্রাজিলের এক ধরনের উন্নত শ্রেণীর কাকড়াদের (যাদেরকে গেলাসিয়াস বলা হয়) ক্ষেত্রে ফ্রিংজ্ মুলার দেখেছিলেন যে এদের মধ্যে স্ত্রী-কাকড়াদের থেকে পুরুষ-কাকড়াদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়। আবার বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মিঃ সি. স্পেন্সর বোট ইংল্যান্ডের ছ'রকম সাধারণ শ্রেণীর কাকড়াদের মধ্যে এর ঠিক বিপরীত ঘটনাটাই লক্ষ করেছিলেন এবং এই ছ'রকম কাকড়াদের নামও আমাকে জানিয়েছেন তিনি।

প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাগত অনুপাত

এ কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে নির্বাচনের সাহায্যে মানুষ তার নিজের সম্ভাব্য উৎপাদনের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পেরেছে। কিছু মহিলা তাঁদের সারা জীবনে কোনও-একটি বিশেষ লিঙ্গের সম্ভাব্যদেরই অধিক সংখ্যায় জন্ম দিয়ে থাকেন। জীবজন্তুদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য, যেমন গরু ও ঘোড়াদের ক্ষেত্রে। ইয়েন্ডার্সলি হাউসের মিঃ রাইট তাঁর একটি আরবি মাদি-ঘোড়ার কথা জানিয়েছেন আমাকে। এই মাদি-ঘোড়াটির সঙ্গে সাতবার সাতটি আলাদা আলাদা পুরুষ-ঘোড়ার সঙ্গম ঘটানো হয়, কিন্তু প্রতিবারই সে একটি করে স্ত্রী-শাবকের জন্ম দেয়। এ ব্যাপারে আমার হাতে খুব বেশি প্রমাণ নেই ঠিকই, তবু অত্যন্ত নানান ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে দেখলে মনে হয় বিশেষ কোনও-একটি লিঙ্গের সম্ভাব্যদের জন্ম দেওয়ার প্রবণতাটা অল্প সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মতো (যেমন যমজ-সম্ভাব্যদের জন্ম দেওয়ার মতো) উত্তরাধিকারসূত্রেই অর্জিত হয়ে থাকে। এই প্রবণতাটির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মিঃ জে. ডাউনিং আমাকে এমন কিছু তথ্য জানিয়েছেন যা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় ছোট মাপের শৃঙ্গবিশিষ্ট কয়েক ধরনের গবাদি পশুর মধ্যে ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে থাকে। ভারতবর্ষের টোডা নামক একটি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রতি একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন কর্নেল মার্শাল। এদের মধ্যে সব বয়স মিলিয়ে মোট ১১২ জন পুরুষ এবং ৮৪ জন নারী আছে, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী পিছু ১৩৩.৩ জন করে পুরুষ। টোডাদের মধ্যে নারীদের বহুবিবাহ চালু আছে। অতীতে এদের মধ্যে নিশ্চয়ই নারী-শিশুদের হত্যা করার রীতি চালু ছিল, তবে অনেক বছর আগে থেকেই সে প্রথাটা বন্ধ হয়ে গেছে। বিগত কয়েক বছরে এদের সমাজে যত শিশুর জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে নারী-শিশুদের চেয়ে পুরুষ-শিশুদের সংখ্যা অনেক বেশি—প্রতি ১০০টি নারী-শিশু পিছু ১২৪টি করে পুরুষ-শিশু।

জন্মেছে। এ ব্যাপারে কর্নেল মার্শাল লিখেছেন, “ধরা যাক তিনটি পরিবারই এই গোটা জনগোষ্ঠীটার প্রতিনিধিস্বরূপ। আরও ধরে নেওয়া যাক যে এদের মধ্যে প্রথম পরিবারের মহিলাটি ছয়টি কন্যার জন্ম দিলেন কিন্তু একটিও পুত্রের জন্ম দিতে পারলেন না, দ্বিতীয় পরিবারের মহিলাটি জন্ম দিলেন ছয়টি পুত্রের এবং তৃতীয় পরিবারের মহিলাটির গর্ভ থেকে জন্ম নিল তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। এ-রকম অবস্থায় গোষ্ঠীর রীতি অনুযায়ী প্রথম মহিলাটি তাঁর চারটি কন্যাকে হত্যা করবেন এবং দুটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন, দ্বিতীয় মহিলাটি তাঁর ছয়টি পুত্রকেই বাঁচিয়ে রাখবেন আর তৃতীয় মহিলাটি তাঁর দুটি কন্যাকে হত্যা করে একটি কন্যা ও তিনটি পুত্রকে বাঁচিয়ে রাখবেন। তাহলে এই তিনটি পরিবার মিলিয়ে মোট নয়টি পুত্র আর তিনটি কন্যা জীবিত রইল, যারাই বয়ে নিয়ে যাবে গোষ্ঠীর বংশধারাকে। অর্থাৎ পুত্রসন্তানের জন্ম হওয়াটা এদের কাছে আনন্দের ব্যাপার হলেও কন্যাসন্তান মোটেই আকাঙ্ক্ষিত নয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকে এই পক্ষপাতটা, তারপর একসময় দেখা যায় এদের পরিবারগুলোর মধ্যে কন্যাসন্তানের থেকে পুত্রসন্তানই অধিক সংখ্যায় জন্মাচ্ছে।”

শিশুহত্যার যে পদ্ধতির কথাটা ওপরে বলা হয়েছে, তার ফলটা এ-রকম হওয়াই স্বাভাবিক, অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া যায় যে বিশেষ একটি লিঙ্গের সন্তানের জন্ম দেওয়ার প্রবণতাটা এরা উত্তরাধিকারস্বত্বে লাভ করে তাহলে তার পরিণতিটা এ-রকমই ঘটতে বাধ্য। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত পরিসংখ্যানগুলো নিতান্তই কম বলে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলাম আমি। তথ্য কিছু পেয়েছি ঠিকই, তবে সেগুলো কতগানি নির্ভরযোগ্য তা বুঝে উঠতে পারিনি। তবুও তথ্যগুলো পেশ করছি পাঠকদের সামনে। নিউজিল্যান্ডের মাওরি-দের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই শিশুহত্যার রীতি চালু ছিল। মিঃ ফেণ্টন^{২৮} বলেছেন যে তিনি “এমন বেশ কিছু মহিলাকে দেখেছেন যারা কেউ চারটি, কেউ ছয়টি, কেউ-বা নিজেদের সাতটি করে সন্তানকে হত্যা করেছেন এবং এই সন্তানদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কন্যাসন্তান। তবে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের বক্তব্য থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে যে এই প্রথাটা অনেক বছর আগেই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। খুব সম্ভবত ১৮৩৫ সালেই নিমূল হয়ে গিয়েছিল প্রথাটা।” টোভাদের মতোই নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের মধ্যেও এখন পুত্রসন্তান জন্মানো অনেক বেড়ে গেছে। মিঃ ফেণ্টন বলেছেন, “পুত্রসন্তান আর কন্যাসন্তান জন্মানোর মধ্যে ঠিক কবে থেকে এই সংখ্যাগত বৈষম্যটা দেখা দিয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও একটা ব্যাপার কিন্তু নিশ্চিত—

২৮। “অ্যাবরিজিন্যাল ইনহ্যাবিট্যান্টস অফ নিউজিল্যান্ড ; গভর্নমেন্ট রিপোর্ট”, ১৮৫৯, পৃঃ ৩৬।

কল্যাণস্বাস্থ্যের জয়হার কুমার এই প্রক্রিয়াটা ১৮৩০ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত সময়কালে পূর্ণমাত্রাতেই সক্রিয় ছিল, কারণ ওই সময় এদের সমস্ত অ-প্রাপ্ত-বয়স্কদের সংখ্যা গুনে দেখা হয়েছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটা এদের মধ্যে একইভাবে কাজ করে চলেছে।” নীচে যে কথাগুলো উল্লেখ করছি সেগুলোও মিঃ ফেটনের বিবৃতি থেকেই নেওয়া, কিন্তু যেহেতু এখানে উল্লিখিত সংখ্যাগুলো মোটেই পর্যাপ্ত নয় এবং যেহেতু জনগণনার কাজটাও একেবারে নিখুঁত ছিল না, সেহেতু এ থেকে কোনও স্থনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনো দুষ্কর। এদের ব্যাপারে এবং পরবর্তী উদাহরণগুলোর ব্যাপারে একটা কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা দরকার—যে-কোনও অঞ্চলের, বিশেষত যে-কোনও সুসভ্য দেশের জনসংখ্যায় নারীদেরই সংখ্যাধিক্য থাকে যার প্রধান কারণ যৌবনকালে পুরুষদের অধিক মৃত্যু-হার এবং আংশিক কারণ জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তাদের নানা ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হওয়া। ১৮৫৮ সালে নিউজিল্যান্ডে সব বয়স মিলিয়ে মোট ৩১৬৬৭ জন পুরুষ আর ২৪৩০৩ জন নারী ছিল, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী পিছু পুরুষ ছিল ১৩০.৩ জন করে। অথচ ওই বছরই কয়েকটা জেলায় খুব নিখুঁতভাবে গণনা করে দেখা গিয়েছিল ওইসব জেলায় সব বয়স মিলিয়ে মোট ৭৫৩ জন পুরুষ আর ৬১৬ জন নারী আছে, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী পিছু ১২২.২ জন করে পুরুষ। আমাদের আলোচনার পক্ষে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল—ওই ১৮৫৮ সালেই ওই জেলাগুলির একটিতে অ-প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছিল ১৭৮ জন আর অ-প্রাপ্তবয়স্ক নারী ছিল ১৪২ জন, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন অ-প্রাপ্তবয়স্ক নারী পিছু ১২৫.৩ জন করে অ-প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। এইসঙ্গেই উল্লেখ করা যায় যে ১৮৪৪ সালে, যখন নারী-শিশু হত্যার প্রথাটা সবে বন্ধ হয়েছে, তখন একটা জেলায় অ-প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সংখ্যা ছিল ২৮১ জন আর অ-প্রাপ্তবয়স্ক নারী ছিল মাত্র ১২৪ জন, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন অ-প্রাপ্তবয়স্ক নারী পিছু অ-প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছিল ১৪৪.৮ জন করে।

শ্রাওউইচ দ্বীপপুঞ্জে নারীদের চেয়ে পুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশি। একসময় এখানে শিশুহত্যার ঘটনা আকৃষ্ণার ঘটত, তবে মিঃ এলিস-এর লেখা থেকে এবং আমার কাছে পাঠানো বিশপ স্টেলি এবং রেভারেণ্ড মিঃ কোন্-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে শিশুহত্যার এই ব্যাপারটা শুধুমাত্র নারী-শিশুদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরেকজন নির্ভরযোগ্য লেখক মিঃ জার্ডিস, যিনি এই সমগ্র দ্বীপপুঞ্জটাকেই ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তিনি লিখেছেন, “এখানে এমন অনেক জীলোকের দেখা পাওয়া যায় যারা স্বীকার করে যে তারা তাদের তিনটি বা ছয়টি কিংবা আটটি সন্তানকে হত্যা করেছে।” এইসঙ্গেই তিনি বলেছেন, “পুরুষদের থেকে নারীদেরকে কম

প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় আর তাই নারী-শিশু হত্যার ঘটনাটাই বেশি সংখ্যায় ঘটেছে।” পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে শিশুহত্যার ব্যাপারে যাকিছু জানা গেছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে হয় মিঃ জার্ডিসের এই বক্তব্যটা সত্য হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়, তবে এ থেকে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আমাদের। ১৮১২ সালে যখন শ্রাওউইচ দ্বীপপুঞ্জে মূর্তিপূজার অবসান ঘটে এবং মিশনারিরা তাঁদের প্রচারকার্য শুরু করেন, তখন থেকেই এখানে শিশুহত্যার প্রথাটা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৩২ সালে কাউআই দ্বীপে এবং ওয়াহু-র একটা জেলায় প্রাপ্তবয়স্ক ও করযোগ্য (taxable) পুরুষ ও নারীদের সংখ্যা গণনা করা হয়েছিল যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে। তাতে দেখা গিয়েছিল পুরুষের সংখ্যা ৪৭২৩ জন আর নারী ৩৭৭৬ জন, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী পিছু ১২৫.০৮ জন করে পুরুষ। ওই সময়ে কাউআই দ্বীপে চোদ্দো বছরের নীচে এবং ওয়াহু-তে আঠারো বছরের নীচে পুরুষদের সংখ্যা ছিল ১৭২৭ জন আর ওই বয়সী নারীদের সংখ্যা ছিল ১৪২২ জন, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী পিছু পুরুষ ছিল ১২৫.৭৫ জন করে।

১৮৫০ সালে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের জনগণনায় দেখা যায় সব বয়স মিলিয়ে পুরুষদের সংখ্যা ৩৬২৭২ জন আর নারীদের সংখ্যা ৩৩১২৮ জন, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী পিছু ১০২.৪২ জন করে পুরুষ। সতেরো বছরের থেকে কমবয়সী পুরুষদের সংখ্যা ছিল ১০৭৭৩ জন আর ওই বয়সী নারী ছিল ২৫২৩ জন, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন নারী পিছু ১১২.৩৩ জন করে পুরুষ। ১৮৭২ সালের জনগণনায় সব বয়স মিলিয়ে (বর্ণসঙ্কররা সহ) নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল প্রতি ১০০ জন নারী পিছু ১২৫.৩৬ জন করে পুরুষ। মনে রাখা দরকার, শ্রাওউইচ দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যার এই হিসেবগুলোর মধ্যে শুধু জীবিত পুরুষদের সঙ্গে জীবিত নারীদের সংখ্যাগত অনুপাতটাই বিধৃত হয়েছে, জন্মের সময় তাদের সংখ্যাগত অনুপাতের হিসেব এর মধ্যে নেই। সুসভ্য দেশগুলির অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে আমরা বলতে পারি—জন্মের সময়কার হিসেবটাও এর অন্তর্ভুক্ত করা হলে পুরুষদের অনুপাতটা আরও অনেক বেড়ে যেত। ২২

২২। ১৮৩০ সাল নাগাদ ক্যালিফোর্নিয়ার অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডঃ কুলটার (“Journal R. Geograph. Soc.”, খণ্ড ৫, ১৮৩৫, পৃঃ ৬৭) বলেছেন—মিশনারিরা একসময় এখানকার যে আদি-বাসিন্দাদের চরিত্র-সংশোধন করেছিলেন তারা এখন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা ঝাড়ে, যদিও তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করা হয়, নিজেদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িতও করা হয়নি তাদের এবং মধ্যপানের অভ্যাসও ত্যাগ করেছে তারা। তাঁর মতে নারীদের থেকে পুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যাওয়াটাই তাদের এই বিলুপ্তির মূল কারণ,

উপবে যে ঘটনাগুলোর কথা বলা হল তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি উপরোল্লিখিত পন্থায় শিশুহত্যার ঘটনা ঘটে চললে সমাজে পুরুষদের সংখ্যাধিক্য দেখা দিতেই পারে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই প্রথাটাকে কিংবা অন্যত্র প্রজাতির মধ্যে এর সমতুল কোনও প্রক্রিয়াকে পুরুষদের সংখ্যাধিক্যের একমাত্র কারণ বলে মেনে নিতে আমি রাজি নই। যে-সব জাতি ইতিমধ্যেই নতুন নতুন সম্ভাবন উৎপাদনের ব্যাপারে কিছুটা অক্ষম হয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে হয়তো আমাদের অজানা কোনও নিয়ম কাজ করে চলে এবং তার ফলেই হয়তো তাদের সমাজে পুরুষদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। পুরুষদের সংখ্যা-ধিক্যের যে কারণগুলোর কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ছাড়া আরেকটা কারণের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। বহু দশায় থাকা মানুষদের প্রসব অনেক সহজে হয় এবং তার ফলে তাদের পুত্রসন্তানদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিপদও অনেক কম থাকে। এর ফলে তাদের মধ্যে জীবিত কন্যাসন্তানদের থেকে জীবিত পুত্রসন্তানদের সংখ্যাগত অল্পপাত বেশি হয়। তবে বহু দশার

তবে নারীদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ কন্যাসন্তান কম জন্মানো নাকি অল্পবয়সী নারীদের আর্থিক মজুত-হার—তা তিনি নির্ধারণ করতে পারেননি। অন্যান্য জারগার উদাহরণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, এই শেষোক্ত ব্যাপারটা ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। তিনি আরও বলেছেন, “শিশুহত্যার ব্যাপারটা এদের মধ্যে খুব-একটা চালা নেই, তবে গর্ভপাতের ঘটনা আক্সাই ঘটে থাকে।” শিশুহত্যা সম্বন্ধে ডঃ কুলটারের এই বক্তব্য যদি সঠিক হয়, তাহলে এটা কনসেল মার্শালের দৃষ্টিভঙ্গীকে ভুল বলে প্রমাণ করে। চরিত্র সংশোধনের পরেও এখানকার আদি-বাসিন্দাদের সংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়া থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে উল্লিখিত অন্যান্য জনগোষ্ঠীগুলোর মতো এদেরও প্রজননশক্তি অনেক কমে গেছে এবং জীবনমাপনের অভ্যাস-আচরণের পরিবর্তনই তার মূল কারণ।

আমি আশা করছিলাম কুকুরদের জীবনধারা থেকে এ ব্যাপারে নতুন কোনও সূত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। সম্ভবত একমাত্র গ্রেহাউন্ডরা বাদে অন্য সব ধরনের কুকুরদের মধ্যে পুরুষ-ছানাদের থেকে স্ত্রী-ছানারা অনেক বেশি সংখ্যার মারা যায়—ঠিক টোডা শিশুদের মতোই। মিঃ কাপল’স আমাকে জানিয়েছেন যে স্কটল্যান্ডের ডিয়ারহাউন্ডদের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটে থাকে। দূর্ভাগ্যবশত একমাত্র গ্রেহাউন্ড বাদে অন্য কোনও জাতের কুকুরদের স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই আমার—গ্রেহাউন্ডদের মধ্যে প্রতি ১০০টি স্ত্রী-কুকুর গিছ পুরুষ-কুকুর জন্মায় ১১০-১টি করে। বিভিন্ন কুকুর-পালকের বক্তব্য থেকে মনে হয় যে স্ত্রী-কুকুরদের নিয়ে বেশি কামেলা পোহাতে হলেও স্ত্রী-কুকুরই তাদের কাছে বেশি মূল্যবান। তাদের বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে সবথেকে ভালোভাবে পালিত কুকুরদের স্ত্রী-শাবকদেরকে তাদের পুরুষ-শাবকদের থেকে মোটেই বেশি সংখ্যার মারা হয় না, তবে অল্প কিছু ক্ষেত্রে এরকম একটা ঘটনা মাঝেমাঝে ঘটে থাকে। এ অবস্থার উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে বিচার করে যদি আমার কাছে জানতে চাওয়া হয় গ্রেহাউন্ডদের মধ্যে কেন পুরুষ-কুকুরদের সংখ্যাধিক্য থাকে, তাহলে তার উত্তর দিতে আমি অক্ষম। অন্যদিকে, ঘোড়া, গবাদি পশু আর ভেড়াবের ব্যাপারে (যাদের স্ত্রী-শাবক ও পুরুষ-শাবক দুটোই সমান মূল্যবান বলে কোনওটাকেই হত্যা করা যায় না) আমরা দেখছি যে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যার যদি আদৌ কোনও পার্থক্য থাকে, তাহলে সংখ্যাধিক্যের পার্থক্য স্ত্রী-প্রাণীদের দিকেই সামান্য ঝুঁকে থাকে।

জীবন আর পুরুষদের সংখ্যাধিক্যের মধ্যে কোনও আবশ্যিক সম্পর্ক আছে, এমন কথা আমি বলতে চাইছি না। টাসমানিয়ার যে অধিবাসীরা কিছুদিন আগেও বিত্তমান ছিল তাদের অল্পসংখ্যক সন্তানসন্ততির কথা এবং বর্তমানে নরফোক দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী তাহিতির বাসিন্দাদের সন্তর সন্তানদের ব্যাপারটা থেকেই বোঝা যায় যে এই দুটো ব্যাপারের মধ্যে কোনও আবশ্যিক সম্পর্ক নেই।

বহু ধরনের প্রাণীদের পুরুষ ও স্ত্রী-প্রাণীর মধ্যে অভ্যাস-আচরণের অনেক পার্থক্য থাকে এবং উভয় লিঙ্গের প্রাণীর বিপদের সম্ভাবনাটাও ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার হয়ে থাকে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের চেয়ে অন্য লিঙ্গটির প্রাণীদের বেশি সংখ্যায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু নানান কারণের এই জটিল জটের উৎস খুঁজতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে—যে-কোনও একটি লিঙ্গের প্রাণীরা নির্বিচারে (তা সে যত বেশি সংখ্যাতেই হোক না কেন) ধ্বংস হয়ে গেলেও ওই নির্দিষ্ট প্রজাতিটির মধ্যে ওই বিশেষ লিঙ্গের প্রাণীদের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতার কোনও পরিবর্তন তার ফলে ঘটে না। মোমাছি বা পিঁপড়াদের মতো পুরোপুরি সমাজবদ্ধ প্রাণী, যাদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক বন্ধ্যা ও প্রজনন-অক্ষম স্ত্রী-প্রাণী জন্মায় এবং যাদের জীবনে স্ত্রী-প্রাণীদের এই সংখ্যাধিক্যটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তাদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে তাদের মধ্যে সেই দলগুলোই সবথেকে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যাদের স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে আরও বেশি বেশি সংখ্যায় স্ত্রী-প্রাণীর জন্ম দেওয়ার একটা সহজাত প্রবণতা থাকে। এইসব ক্ষেত্রে অসম সংখ্যায় পুরুষ-প্রাণী আর স্ত্রী-প্রাণীদের জন্ম দেওয়ার প্রবণতাটা শেষ পর্যন্ত পাকাপাকি রূপ নেয় প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত। যে-সব প্রাণীরা দল বেঁধে বাস করে, যাদের মধ্যে দলকে রক্ষা করার জন্তে সামনে এগিয়ে আসে পুরুষ-প্রাণীরা (যেমন উত্তর আমেরিকার বাইসনরা এবং কয়েক ধরনের বেবুনরা), তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত বেশি সংখ্যায় পুরুষ-প্রাণী উৎপাদনের প্রবণতা গড়ে ওঠাটা একান্তই স্বাভাবিক, কারণ যে-দলের সদস্যরা অধিকতর সুরক্ষিত থাকবে তারা বেশি সংখ্যক বংশধর রেখে যেতেও সক্ষম হবে। মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষদের সংখ্যাধিক্য একটা সুবিধার জন্ম দেয় এবং স্ত্রী-শিশু হত্যার প্রথাটা চালু হওয়ার পিছনে অত্যন্ত প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করে সেটা।

উভয় লিঙ্গের প্রাণীদেরই সমান সংখ্যায় জন্ম দেওয়া কিংবা কোনও-একটি লিঙ্গের প্রাণীদের বেশি সংখ্যায় জন্ম দেওয়ার সহজাত প্রবণতাটা কখনোই কোনও প্রজাতির কয়েকজন সদস্যের ক্ষেত্রে অগ্গদের থেকে সরাসরিভাবে বেশি সুবিধাজনক বা বেশি অসুবিধাজনক হয়ে উঠতে পারে না। যেমন, কোনও

প্রজাতির একজন সদস্যের মধ্যে যদি স্ত্রী-সন্তানের তুলনায় বেশি সংখ্যক পুরুষ-সন্তানের জন্ম দেওয়ার প্রবণতা থাকে এবং অন্য একজনের মধ্যে থাকে তার ঠিক বিপরীত প্রবণতা, তাহলে জীবনসংগ্রামে দ্বিতীয়জনের তুলনায় প্রথমজন বেশি সফল হবে এমনটা ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। তাই এ ধরনের প্রবণতাগুলো প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত অজিত হতে পারে না। তথাপি কিছু কিছু প্রাণীদের মধ্যে (যেমন মাছ আর সিরিপেড বা গুলি-শামুক জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে) একটি স্ত্রী-প্রাণীকে গর্ভবতী করার জন্য দুই বা ততোধিক পুরুষ-প্রাণীর প্রয়োজন হয় এবং তাদের মধ্যে পুরুষ-প্রাণীদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়। কিন্তু বেশি সংখ্যায় পুরুষ-সন্তানের জন্ম দেওয়ার এই প্রবণতাটা তারা ঠিক কিভাবে অর্জন করে, সেটা আমাদের কাছে আদৌ স্পষ্ট নয়। আগে আমি মনে করতাম যে যে-সব ক্ষেত্রে উভয় লিঙ্গের সন্তানদের সমান সংখ্যায় জন্ম দেওয়াটা কোনও প্রজাতির ক্ষেত্রে সুবিধাজনক, সেইসব ক্ষেত্রে এই প্রবণতাটা নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফতই গড়ে ওঠে। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি—সমস্তটা এত বেশি জটিল যে এখনই এর কোনও উত্তর না খুঁজে সমাধানের ভারটা ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

নবম পরিচ্ছেদ

নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ

নিম্নতম শ্রেণীগণের মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না—উজ্জ্বল রঙ—মল্যাস্কা বা শাম্বুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণিবিশেষ—অ্যানেলিড বা কঁচো, জ্যাক জাতীয় প্রাণী—চিংড়ি, কংকড়া জাতীয় কঠিন খোলাবৃত্ত প্রাণী, বাদের মধ্যে অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত প্রকট ; ডাইমরফিজম বা শিবরূপতা ; রঙ ; পরিণত হয়ে না-ওঠা যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা দেয় না—মাকড়সা, লিঙ্গভেদে রঙের তফাত ; পুরুষ-মাকড়সাদের কর্ণতা—মিরিাপডা বা বাঁশচিক, কোনো জাতীয় বহুপদ সরীসৃপ ।

নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রায়শই একই প্রাণীর শরীরে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্যগুলোই বর্তমান থাকে, ফলে এদের মধ্যে অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যগুলো বিকশিত হতে পারে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুটি লিঙ্গের প্রাণীরা আলাদা আলাদা হলেও উভয়েই সারাজীবন কোনও-না-কোনও অবলম্বনে আবদ্ধ থাকে এবং একে অপরকে খুঁজে নিতে বা একে অপরকে পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে পারে না। তাছাড়া এটাও প্রায় নিশ্চিত যে এইসব প্রাণীদের অমুভূতি ও মানসিক ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল বলে এরা একে অপরের সৌন্দর্য বা অন্যান্য আকর্ষণকে উপলব্ধি করতে কিংবা কাউকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলেও অনুভব করতে পারে না।

এইসব কারণে এই শ্রেণীগুলোর মধ্যে, যেমন প্রোটোজোয়া, কোলেন্টেরাটা (Coelenterata), এচিনোডারমাটা (Echinodermata), স্কোলেসিডা (Scolecida) প্রভৃতিদের মধ্যে আমাদের আলোচনার আওতাভুক্ত কোনও অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। এই ঘটনা সেই ধারণাটিকেই সত্য বলে প্রতিপন্ন করে যে ধারণা মতে উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণীরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে যৌন নির্বাচনের সাহায্যেই, যে নির্বাচন নির্ভর করে উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও পছন্দ-অপছন্দের ওপর। তবে এ-সব সন্দেহ কিছু কিছু আপাত ব্যতিক্রমের কথাও জানতে পারি আমরা। যেমন ডঃ বেয়ার্ড আমাকে জানিয়েছেন—কয়েক ধরনের এন্টোজোয়া বা আভ্যন্তরীণ পরজীবী কুমির পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীদের গাত্রবর্ণের সামান্য পার্থক্য থাকে। তবে এ ধরনের পার্থক্যগুলো যে যৌন

নির্বাচনের ফলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, এমনটা ধরে নেওয়ার কোনও কারণ আমাদের নেই। যে-সব অঙ্গ বা উপায়ের সাহায্যে পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের আকড়ে ধরে এবং কোনও প্রজাতির বংশবিস্তারের ব্যাপারে যেগুলো নিতান্তই অপরিহার্য অঙ্গ বা উপায়, সেগুলো যৌন নির্বাচন মারফত অর্জিত হয়নি, অর্জিত হয়েছে সাধারণ নির্বাচন মারফতই।

নিম্নতর শ্রেণীর অনেক প্রাণীর (তা তারা উভলিঙ্গ কিংবা আলাদা আলাদা স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণী বিশিষ্ট, যা-ই হোক না কেন) গাত্রবর্ণ খুব উজ্জ্বল রঙের হয় কিংবা তাদের গায়ে খুব সুন্দর ডোরা থাকে। যেমন, বেশ কিছু প্রবাল ও সামুদ্রিক বায়ু-পরাগী ফুল (Actiniae), কয়েক ধরনের জেলি-ফিশ (মেডুসা, পশিটা ইত্যাদি), কিছু কিছু প্ল্যানারি, বেশ কিছু তারা-মাছ, একিনি (ভীক্ষু কটকাবৃত সামুদ্রিক শামুক), অ্যাসিডিয়ান (এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী) প্রভৃতি। কিন্তু যে কারণগুলোর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি—অর্থাৎ এইসব প্রাণীদের কান্নর-কান্নর ক্ষেত্রে একই শরীরে দুটি লিঙ্গই বিদ্যমান থাকা, অল্পদের কোনও-না-কোনও অবলম্বনে সারা জীবন আবদ্ধ থাকা এবং এদের সকলকার মানসিক ক্ষমতা নিম্নস্তরের হওয়া—এই কারণগুলোকে মাথায় রাখলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এদের এই গাত্রবর্ণ যৌন-আকর্ষণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না এবং এই গাত্রবর্ণ যৌন নির্বাচন মারফত অর্জিতও হয় নি। মনে রাখা দরকার কোনও ক্ষেত্রেই আমাদের হাতে এমন পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই যার ভিত্তিতে এইভাবে অর্জিত গাত্রবর্ণকে তাদের দুটি লিঙ্গের প্রাণীদের গায়ের রঙ আলাদা হওয়ার যুক্তিসম্মত কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে (একমাত্র যে-সব ক্ষেত্রে একটি লিঙ্গের প্রাণীদের গায়ের রঙ অল্প লিঙ্গের প্রাণীদের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল কিংবা অনেক বেশি চমকদার হয় এবং যেখানে উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের অভ্যাস-আচরণে কোনও পার্থক্য থাকে না, সেইসব ক্ষেত্র বাদে)। তবে যখন অধিকতর চাকচিক্যবিশিষ্ট প্রাণীরা (প্রায় সবক্ষেত্রে পুরুষরাই) তাদের বিপরীত লিঙ্গের প্রাণীদের সামনে নিজেদের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো প্রদর্শন করে তাদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে, তখন এই প্রমাণটা একেবারে দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ এই ধরনের প্রদর্শনকে আমরা অর্থহীন বলে মনে করতে পারি না এবং এই ব্যাপারটা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক হলে প্রায় অনিবার্যভাবেই তার পিছু-পিছু দেখা দেবে যৌন নির্বাচন। তবে কোনও প্রজাতির উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের গাত্রবর্ণ যদি এক হয় এবং তাদের এই গাত্রবর্ণের সঙ্গে যদি একই বর্ণের অল্প কোনও প্রজাতির যে-কোনও একটি লিঙ্গের সদস্যদের গাত্রবর্ণের হুবহু সাদৃশ্য থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তটিকে ওই প্রথম প্রজাতিটির উভয় লিঙ্গের সদস্যদের ক্ষেত্রেই

প্রয়োজ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

তাহলে একেবারে নিম্নতম শ্রেণীর বিভিন্ন প্রাণীদের গায়ের চমৎকার, এমনকি কখনও-কখনও জন্মকালো রঙের ব্যাপারটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করব আমরা? এই ধরনের গাঢ়বর্ণ এদের নিরাপত্তার সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে কিনা, সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। তবে এ বিষয়ে মিঃ ওয়ালেস-এর চমৎকার রচনাটি পড়ে দেখলে যে-কেউই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে এ ব্যাপারে ভ্রান্তির শিকার হওয়াটা আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। যেমন, প্রথম নজরে কাকুরই মনে হবে না যে মেডুসা বা জেলি-ফিশদের গায়ের স্বচ্ছতাটা তাদের নিরাপত্তার পক্ষে খুব সহায়ক কোনও ভূমিকা নিতে পারে। এক্ষেত্রে হ্যাকেল-এর কথাটা আমাদের মনে রাখা দরকার। হ্যাকেল বলেছিলেন যে শুধু মেডুসাদেরই নয়, শাশ্বুক জাতীয় নানা ধরনের ভাসমান কোমলাঙ্গ প্রাণী (Mollusca), কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণী, এমনকি কয়েক ধরনের ছোট ছোট সামুদ্রিক মাছেদের গাঢ়বর্ণও এইরকম কাচের মতো স্বচ্ছ হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা থেকে সাতটি রঙ ঠিকরে পড়ে। হ্যাকেলের এই কথাটা মনে রাখলে আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না যে এর সাহায্যে তারা নিজেদেরকে বিভিন্ন সামুদ্রিক পাখি ও অগ্ন্যাগ্ন শত্রুদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। ম'সিয়ে গিয়ার্ড-ও বলেছেন, কয়েক ধরনের স্পঞ্জ ও অ্যাসিডিয়ানের অঙ্গের উজ্জ্বল আভা তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। একইভাবে, বহু প্রাণীর গায়ের চমকদার রঙও তাদের জীবনে খুব প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ধরনের রঙ দেখে তাদের সম্ভাব্য খাদকরা মনে করে যে খাওয়া হিসেবে তারা মোটেই খুব রুচিকর হবে না অথবা মনে করে যে ওই রঙটা তাদের আত্মরক্ষার একটা বিশেষ কিছু উপায়। তবে এই বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার।

নিম্নতম শ্রেণীর অধিকাংশ প্রাণীদের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমিত। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে তাদের শরীরের উজ্জ্বল আভাটা সৃষ্টি হয় তাদের টিক্কা বা কলার রাসায়নিক প্রকৃতি কিংবা অতিক্রম গঠনকাঠামোর ফল হিসেবেই—এর দরুন যে সুবিধেটা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই আভা সৃষ্টি হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। শিরায়-শিরায় বহমান রক্তের রঙের থেকে স্ফুল্ভর কোনও রঙের সন্ধান পাওয়া শক্ত। কিন্তু তাই বলে এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে রক্তের এই রঙটা আমাদেরকে কোনও বাড়তি সুবিধে যোগিয়ে থাকে। কুমারীর কপোলের সৌন্দর্য এই রক্তমাভায় আরও বাড়ে ঠিকই, কিন্তু সেই সৌন্দর্যকে বাড়ানোর জগ্গেই যে তার রক্তের রঙ লাল হয়ে উঠেছে—এমনটা দাবি করার মতো মূর্খ কেউই

নয়। একইভাবে অনেক প্রাণীর, বিশেষত নিম্নতর শ্রেণীর অনেক প্রাণীর, পিত্ত খুব উজ্জ্বল রঙের হয়। যেমন, মিঃ হ্যানকক আমাকে জানিয়েছেন যে ইওলিডে-দের (খোলাহীন সামুদ্রিক শামুক) আশ্চর্য সৌন্দর্যের প্রধান কারণ হল ঈষদচ্ছ স্বকের মধ্যে দিয়ে পরিদৃশ্যমান তাদের পিত্তগ্রন্থি—কিন্তু সম্ভবত এই সৌন্দর্য তাদের কোনও কাজেই লাগে না। আমেরিকার একটা অরণ্যের গাছপালার শুকনো পাতার রঙকে সকলেই খুব জমকালো বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কেউই বলেন নি যে পাতার এই জমকালো রঙটা ওই গাছগুলোর পক্ষে কোনও সুবিধাজনক ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাকৃতিক জৈবিক পদার্থের প্রায় সমস্ত বহু পদার্থ সম্প্রতিকালে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন রসায়নবিদরা এবং সেগুলি অত্যন্ত বর্ণময়ও বটে। এই কথাটা মনে রেখে আমরা বলতে পারি যে জীবজগতের জটিল পরীক্ষাগারেও যদি এরকম বর্ণময় সজীব পদার্থ সৃষ্টি না হত তাহলে তা এক আশ্চর্য ঘটনাই হত। এরকম বর্ণময় সজীব পদার্থ জীবজগতের পরীক্ষাগারে যথেষ্টই সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই বর্ণময়তা তাদের প্রায় কোনও কাজেই লাগে না।

শামুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণীদের উপ-বিভাগ। আমি যতদূর জানি তাতে প্রাণিজগতের এই বিশাল বিভাগটার মধ্যে অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। প্রাণিজগতের তিনটি নিম্নতম শ্রেণী, অর্থাৎ অ্যাসিডিয়ান, পলিজোয়া (প্রবাল ইত্যাদি) ও ত্র্যাকিওপড (অনেকে এই তিনটি শ্রেণীকে মিলিতভাবে মল্যাসকইডা নামে চিহ্নিত করে থাকেন)—এদের মধ্যেও অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি আশা করা যায় না, কেননা এইসব প্রাণীদের অধিকাংশই সারা জীবন কোনও-একটা অবলম্বনের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে, আবার এদের অনেকের একই শরীরের মধ্যেই দুটি লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। ল্যামেলিব্র্যাংকিআটা (Lamelli-branchiata) বা ঝিপুটক শামুক জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে উভলিঙ্গতা মোটেই কোনও বিরল ঘটনা নয়। এর পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণী গ্যাস্টারোপডা (Gasteropoda) বা একপুটক শামুকজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে একই শরীরে দুটি লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে, আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞী আর পুরুষ আলাদা আলাদা হয়। কিন্তু এই শেবোক্ত ক্ষেত্রটিতে জ্ঞী-প্রাণীদের খুঁজে বার করা, আঁকড়ে ধরা, মোহিত করা কিংবা অন্ত পুরুষদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য কোনও বিশেষ অঙ্গ পুরুষ-প্রাণীদের শরীরে কখনোই থাকে না। মিঃ গোইন জেক্সিস আমাকে জানিয়েছেন যে এদের জ্ঞী আর পুরুষ-প্রাণীদের বহিরঙ্গের পার্থক্যটা থাকে একমাত্র খোলায়—দুটি লিঙ্গের প্রাণীদের খোলার আকারে সামান্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন, পুরুষ-গেঁড়িদের (Littorina

littorea) খোলা জ্বী-গেঁড়িদের তুলনায় কিছুটা সফ হয এবং সামনের প্যাচালো অংশটা কিছুটা বড় হয়। তবে ধরে নেওয়া যায় যে এই পার্থক্যগুলো হয় জননক্রিয়ার সঙ্গে নয়তো ডিম্বাণুর বিকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

গ্যাস্টারোপডা-রা চলাফেরা করতে পারে এবং অসম্পূর্ণ ধরনের চোখও থাকে তাদের, কিন্তু একই লিঙ্গের অন্য প্রাণীদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে তাদের সঙ্গে লড়াই করার মতো মানসিক ক্ষমতা এদের থাকে না, ফলে কোনও অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যও অর্জন করতে পারে না এরা। তবে প্লামোনিফেরাস গ্যাস্টারোপড বা স্থলচর শামুকরা (land-snail) জোড়-বাধার আগে প্রণয় নিবেদন করে থাকে। আসলে উভলিঙ্গ হলেও এদের শরীরের গঠনকাঠামো এমন যাতে করে জোড় বাধতে বাধাই হয় এরা। আগাসি বলেছেন, “শামুকদের প্রণয় নিবেদন পর্ব যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা কেউই ওই সময়ে তাদের শারীরিক নড়াচড়া ও প্রলোভনমূলক ব্যাপারগুলোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না—এইসব কাজের মধ্যে দিয়েই এই উভলিঙ্গ প্রাণীদের একইসঙ্গে দু’প্রহ যৌন সম্পর্ক শুরু হয় ও সম্পন্ন হয়।”

এই স্থলচর শামুকরা বরাবরের মতো জোড় বাধতেও কিছুটা সক্ষম বলে মনে হয়। নিখুঁত পর্ববেক্ষক মিঃ লন্সডেল আমাকে একটা ঘটনার কথা জানিয়েছেন। একজোড়া স্থলচর শামুককে (*Helix pomatia*) একটা ছোট ও খাণ্ড সংগ্রহের পক্ষে অনুবিধেজনক বাগানে রেখে দিয়েছিলেন তিনি, যাদের মধ্যে একটা শামুক ছিল খুব দুর্বল ধরনের। কিছুক্ষণ পরে বাগানে গিয়ে শক্তিশালী ও ঝটপুষ্ট শামুকটাকে দেখতে পাননি তিনি। পরে তার শরীর-নিঃসৃত আঠালো রসের দাগ অনুসরণ করে দেখেন যে একটা দেয়াল টপকে পাশের একটা খাণ্ডপূর্ণ বাগানে চলে গেছে শামুকটা। ঘটনাটা দেখে মিঃ লন্সডেল ধরে নেন যে নিজের দুর্বল সঙ্গীকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে শামুকটা। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পর সেই শামুকটা আবার ফিরে আসে, নিজের সফল অভিযানের কাহিনী সঙ্গীটিকে জানায় (মানে ব্যাপারটা সেইরকমই দাঁড়ায় আর কি), তারপর দুজনে একই পথরেখা ধরে এগিয়ে দেয়াল টপকে পাশের বাগানে চলে যায়।

মল্যাস্কা বা শামুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণীদের উচ্চতম শ্রেণীর সদস্য হচ্ছে সেক্যালোপডা (*Cephalopoda*) বা কাটলফিশ-রা। এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীরা আলাদা আলাদা হয়। কিন্তু আমি যতদূর জানি তাতে এমনকি এদের মধ্যেও আমাদের আলোচনার অন্তর্গত কোনও অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। এটা একটা রীতিমতো বিস্ময়কর ব্যাপার, কেননা এইসব প্রাণীদের অহুত্বের অঙ্গসমূহ অত্যন্ত উন্নত ধরনের হয় এবং বেশ ভালোরকম মানসিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এরা—শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এদের

স্বকোশলী প্রয়াস ধারা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা সকলেই এ কথাটা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। তবে এদের কারুর কারুর মধ্যে একটা অস্বাভাবিক যৌন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এদের পুরুষ-প্রাণীরা তাদের একটা হাত বা কণ্ঠিকা (tentacle) দিয়ে স্ত্রী-প্রাণীদের আঁকড়ে ধরে (যে হাত বা কণ্ঠিকাটা তখন খোলা অবস্থায় থাকে), সেই কণ্ঠিকার চোষক-চাকতিটার সাহায্যে স্ত্রী-প্রাণীদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে এবং ওই কণ্ঠিকাটা কিছুক্ষণের জন্য মূল দেহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা স্বাধীন জীবনযাপন করে আসে। এই বিচ্ছিন্ন কণ্ঠিকাটাকে একটা সম্পূর্ণ পৃথক প্রাণী বলে মনে হওয়ার জন্যই কুভিয়ার এটাকে এক ধরনের পরজীবী কুমি হিসেবে চিহ্নিত করে নাম দিয়েছিলেন হেক্টোকোটাইল (Hectocotyle)। তবে এদের এই আশ্চর্য ব্যাপারটাকে অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত না করে মূখ্য যৌন বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত করাই বোধহয় অধিকতর সঙ্গত।

শামুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণীদের মধ্যে যৌন নির্বাচনের অস্তিত্ব লক্ষ করা না গেলেও বেশ কিছু একপুটক ও দ্বিপুটক শামুকের, যেমন কুণ্ডলাকার শামুক, শাঙ্কবাকার শামুক, অর্ধবৃত্তাকার শামুক ইত্যাদিদের রঙ ও আকৃতি খুব সুন্দর হতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রঙটা তাদের আত্মরক্ষার কোনও কাজে লাগে বলে মনে হয় না। নিম্নতম শ্রেণীর প্রাণীদের মতোই এদের এই রঙও খুব সম্ভবত টিস্যু বা কলার প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই দেখা দেয়। আর খোলার আকৃতি ও নিমিতিটা নির্ভর করে তাদের বৃদ্ধির ধরনের ওপর। আলোর পরিমাণও বোধহয় এর ওপরে কিছুটা প্রভাব ফেলে। যদিও মিঃ গোইন জেফ্রিস বারবারই বলেছেন জলের অনেকটা গভীরে বসবাসকারী কয়েকটি প্রজাতির খোলা খুব উজ্জল বর্ণের হয়, তবুও আমরা সাধারণত এটাই দেখি যে এদের শরীরের নীচের দিকটা এবং আশ্রয়স্থলের ত্বকে ঢাকা পড়ে থাকা অংশগুলো শরীরের ওপরের অংশ ও অনাবৃত অংশের তুলনায় অসুজ্জল রঙের হয়ে থাকে।^১ কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেমন প্রবাল বা উজ্জল আভাবিশিষ্ট সামুদ্রিক লতাগুল্মের মধ্যে বসবাসকারী শামুক জাতীয় প্রাণীদের শরীরের উজ্জল রঙটা হয়তো তাদের আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে কাজ করে থাকে। কিন্তু হুডিব্রাঞ্চ (nudibranch) মল্যাস্কা বা খোলাহীন সামুদ্রিক শামুকদের গায়ের রঙও যে খুব সুন্দর হয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় অ্যালডার

১। পর্নাঙ্গ জাতীয় এক ধরনের প্রলেপ বা আবরণের রঙের ওপর আলোর প্রভাবের একটা বিচিত্র দৃষ্টান্তের কথা অন্যত্র উল্লেখ করেছি আমি (“জিওলাজিক্যাল অবজার্ভেশনস অন ডলফ্যানিক আইল্যান্ডস,” পৃঃ ৫০)। অ্যাসেনশন-এর উপকূলবর্তী পাথরের ওপর সমুদ্রতরঙ্গের ফেনা এসে পড়ে এই প্রলেপ জমা হয় এবং এগুলো গড়ে ওঠে সামুদ্রিক শামুকখোলা চূর্ণের প্রবণের সাহায্যে।

এবং হ্যান্‌কক-এর চমৎকার গ্রন্থটির মধ্যে । মিঃ হ্যান্‌কক আমাকে যে-সব তথ্য জানিয়েছেন তা থেকে মনে হয় এই রঙটা তাদের আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে আদৌ কাজ করে না । কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে গায়ের রঙ হয়তো আত্মরক্ষার একটা উপায় হিসেবে কাজ করে থাকে, যেমন সামুদ্রিক শৈবালের সবুজ-সবুজ পাতার মধ্যে বসবাসকারী গাঢ় সবুজ বর্ণবিশিষ্ট একটি প্রজাতির ক্ষেত্রে । কিন্তু অল্প অনেক গাঢ় রঙ বা সাদা রঙ কিংবা অল্প কোনও চমকদার রঙবিশিষ্ট প্রজাতির প্রাণীরা নিজেদের লুকিয়ে রাখার জন্য কোনও আড়াল খোঁজে না । আবার একইরকম চমকদার রঙবিশিষ্ট এবং অস্বচ্ছ রঙবিশিষ্ট কিছু কিছু প্রজাতির প্রাণীরা পাথরের নীচে বা কোনও অন্ধকার জায়গায় বসবাস করে । অর্থাৎ হুডিভ্রাঙ্ক মল্যাস্কা শ্রেণীর এইসব প্রাণীদের বসবাসের জায়গার সঙ্গে তাদের গায়ের রঙের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না ।

এই খোলাহীন সামুদ্রিক শামুকরা উভলিঙ্গ হলেও ডাঙার শামুকদের মতোই (যাদের মধ্যে অনেকের গায়েই খুব সুন্দর খোলা থাকে) এরাও জোড় বঁাধে । দুটি উভলিঙ্গ প্রাণী পরস্পরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে জোড় বঁাধতে পারে এবং এমন সন্তানের জন্ম দিতে পারে যারা তাদের জনক-জননীর সৌন্দর্যের উত্তরাধিকারী হয়—এটা খুব-একটা অসম্ভব কিছু নয় । কিন্তু এত নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটবে একেবারেই অসম্ভব । তাছাড়া একজোড়া সুন্দরতর উভলিঙ্গ প্রাণীর সন্তানরা একজোড়া কম সুন্দর উভলিঙ্গ প্রাণীর সন্তানদের থেকে সংখ্যায় বেড়ে ওঠার ব্যাপারে কোন বিশেষ সুবিধেটা পেতে পারে, সেটাও বুঝে ওঠা দুষ্কর—অধিকতর সৌন্দর্যের সঙ্গে অধিকতর প্রাণশক্তি যুক্ত হলে তবেই তো সংখ্যায় বেড়ে ওঠার ব্যাপারে একটা বাড়তি সুবিধে পাওয়া যেতে পারে । কিছু কিছু পুরুষ-প্রাণী যে স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে আগেই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে এবং বেশি প্রাণশক্তিসম্পন্ন স্ত্রী-প্রাণীরা বেশি সৌন্দর্যসম্পন্ন পুরুষ-প্রাণীদের বেছে নেয়, তা সত্যি বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে সে কথাটা প্রযোজ্য নয় । তবে জীবনযাপনের সাধারণ অভ্যাস-আচরণের ব্যাপারে উজ্জল গাঢ়বর্ণটা যদি কোনও উভলিঙ্গ প্রাণীর পক্ষে সত্যিই সুবিধাজনক হত, তাহলে ওই উজ্জল গাঢ়বর্ণবিশিষ্ট প্রাণীরাই সবথেকে ভালোভাবে টিকে থাকত এবং সংখ্যায় সবথেকে বেশি হয়ে উঠত । তবে বাস্তবে যদি এমনটা ঘটতও, তাহলে সেটা যৌন নির্বাচনের ঘটনা হত না, সেটাকে চিহ্নিত করতে হত প্রাকৃতিক নির্বাচন হিসেবেই ।

ভার্মিস (Vermes) উপ-বিভাগ : অ্যানেলিডা (সামুদ্রিক পোকা, কঁচো ইত্যাদি) শ্রেণী । এই শ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীরা যে-সব ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হয়, সেইসব ক্ষেত্রে অনেক সময় এদের বৈশিষ্ট্যগুলোও

পরম্পরের থেকে এত আলাদা ধরনের হয় যে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন বর্গের বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের পরম্পরের মধ্যকার এই পার্থক্য সেই গোত্রের নয় থাকে যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। এইসব প্রাণীদের গায়ের রঙ প্রায়শই খুব স্পষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু এ ব্যাপারে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না বলে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। এমনকি অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর নেমেরশিয়ান-রাও (ফিতা-কুমি জাতীয়) “সৌন্দর্যে এবং রঙের বৈচিত্র্যে অমেরুদণ্ডী শ্রেণীর যে-কোনও প্রাণীর সমকক্ষ।” কথাটা বলেছেন ডঃ ম্যাকিনটশ, কিন্তু একথা বলা সত্ত্বেও এদের এই গাছবর্ণের বিশেষ কোনও উপযোগিতা খুঁজে পাননি তিনি। মঁসিয়ে কাক্সফাজ বলেছেন যে প্রজননের পর্যায়টা অতিক্রম করার পর একই জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত সামুদ্রিক কঁচো জাতীয় প্রাণীদের গায়ের রঙ অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। আমার ধারণা ওই সময় তাদের প্রাণশক্তির অভাবের দরুনই এটা ঘটে থাকে। কঁচো জাতীয় এইসব প্রাণীদের উভয় লিঙ্গের সদস্যরাই এত নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী যে তাদের পক্ষে নিজের সঙ্গী বা সঙ্গিনী হিসেবে বিশেষ কাউকে বেছে নেওয়া কিংবা একই লিঙ্গের প্রাণীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে লড়াই করা একেবারেই অসম্ভব।

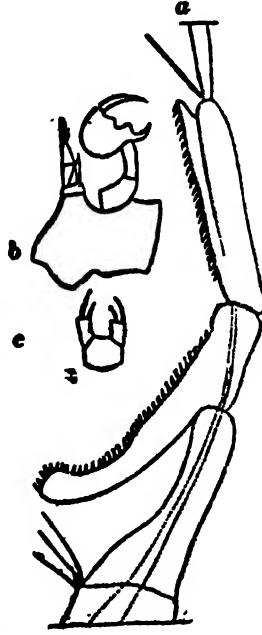
আর্থ্রোপডা (Arthropoda, কাঁকড়া, কীটপতঙ্গ, মাকড়সা ইত্যাদি জাতীয়) উপ-বিভাগ : কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের শ্রেণী। এই বিরাট শ্রেণীটার মধ্যেই অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট নজির প্রথম চোখে পড়ে আমাদের, যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায়শই খুব বিচিত্রভাবে গড়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যবশত এই কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের বিভিন্ন অভ্যাস-আচরণের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমিত। এদের উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের শরীরে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যস্বরূপ এমন অনেক অঙ্গ আছে যেগুলোর কাজ বা উপযোগিতার ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো জ্ঞান আমাদের নেই। নিম্নতর শ্রেণীর পরজীবী প্রজাতির প্রাণীদের ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাণীরা আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট হয় এবং শুধু তাদের শরীরেই থাকে যথাযথ সম্ভরণ-পা, শুঙ্গ ও বিভিন্ন অঙ্গভূতি-ইঙ্গিয়। স্ত্রী-প্রাণীদের এইসব অঙ্গ থাকে না বলে তাদের শরীরটা প্রায়শই শ্বেত একটা বিকৃত পিণ্ডের চেহারা নেয়। কিন্তু এদের উভয় লিঙ্গের প্রাণীদের মধ্যে এই অস্বাভাবিক পার্থক্যের কারণটা নিঃসন্দেহে তাদের জীবন-যাপনের অভ্যাস-আচরণের ব্যাপক পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত থাকে, ফলে আমাদের আলোচনার পক্ষে বিষয়টার তেমন কোনও তাৎপর্য থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন বর্গের বিভিন্ন কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের সামনের গুঁড়টিতে প্যাচালো

স্বতন্ত্র মতো বিচিত্র কিছু অংশ থাকে। অনেকের মতে এগুলো তাদের ভ্রাণেন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করে। স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে এই প্যাচালো স্বতন্ত্র মতো অংশগুলো সংখ্যায় অনেক বেশি থাকে। পুরুষ-প্রাণীদের ভ্রাণেন্দ্রিয়ের কোনও অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটে না অথচ আগে অথবা পরে স্ত্রী-প্রাণীদের খুঁজে বার করতে তারা ঠিকই সমর্থ হয়। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে ভ্রাণের সঙ্গে যুক্ত ওই প্যাচালো অংশগুলো স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের শরীরে বেশি সংখ্যায় থাকার পেছনে যৌন নির্বাচনই সক্রিয় থেকেছে, যৌন নির্বাচন মারফতই এগুলো বেশি সংখ্যায় অর্জন করেছে তারা এবং যে-সব পুরুষ-প্রাণীদের শরীরে এগুলো উৎকৃষ্টতর অবস্থায় থেকেছে তারা সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে অন্তর্যের থেকে বেশি সফল হয়েছে এবং বেশি সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতেও সক্ষম হয়েছে। টানাটানা-দের আলাদা আলাদা স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণী বিশিষ্ট একটি বিচিত্র প্রজাতির কথা উল্লেখ করেছেন ফিংজ্ মুলার। এদের মধ্যে দু'ধরনের পুরুষ থাকে এবং এই দু'ধরনের পুরুষরা কখনোই তাদের বিপরীত ধরনের পুরুষদের বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে পারে না। প্রথম ধরনের পুরুষ-প্রাণীদের শরীরে ভ্রাণ সংক্রান্ত ওই প্যাচালো অংশগুলো অনেক বেশি সংখ্যায় থাকে, আর দ্বিতীয় ধরনের পুরুষদের শরীরে থাকে বেশি শক্তিশালী ও বেশি লম্বা দাঁড়া যার সাহায্যে তারা স্ত্রী-প্রাণীদেরকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হয়। একই প্রজাতির দু'ধরনের পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যেকার এই পার্থক্যের উৎস খুঁজতে গিয়ে ফিংজ্ মুলার বলেছেন যে হয়তো একসময় এদের কিছু কিছু পুরুষ-প্রাণীর মধ্যে ওই ভ্রাণ-সংক্রান্ত প্যাচালো অংশগুলোর সংখ্যায় পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল আর অন্য কিছু পুরুষ-প্রাণীর পরিবর্তনটা দেখা দিয়েছিল দাঁড়ার আকৃতি ও মাপের ক্ষেত্রে; প্রথমোক্তদের মধ্যে যারা স্ত্রী-প্রাণীদের খুঁজে বার করতে সবথেকে বেশি সক্ষম হয়েছিল এবং শেষোক্তদের মধ্যে যারা স্ত্রী-প্রাণীদেরকে সবথেকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হয়েছিল, তারাই তাদের নিজ নিজ স্ববিধার উত্তরাধিকারী হিসেবে সবথেকে বেশি সংখ্যক বংশধর রেখে যেতে পেরেছিল।^২

নিম্নশ্রেণীর কিছু কিছু কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের পুরুষদের সামনের ডানদিকের শুক্রটীর আকৃতি বাঁদিকের শুক্রটীর থেকে অনেকটাই অন্তরকম হয়। এদের এই সামনের বাঁদিকের শুক্রের গ্রন্থিগুলো ক্রমশ সরু হয়ে যায়

২। “ফ্যাক্টস অ্যান্ড আগ্রুমেণ্টস ফর ডারউইন,” ইংরেজি অনুবাদ, পৃঃ ২০। গ্রাণ-সংক্রান্ত প্যাচালো অংশ বিষয়ে পূর্ববর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য। পন্টোনোরিয়া অ্যাফিনিস (Pontonoreia affinis) নামক নরওয়ের এক ধরনের কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের ব্যাপারে অনেকটা এই ধরনের একটা ঘটনার কথা সার্স (Sars) উল্লেখ করেছেন (“নেচার”, ১৮৭০, পৃঃ ৪৫৫-তে উদ্ধৃত)।

এবং এই ব্যাপারে স্ত্রী-প্রাণীদের স্তনের সঙ্গে এদের এই শুষ্কগুলোর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকে। পুরুষ-প্রাণীদের পরিবর্তিত শুষ্কগুলো হয় মধ্যভাগে ক্ষীত হয় কিংবা কোণিকভাবে বাঁকা হয় অথবা খুব সুন্দর এবং কখনও-কখনও আশ্চর্যকর জটিল একটা আঁকড়ে-ধরার অঙ্গে পরিণত হয় (৪নং ছবি)।



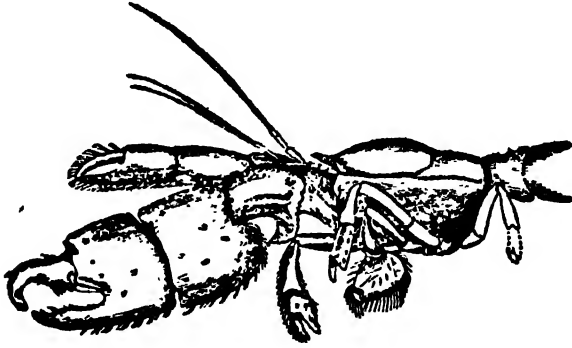
৪নং ছবি—ল্যাবিডোসেরা ডারউইনি (লুবক-এর গ্রন্থ থেকে)।

- পুরুষ-প্রাণীর সামনের ডানদিকের স্তনের অংশবিশেষ যা একটা আঁকড়ে ধরার অঙ্গের রূপ নেয়।
- পুরুষ-প্রাণীর বকের কাছ থেকে উৎসৃত পায়ের পিছনের জোড়া।
- ঐ, স্ত্রী-প্রাণীর।

স্বর জে. লুবক আমাকে জানিয়েছেন যে স্ত্রী-প্রাণীদেরকে আঁকড়ে ধরার জন্য এই অঙ্গটাকে কাজে লাগায় তারা এবং ঠিক এই প্রয়োজনের জন্যই তাদের শরীরের ওই দিকের ছোট পিছনের পায়ের মধ্যে একটা পা (b) সাঁড়াশির মতো রূপ নেয়। এদের আর-একটা বর্গের শুধুমাত্র পুরুষ-প্রাণীদের শরীরেই নীচের বা পিছনের শুষ্কগুলো “অদ্ভুতরকম সর্পিল ধরনের” হয়ে থাকে।

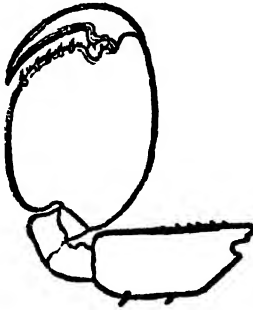
উচ্চশ্রেণীর কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের সামনের পা-গুলো দাঁড়ায় রূপান্তরিত হয় এবং স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের এই দাঁড়াগুলো আকারে বড় হয়। মি: সি. স্পেন্স বেট জানিয়েছেন—স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের দাঁড়াগুলো এতই বড় হয় যে মাহুষের খাতি হিসেবে ব্যবহৃত পুরুষ-কাঁকড়াদের (*Cancer pagurus*) বাজারদর স্ত্রী-কাঁকড়াদের চেয়ে পাঁচগুণ

বেশি হয়ে থাকে। এদের অনেক প্রজাতির মধ্যে শরীরের দুইদিকের দাঁড়াগুলো সমান মাপের হয় না। মিঃ বেট আমাকে জানিয়েছেন যে সবক্ষেত্রে না হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডানদিকের দাঁড়াগুলোই বেশি বড় মাপের হয়ে থাকে। দাঁড়ার মাপের এই অসমতাটাও স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে অনেক বেশি হতে দেখা যায়। আবার পুরুষ-প্রাণীদের দুটো দাঁড়ার মধ্যেও আকারের তারতম্য থাকে (৫, ৬, ৭নং ছবি) এবং ছোট দাঁড়াটির



৫নং ছবি—ক্যালিফোর্নিয়া-র শরীরের সামনের অংশ (মিলনে-এডওয়ার্ড'স-এর গ্রন্থ থেকে)।
পুরুষ-প্রাণীর ডানদিকের ও বাঁদিকের দাঁড়ার অসমতা ও পৃথক গঠনকঠামোটা দেখানো হয়েছে এখানে।*

[*সংশোধনী : চিত্রশিল্পী এখানে ছবিটাকে ভুলবশত উলটো করে এঁকেছেন এবং বাঁদিকের দাঁড়াটাকে বড় করে দোঁষিয়েছেন।]



৬নং ছবি—অকে'সিটিয়া টিউকারেটিংগা-দের পুরুষ-প্রাণীর পিঁতল পা (ফ্রিংজ্ মূলার-এর গ্রন্থ থেকে)।

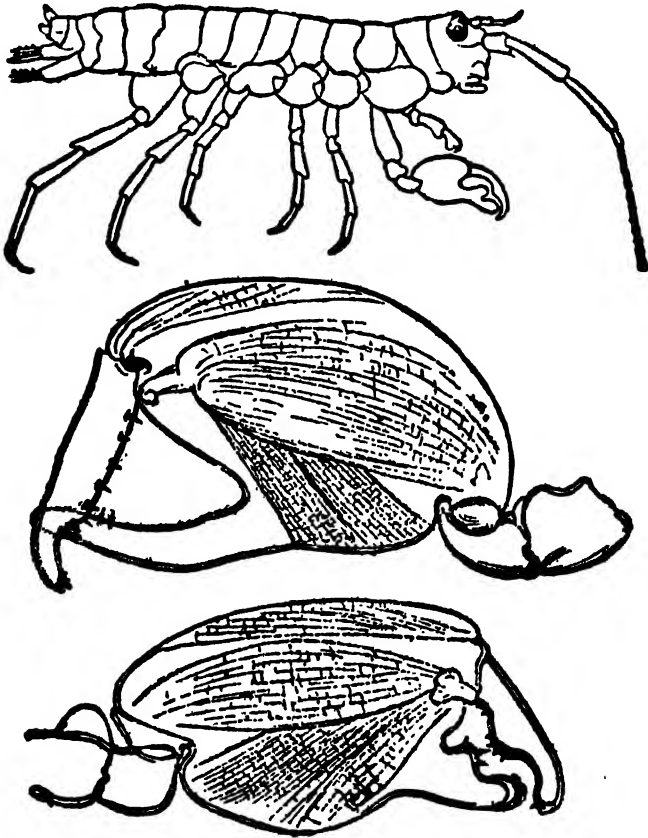
৭নং ছবি—এ, স্ত্রী-প্রাণীর।

সঙ্গে স্ত্রী-প্রাণীদের দাঁড়ার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে দাঁড়ার মাপে বেশি তারতম্য থাকার দরুন তাদের কী জীবিকা হয় এবং যে-সব ক্ষেত্রে দাঁড়ার মাপে কোনও তারতম্য থাকে না

সেইসব ক্ষেত্রেও কেন স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের দাঁড়াগুলো আকারে বড় হয়, তার উত্তর আমাদের জানা নেই। মিঃ বেট আমাকে জানিয়েছেন— এদের এই দাঁড়াগুলো অনেক সময় এমন দৈর্ঘ্যের ও এমন মাপের হয় যে তা দিয়ে মুখের কাছে খাণ্ডবস্ত্র তুলে আনার কাজটা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। মিষ্টি জলে বসবাসকারী কয়েক ধরনের চিংড়ি মাছের (Palaemon) পুরুষ-প্রাণীদের ডান পা-টা তাদের গোটা শরীরটার থেকেই আকারে দীর্ঘতর হয়। দাঁড়া সমেত একটা পা আকারে খুব বড় হলে সেটা হয়তো পুরুষ-প্রাণীদেরকে প্রতিষেধীদের সঙ্গে লড়াইয়ের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীদের ক্ষেত্রে শরীরের হৃদিকের দাঁড়াগুলোর মাপ কেন অসম হয় তার কারণটাকে এই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। মিলনে-এডওয়ার্ডস কতৃক উদ্ভূত একটি বিবৃতি থেকে জানা যায় যে গেলাসিমা-দের স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীরা একই গর্তে বসবাস করে, অর্থাৎ তারা জোড় বাঁধে। গর্তের মুখটাকে পুরুষ-গেলাসিমা-রা তাদের একটা বিশাল মাপের দাঁড়া দিয়ে বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দাঁড়াটা অপ্ৰত্যক্ষভাবে হলেও তাদের আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে কাজ করে। তবে খুব সম্ভবত দাঁড়ার মূল কাজ হল স্ত্রী-প্রাণীদের আয়ত্তে আনা ও আঁকড়ে ধরা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর প্রমাণও পাওয়া গেছে, যেমন গ্যামারাস-দের ক্ষেত্রে। সম্মাসী-কাঁকড়া বা সৈনিক-কাঁকড়াদের (Pagurus) মধ্যে একটা বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ করা যায়। এদের স্ত্রী-প্রাণীরা যে খোলাটার মধ্যে বাস করে সেই খোলাটাকে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বহন করে চলে পুরুষ-প্রাণীরা। তবে মিঃ বেটস আমাকে জানিয়েছেন যে বেলাভুমির সাধারণ কাঁকড়াদের (Carcinus moenas) যৌনমিলনটা অল্পভাবে ঘটে। এই মিলনটা ঘটে এদের স্ত্রী-প্রাণীরা তাদের শক্ত খোলাটা পরিত্যাগ করার ঠিক পরেই। সেই সময় এদের স্ত্রী-প্রাণীদের শরীরটা এত নরম থাকে যে পুরুষদের শক্তিশালী দাঁড়ার চাপে তারা রীতিমতো আহত হতে পারে। বাস্তবে কিন্তু তা হয় না, কারণ এরা নিজেদের খোলাটা পরিত্যাগ করার আগে পুরুষরা এদেরকে আয়ত্তে আনে ও বহন করে নিয়ে যায়, এবং তার ফলেই স্ত্রী-প্রাণীদেরকে কোনওরকম আঘাত না দিয়েই আঁকড়ে ধরতে পারে তারা।

ফিংজ্ মুলার বলেছেন যে অল্প যাবতীয় উভচর প্রাণীদের থেকে মেলিটা-দের (Melita) কয়েকটি প্রজাতির প্রাণীদের একটা বিশেষ পার্থক্য থাকে। এদের স্ত্রী-প্রাণীদের “শেষ জোড়ার ঠিক আগের জোড়া পায়ের নীচের দিকের পাতলা স্তরটা (Coxal lamellae) অনেকটা বঁড়শির মতো হয়ে বেরিয়ে থাকে এবং পুরুষ-প্রাণীরা তাদের প্রথম পা-জোড়া দিয়ে ওই জায়গাটাকে আঁকড়ে ধরে।” এই বঁড়শির মতো ব্যাপারটা খুব সম্ভবত

সেইসব স্ত্রী-প্রাণীদের থেকেই প্রথম গড়ে উঠেছিল যাদেরকে জননপ্রক্রিয়ার সময় সবথেকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে পেরেছিল পুরুষ-প্রাণীরা এবং তার ফলে ওইসব স্ত্রী-প্রাণীরাই সর্বাধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল। আরেক ধরনের ব্রাজিলিয় উভচর প্রাণীদের (*Orchestia Darwinii*, ৮নং ছবি) মধ্যেও ঠিক টানাই-দের মতোই এক ধরনের বিরূপতা লক্ষ্য করা



৮নং ছবি—অর্কেসটিয়া ডারউইনি (ফ্রিৎজ, মূলার-এর গ্রন্থ থেকে)।

এখানে এদের দু' ধরনের পুরুষদের দাঁড়ার গঠনকাঠামোর পার্থক্যটা দেখানো হয়েছে।

যায়। এদের পুরুষরা দু' ধরনের হয়, একজনদের সঙ্গে অপরজনদের পার্থক্যটা থাকে দাঁড়ার গঠনে। দু'জনদের দাঁড়াই স্ত্রী-প্রাণীদের আঁকড়ে ধরতে সক্ষম (কারণ এই দু' ধরনের দাঁড়াই এখন এই কাজটার জন্য ব্যবহৃত হয়), তবে খুব সম্ভবত কিছু কিছু পুরুষ-প্রাণীর পরিবর্তনটা যেভাবে ঘটেছিল অন্যদের পরিবর্তনটা ঠিক সেভাবে ঘটেনি, আর তার ফলেই পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে এই দু'টি পৃথক রূপ সৃষ্টি হয়েছিল। এই দু' ধরনের পুরুষ-প্রাণীরা তাদের আলাদা

ধরনের দাঁড়ার দরুন কিছু কিছু বিশেষ স্থিতি অর্জন করেছিল—তবে গুরুত্বের বিচারে এই স্থিতিগুলো প্রায় একই ধরনের ছিল।

কঠিন খোলাযুক্ত পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের দখল করার জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই করে কিনা তা আমাদের জানা নেই, তবে খুব সম্ভবত এ ধরনের লড়াই তাদের মধ্যে ঘটে থাকে। কারণ যে-সব প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে পুরুষ-প্রাণীরা আকারে বড় হয়, সেইসব ক্ষেত্রে এই বড় আকারটা অধিকাংশ সময়েই তারা লাভ করে তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে, অর্থাৎ বহু প্রজন্ম ধরে তাদের পূর্বপুরুষরা অন্য পুরুষ-প্রাণীদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থাকার ফল হিসেবেই এই বড় আকারটা ধীরে ধীরে অর্জন করেছে তারা। বেশিরভাগ বর্গের মধ্যেই, বিশেষত সর্বোচ্চ বর্গ বা ব্র্যাকিউরা-দের (*Brachyura*) মধ্যে পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে আকারে বড় হয়। তবে পরজীবী বর্গের প্রাণীরা, যাদের স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের অভ্যাস-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়, তাদের ক্ষেত্রে এবং অধিকাংশ এনটোমসট্রাকা-দের (*Entomostraca* — কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের একটি শ্রেণী) ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের অনেকের ক্ষেত্রেই দাঁড়াগুলো শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অস্ত্র হিসেবে বেশ ভালোভাবেই অভিযোজিত হয়ে উঠেছে। মি: বেট-এর এক পুত্র একবার একটি ডেভিল-ক্র্যাব বা শয়তান-কাঁকড়াকে (*Portunus puber*) একটি কারসিনাস মিনাস-এর (*Carcinus moenas*) সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে দেখেছিল। লড়াই শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষোক্ত কাঁকড়াটি পরাজিত হয়ে উন্টে পড়ে এবং তার প্রতিটি অঙ্গ শরীর থেকে ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যায়। ফ্রিঞ্জ মুলার একবার ব্র্যাকিলিয় গেলসিমা স প্রজাতির (যাদের শরীরে বিশাল বিশাল দাঁড়া থাকে) কয়েকটি পুরুষ-প্রাণীকে একটা কাচের পাত্রে রেখে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাতে দেখা গিয়েছিল ওই পুরুষ-প্রাণীরা পরস্পরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ছিঁড়তে শুরু করছে এবং একে অপরকে হত্যা করছে। মি: বেট একবার কারসিনাস মিনাস প্রজাতির একটি বড় আকারের পুরুষ-প্রাণীকে একটা জলভরা পাত্রের মধ্যে রেখে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ওই পাত্রটিতে আগে থেকেই ওই প্রজাতির একটি স্ত্রী-প্রাণী এবং তার সঙ্গী হিসেবে একটি ছোট আকারের পুরুষ-প্রাণী ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট মাপের পুরুষটি হঠাৎ যায় এবং বড় মাপের পুরুষটি স্ত্রী-প্রাণীটিকে দখল করে নেয়। মি: বেট বলেছেন, “তাদের মধ্যে যদি কোনও লড়াই হয়ে থাকে তাহলে সে লড়াইটা ছিল একেবারেই রক্তপাতহীন, কারণ তাদের কারুর গায়েই কোনও আঘাতের চিহ্ন চোখে পড়েনি আমার।” এই প্রাণিবিজ্ঞানীটিই একবার গ্যামারাস ম্যারিনাস (*Gammarus marinus* — আমাদের সমুদ্রোপকূলে যাদেরকে প্রচুর পরিমাণে

দেখা যায়) প্রজাতির একটি পুরুষ আর একটি স্ত্রী-প্রাণীর ওপরে একটা পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এই প্রজাতিরই বেশ কিছু প্রাণীর সঙ্গে ওই দুটি পুরুষ আর স্ত্রী-প্রাণীও প্রথমে একই পাত্রে ছিল এবং তারা ছিল পরস্পরের সঙ্গী। মিঃ বেট পুরুষ-প্রাণীটিকে ওই পাত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে এদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। বিচ্ছিন্ন হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্ত্রী-প্রাণীটি ওই পাত্রের অন্য প্রাণীদের সঙ্গে যোগ দেয়। কিছুক্ষণ পরে মিঃ বেট পুরুষ-প্রাণীটিকে আবার ওই পাত্রে ছেড়ে দেন। প্রথমটায় পুরুষ-প্রাণীটি ইতস্তত কিছুটা সাঁতার কাটে, তারপর সাঁ করে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং কোনওরকম লড়াই-টড়াই ছাড়াই নিজের স্ত্রীকে নিয়ে অন্যদিকে সরে যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রাণিজগতের নিম্ন স্তরে থাকা অ্যান্টিপডা-দের মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীরা একে অপরকে চিনতে পারে এবং তারা পরস্পরের প্রতি আসক্ত ও হয়।

কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের মানসিক ক্ষমতা যতটা থাকা সম্ভব বলে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, বাস্তবে তাদের মানসিক ক্ষমতা সম্ভবত তার চেয়ে বেশিই থাকে। গ্রোম্মগুস্টীয় উপকূল অঞ্চলে যে-সব কঁাকড়াদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়, তাদেরকে ধরার চেষ্টা করলে যে-কেউই বুঝতে পারবেন কতখানি সতর্ক আব হুঁশিয়ার থাকে তারা। প্রবালদ্বীপে এক ধরনের বড় মাপের কঁাকড়া (*Birgus latro*) পাওয়া যায় যারা একটা গভীর গর্তের নীচে নারকেল গাছের কৈমো দিয়ে পুরু একটা গদি তৈরি করে। গাছ থেকে থলে পড়া নারকেলের খোলার ছোবড়াগুলোকে একটু একটু করে ছিঁড়ে ফেলে ভেতরের শাঁসটা খাওয়া হিসেবে গ্রহণ করে এরা! এই ছেঁড়ার কাজটা এরা শুরু করে নারকেলের নীচের দিকে চোখের মতো দেখতে যে তিনটে গর্ত থাকে সেইখান থেকে। তারপর ওই গর্তগুলোর একটায় সামনের ভারী দাঁড়া দিয়ে ঠুকে ঠুকে সেখানটাকে ভেঙে ফেলে, ভেঙে ফেলে উল্টোদিকে ঘুরে গিয়ে পেছনের সরু দাঁড়াগুলো দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভেতরের শাঁসটা বার করে নেয়। তবে খুব সম্ভবত এই ধরনের কাজগুলো করার ক্ষমতাটা সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবেই অর্জন করে থাকে এরা আর তার ফলে অল্পবয়সী প্রাণীরা ও বেশি বয়সী প্রাণীরা একইরকম দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে এই কাজগুলো। তবে নিম্নলিখিত ঘটনাটা অবশ্য এই বক্তব্যের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়। মিঃ গার্ডনার নামক জনৈক নির্ভরযোগ্য প্রাণিবিজ্ঞানী একবার উপকূল অঞ্চলের একটি কঁাকড়াকে (*Gelasimus*) পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। কঁাকড়াটা তখন নিজের বসবাসের গর্তটা তৈরি করছিল। সেই গর্তটার দিকে মিঃ গার্ডনার কয়েকটা শামুকের খোলা ছুড়ে দেন। একটা খোলা গড়িয়ে গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ে, বাকি তিনটি গর্তের মুখের কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়ে যায়। মিনিট পাঁচেকের

মধ্যেই গর্তের মধ্যে পড়া খোলাটাকে কঁকড়াটা টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসে এবং প্রায় এক ফুট দূরে রেখে আসে সেটাকে। এইসময় গর্তের কাছে পড়ে থাকে বাকি খোলা তিনটিকে দেখতে পায় সে, দেখার পর বোধহয় ভেবে নেয় যে ওগুলোও গর্তের মধ্যে গড়িয়ে পড়তে পারে, অতঃপর এই তিনটি খোলাকেও টেনে নিয়ে গিয়ে প্রথম খোলাটার কাছে রেখে আসে সে। মাহুষ যেভাবে যুক্তির সাহায্যে কোনও কাজ করে, তার সঙ্গে একটা কঁকড়ার দ্বারা সম্পাদিত এই কাজটার পার্থক্য নির্ণয় করা সত্যিই দুর্লভ।

উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণীদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে গাত্রবর্ণের পার্থক্যটা প্রায়শই লক্ষ করা যায়। কিন্তু আমাদের ইংল্যান্ডের কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে গাত্রবর্ণের ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট পার্থক্য মিঃ বেট-এর নজরে পড়েনি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের গায়ের ছোপে বা আভায় সামান্য পার্থক্য দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু মিঃ বেট-এর মতে জীবনযাপনের আচরণগত কিছু পার্থক্যের দৃকনই সেটা ঘটে থাকে—যেমন পুরুষ-প্রাণীদের বেশি বোরাঘুরি করতে হয় বলে তাদের চামড়ায় রোদ বা আলোর প্রভাবটাও একটু বেশিই পড়ে। মরিশাসে বসবাসকারী বেশ কিছু প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষের প্রাণীদের মধ্যকার পার্থক্যটাকে গায়ের রঙ দিয়ে নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছিলেন ডঃ পাওয়ার, কিন্তু শুধুমাত্র একটা প্রজাতির ক্ষেত্রে ছাড়া বাকি কোনও প্রজাতির ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পুরুষের গায়ের রঙে কোনও পার্থক্য খুঁজে পাননি তিনি। এই প্রজাতিটি ছিল স্কুইলা-দের একটি প্রজাতি, খুব সম্ভবত এস. স্টাইলিফেরা (S. Stylifera), যাদের পুরুষ-প্রাণীরা “চমৎকার নীলচে-সবুজ রঙের” হয় এবং কয়েকটি উপাঙ্গ চেঁরির মতো লাল রঙের হয়, অতীতকালে স্ত্রী-প্রাণীদের গায়ের রঙ হয় বাদামি ও ধূসর বর্ণের, “আর তাদের বিভিন্ন উপাঙ্গের লাল রঙটা পুরুষ-প্রাণীদের চেয়ে কিছুটা ফিকে হয়ে থাকে।” এক্ষেত্রে গাত্রবর্ণের এই পার্থক্যটা যৌন নির্বাচনের ফলেই ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। একটা ত্রিপার্শ্ব কাচের (prism) সাহায্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা একটা পাত্রে মধ্য কিছু ড্যাফনিয়া-কে (Daphnia) রেখে মিঃ বাট যে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন, তা থেকে বোঝা গিয়েছিল যে একেবারে নিয়তম শ্রেণীর কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীরাও বিভিন্ন রঙের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম। স্যাফাইরিনা-দের (এনট্রোমস্ট্রাকা [Entomostraca] বর্গের একটি সামুদ্রিক প্রজাতি) ক্ষেত্রে পুরুষদের অতি ক্ষুদ্র কিছু আবরণী বা কোষতুল্য অংশ থাকে যা থেকে চমৎকার রঙ ঠিকরে পড়ে এবং প্রায়ই এই রঙগুলোর পরিবর্তনও ঘটে। স্ত্রী-প্রাণীদের শরীরে এ-রকম কোনও আবরণী বা কোষতুল্য অংশ থাকে না এবং এই বর্গের একটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের শরীরেই এ-রকম আবরণী বা কোষতুল্য অংশ অল্পপস্থিত থাকে। তবে

এ থেকে এমন সিদ্ধান্ত করে বসাটা নিতাস্তই হঠকারিতা হবে যে পুরুষ-প্রাণীদের শরীরের এই বিচিত্র উপাদানগুলো স্ত্রী-প্রাণীদেরকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করতে সাহায্য করে। ফ্রিংজ্ মূলার আমাদের জানিয়েছেন যে গেলাসিমাস-দের একটি ব্রাজিলিয় প্রজাতির স্ত্রী-প্রাণীদের গোটা শরীরটাই ধূসর-বাদামি রঙের হয়। এদের পুরুষ-প্রাণীদের মাথা-বুকের পিছনদিকটা হয় একেবারে সাদা রঙের আর সামনের দিকটা গাঢ় সবুজ এবং তাতে গাঢ় বাদামি রঙের আভা থাকে। এই রঙগুলো কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর পালটে যায়—সাদাটা হয়ে ওঠে ফ্যাকাশে-ধূসর, এমনকি কখনও কখনও কালোও, আর সবুজ রঙের “উজ্জলতা” অনেকখানিই কমে যায়।” এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার বিশেষ লক্ষণীয়—পরিণত হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত পুরুষ-প্রাণীরা তাদের গায়ের ওই উজ্জল রঙটা অর্জন করতে পারে না। স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে সংখ্যায় পুরুষ-প্রাণী অনেক বেশি থাকে এবং স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে তাদের পাড়া ও আকারে বড় হয়। এই বর্গের কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে, কিংবা সম্ভবত সব প্রজাতির মধ্যেই, স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীরা জোড় বাঁধে এবং একই গর্তে বসবাস করে। তাছাড়া আমরা আগেই দেখেছি যে এরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। এই সমস্ত তথ্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে হয় যে স্ত্রী-প্রাণীদের আকৃষ্ট করা বা উত্তেজিত করার জ্ঞানই হয়তো এই প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীরা তাদের শরীরের উজ্জল চাকচিক্যগুলো অর্জন করেছিল।

আমরা এইমাত্রই বলেছি যে পরিণত এবং প্রায় প্রজননক্ষম হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত পুরুষ-গেলাসিমাস-রা তাদের গায়ের উজ্জল রঙটা অর্জন করতে পারে না। এদের সমগ্র শ্রেণীটার মধ্যেই স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের গঠনকাঠামোর বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটাকে একটা সাধারণ নিয়ম হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। পরে আমরা দেখব যে মেক্সিকান প্রাণীদের বিশাল উপ-বিভাগটির সর্বক্ষেত্রেও এই একই সাধারণ নিয়ম ক্রিয়ালীল থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই নিয়মটা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেইসব বৈশিষ্ট্যগুলোর ক্ষেত্রেই যে বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জিত হয় যৌন নির্বাচন মারফত। এই নিয়মের কয়েকটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করেছেন ফ্রিংজ্ মূলার। যেমন, পুরুষ বেল-ফড়িংরা (Orchestia) প্রায় পুরোপুরি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত তাদের বড় বড় রমণিকাগুলো (Claspers) অর্জন করতে পারে না এবং এদের এই রমণিকাগুলোর গঠনকাঠামো স্ত্রী-প্রাণীদের রমণিকার চেয়ে অনেকটাই অল্পরকম হয়। অল্পবয়সী পুরুষ-প্রাণীদের রমণিকাগুলো কিন্তু ঠিক স্ত্রী-প্রাণীদের রমণিকার মতোই হয়ে থাকে।

উর্গনাস্ত (Arachnida) শ্রেণী (মাকড়সা জাতীয়)। এই শ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে সাধারণত গাভবর্ণের তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না,

তবে স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে পুরুষ-প্রাণীদের গায়ের রঙ প্রায়শই একটু বেশি গাঢ় হয়ে থাকে (মি: স্পারাস-এর চমৎকার রচনাটিতে যার নজির পাওয়া যায়)। তবে এদের কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে অবশ্য স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের গাত্রবর্ণের মধ্যে বেশ সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকতে দেখা যায়। যেমন, স্পারাসাস স্মারাগডুলাস (*Sparassus smaragdulus*) প্রজাতির স্ত্রী-প্রাণীদের গায়ের রঙ ফিকে সবুজ হয়, অন্যদিকে এদের পুরুষ-প্রাণীদের পেটের কাছটা হালকা হলুদ রঙের হয় এবং তার ওপরে গাঢ় লাল রঙের তিনটি লম্বালম্বি ডোরা থাকে। থোমিসাস-দের (*Thomomys*) কয়েকটি প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের গায়ের রঙ প্রায় একইরকম হয়, আবার অন্য কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের গায়ের রঙে বিপুল পার্থক্য থাকে। অন্য আরও অনেক বর্ণের প্রাণীদের মধ্যেও এই একই ঘটনা লক্ষ করা যায়। কোনও-একটি প্রজাতি যে-বর্ণের অন্তর্গত, সেই বর্ণের সাধারণ গাত্রবর্ণ থেকে ওই বিশেষ প্রজাতিটির কোন লিঙ্গের প্রাণীদের গাত্রবর্ণের পার্থক্যটা বেশি, স্ত্রী-প্রাণীদের না পুরুষ-প্রাণীদের, তা নিশ্চিতভাবে বলা প্রায়শই খুব দুর্বল হয়ে ওঠে। তবে মি: স্পারাস-এর মতে এই পার্থক্যটা সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রেই বেশি মাত্রায় দেখা যায়। কানেস্‌জিনি বলেছেন যে কয়েকটি বর্ণের পুরুষ-প্রাণীদের খুব সহজেই চিনে নেওয়া যায়, কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীদের চিনতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। মি: স্পারাস আমাকে জানিয়েছেন যে অল্পবয়সে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের দেখতে অনেকটা একইরকম হয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত প্রতিটি নির্মোচনের সময় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই গাত্রবর্ণের প্রচুর পরিবর্তন ঘটে। আবার অন্যান্য অনেক প্রজাতির মধ্যে গাত্রবর্ণের পরিবর্তনটা শুধুমাত্র পুরুষ-প্রাণীদের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। উপরোক্ত উজ্জল রঙবিশিষ্ট পুরুষ-স্পারাসাসদের দেখতে অল্পবয়সে ঠিক স্ত্রী-প্রাণীদের মতোই হয় এবং পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠার কাছাকাছি সময় নাগাদ তারা তাদের বিচিত্র গাত্রবর্ণটা অর্জন করে থাকে। মাকড়সাদের অল্পভূতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয় এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তাও থাকে তাদের। যেমন সকলেরই জানা আছে যে নিজেদের ডিমগুলোর প্রতি স্ত্রী-মাকড়সাদের গভীর ভালবাসা থাকে। খুব নরম একটা জালের মধ্যে রেখে এই ডিমগুলোকে বহন করে তারা। পুরুষ-মাকড়সারা অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে খুঁজে বেড়ায় স্ত্রী-মাকড়সাদের। কানেস্‌জিনি ও অন্য আরও অনেকে দেখেছেন স্ত্রী-মাকড়সাদের দখল করার জন্ত নিজেদের মধ্যে সংগ্রামেও লিপ্ত হয় পুরুষ-মাকড়সারা। এই শ্রেণীর প্রায় কুড়িটি প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মিলন প্রত্যক্ষ করেছেন কানেস্‌জিনি। তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে প্রণয় নিবেদনকারী কিছু কিছু পুরুষ-প্রাণীকে প্রত্যাখ্যান করে স্ত্রী-প্রাণীরা, ই। করে তাদেরকে ভয় দেখায়, তারপর দীর্ঘ দ্বিধাষ্পন্দের শেষে

নিজের পছন্দসই পুরুষটিকে গ্রহণ করে। এইসব তথ্যকে বিচার-বিশ্লেষণ করে আমরা বোধহয় এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এদের কয়েকটি প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের গাত্রবর্ণের স্পষ্ট পার্থক্যটা দেখা দিয়েছে যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবেই। তবে এ ব্যাপারে যেটা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়, অর্থাৎ স্ত্রী-প্রাণীদের সামনে পুরুষ-প্রাণীদের চাকচিক্য প্রদর্শন, সেটা কিন্তু এক্ষেত্রে অল্পপস্থিত। কয়েকটি প্রজাতির, যেমন থেরিডিয়ন লিনিটাম (Theridion lineatum) প্রজাতির, পুরুষ-প্রাণীদের গাত্রবর্ণের অত্যধিক পরিবর্তনশীলতার ব্যাপারটা থেকে মনে হয় যে এইসব প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীদের যৌন বৈশিষ্ট্যগুলো এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি স্থায়ী চরিত্রের হয়ে উঠতে পারেনি। অন্য কিছু দৃষ্টান্ত থেকে এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন কানেস্ট্রিনিও। তিনি দেখেছিলেন কিছু কিছু প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে দুটি রূপ থাকে এবং এই দুটি রূপের প্রাণীদের আকার ও চোয়ালের দৈর্ঘ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে। এই তথ্যটা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় পূর্বোল্লিখিত স্ক্রিপসিফিট কঠিন থোলাযুক্ত প্রাণীদের কথা।

এদের পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের থেকে আকারে সাধারণত অনেকটা ছোটই হয়, কখনও-কখনও অস্বাভাবিকরকম ছোট হতেও দেখা যায়,^৩ এবং স্ত্রী-প্রাণীদের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তাদেরকে অত্যন্ত সতর্কও থাকতে হয়, কারণ স্ত্রী-প্রাণীদের লাজুকতাটা প্রায়শই অত্যন্ত বিপজ্জনক ধরনের হয়ে থাকে। ড গ্রিয়ার (De Greer) একবার এদের একটি পুরুষ-প্রাণীকে দেখেছিলেন যেটি “প্রাথমিক আদর জাতীয় কাজে ব্যস্ত থাকার সময়েই তার প্রণয়িনীর বন্দীতে পরিণত হয়, স্ত্রী-প্রাণীটি তাকে একটা জালে আটকে ফেলে এবং তারপর খেয়ে ফেলে। দৃশ্টাংগ দেখে আতঙ্কে আর ঘৃণায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি আমি।” নেফিলা (Nephila) বর্ণের পুরুষ-প্রাণীদের আকার অত্যন্ত ছোট হওয়ার ব্যাপারটাকে রেভারেণ্ড ও. পি. কেব্লিঞ্জ বর্ণনা করেছেন এইভাবে, “আকারে ক্ষুদ্রাকার পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের হিংস্রতার হাত থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করে, তার একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন মঁসিয়ে ভিঁসঁ। স্ত্রী-প্রাণীদের শরীরের আর বিশাল বিশাল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চারপাশ দিয়ে পিছলে-পিছলে বেরিয়ে যায় এরা, লুকোচুরি খেলে। এ ধরনের

৩। এপেইরা নাইগ্রা (Epeira nigra) প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীদের ছোট আকারের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন অগ. ভিঁসঁ (‘Araneides des Iles de la Reunion,’ pl. vi, figs ১ ও ২)। এই প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীরা কঠিন আবরণবস্ত্র হর এবং স্ত্রী-প্রাণীদের গায়ের রঙ কালো হর আর তাদের পারে লাল ডোরা থাকে। দুটি লিঙ্গের প্রাণীদের আকারগত তারতম্যের আরও অনেক চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। (‘কোয়ার্টারলি জানাল অফ সায়েন্স,’ জুলাই ১৮৬৮, পৃঃ ৪২১), তবে এ ব্যাপারে মূল লেখাপত্রগুলো পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

প্রচেষ্টায় আশ্চর্য্যকার সন্তাবনাটা যে ক্ষুদ্রতম পুরুষদেরই বেশি থাকবে এবং বড় আকারের পুরুষরা যে ক্ষুদ্রতই ধরা পড়ে যাবে, তা বুঝে নিতে কোনও অসুবিধে হয় না। এইভাবে ক্রমাগত গড়ে উঠতে থাকে ক্ষুদ্রাকার পুরুষ-প্রাণীদের একটা গোষ্ঠী এবং এই প্রক্রিয়াটা চলতে থাকে ততদিন ধরে যতদিন না তারা তাদের প্রজননক্রিয়ার পক্ষে মানানসই সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম আকারে গিয়ে পৌছোয়। খুব সম্ভবত আজ আমরা এদেরকে সেই ক্ষুদ্রতম আকারেই দেখে থাকি। এই আকারটা এতই ছোট যে জ্বী-প্রাণীদের ওপরে এদেরকে দেখলে কোনও পরজীবী প্রাণী বলেই মনে হয়, এবং হয় এরা জ্বী-প্রাণীদের নজর এড়িয়ে থাকে অথবা এতই চটপটে ও এতই ক্ষুদ্র হয় যে জ্বী-প্রাণীদের পক্ষে এদেরকে ধরা রীতিমতো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।”

ওয়েস্টরিং (Westring) একটি কোতুহলোদ্দীপক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তিনি দেখেছেন থেরিডিয়ন-দের (Theridion) কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীরা এক ধরনের উচ্চনাদবিশিষ্ট কর্কশ শব্দ করতে পারে, কিন্তু এদের জ্বী-প্রাণীরা মূক হয়। পুরুষ-প্রাণীদের শরীরে এই শব্দসৃষ্টিকারী অঙ্গটা হল পেটের নীচের দিকের করাতের মতো খাঁজ-কাটা একটা উঁচু অংশ যার সঙ্গে বৃকের পিছনদিকের শক্ত অংশটার ঘষা লাগে। জ্বী-প্রাণীদের শরীরে এই অঙ্গটার কোনও চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। সুবিখ্যাত উর্গনাভিদি ওয়ালকেনায়ের (Walckenaer) সহ বেশ কিছু লেখক বলেছেন যে মাকড়সা জাতীয় প্রাণীরা সঙ্গীতের দ্বারা আকৃষ্ট হয়।^৪ পরবর্তী পরিচ্ছেদে অর্থোপ্টেরা ও হোমোপ্টেরা-দের মধ্যকার সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করব আমরা। এই সাদৃশ্য থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি—এবং ওয়েস্টরিং-ও তাই-ই মনে করেন—যে ওই উচ্চনাদবিশিষ্ট কর্কশ শব্দটা আসলে জ্বী-প্রাণীদের ডাকা বা উত্তেজিত করার কাজেই ব্যবহৃত হয়। প্রাণিজগতের নিম্নতম স্তর থেকে ক্রমাশ্রিত ওপরদিকে ওঠার পথে একে-একে যত প্রাণীর দেখা পাই আমরা, তাদের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে শব্দ করার এরাই প্রথম নজির, অন্তত আমার জানা প্রথম নজির তো বটেই।^৫

মিরিয়াপডা (Myriapoda) শ্রেণী। এই শ্রেণীটির মধ্যে যে-দুটো বর্গ আছে, অর্থাৎ সহস্রপদ (millipede) ও শতপদ (centipede), তাদের

৪। এই গ্রন্থটির ওলন্দাজ অনূদানে (খণ্ড ৯, পৃঃ ৪৪১) ডঃ এইচ. এইচ. ফান জুটৌভন এরকম বেশ কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।

৫। তবে সম্প্রতি হিল্‌গেনডর্ফ উচ্চতর শ্রেণীর কঠিন খোলাসদৃশ প্রাণীদের মধ্যে এই ধরনের একটি অঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন যা শব্দসৃষ্টির উপযোগী হয়ে উঠেছে বলেই মনে হয়। দ্রষ্টব্য, “জুওলজিক্যাল রেকর্ড,” ১৮৬৯, পৃঃ ৬০০।

কারুর মধ্যেই উল্লেখ করার মতো কোনও সুস্পষ্ট লিঙ্গগত পার্থক্য খুঁজে
 পাইনি আমি। তবে গ্লোমেরিস লিম্বাটা (*Glomeris limbata*) এবং
 সম্ভবত অন্য কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাণীদের গায়ের রঙ স্ত্রী-প্রাণীদের
 থেকে সামান্য আলাদা হয়ে থাকে। তবে এই গ্লোমেরিস হচ্ছে একটি অত্যন্ত
 পরিবর্তনশীল প্রজাতি। ডিপ্লোপডা (*Diplopoda*) বর্গের পুরুষ-প্রাণীদের
 শরীরের সামনের বা পিছনের অংশের পা-গুলো পরিবর্তিত হয়ে ঝাঁকড়ে
 ধরার উপযোগী বঁড়শির চেহারা নিয়েছে যার সাহায্যে তারা স্ত্রী-প্রাণীদের
 ঝাঁকড়ে ধরতে পারে। ইউলাস-দের (*Iulus*) কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-
 প্রাণীদের পায়ের গুল্ফে এক ধরনের বিস্ত্রিময় শোষক-নল থাকে যার সাহায্যে
 তারা স্ত্রী-প্রাণীদের ঝাঁকড়ে ধরতে সক্ষম হয়। কীটপতঙ্গদের নিয়ে আলোচনা
 করার সময় একটা রীতিমতো অস্বাভাবিক ঘটনার কথা জানতে পারব
 আমরা। ঘটনাটা হল—লিথোবিয়াস-দের (*Lithobius*) মধ্যে স্ত্রী-প্রাণীদের
 পায়েই ঝাঁকড়ে ধরার উপযোগী উপাদান থাকে এবং তার সাহায্যে তারাই
 ঝাঁকড়ে ধরে পুরুষ-প্রাণীদের।

দশম পরিচ্ছেদ কীটপতঙ্গদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ

স্ত্রী-প্রাণীদের আয়ত্তে আনার জন্য পুরুষ-প্রাণীদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ—স্ত্রী-পুরুষের মনোকার পার্থক্য, যেগুলোর অর্থ এখনও দুর্বোধ্য—স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের আকারগত পার্থক্য—থাইসেনিউরা (Thysanura)—ডিপ্টেরা (Diptera)—হেমিপ্টেরা (Hemiptera)—হোমোপ্টেরা, এদের কেবলমাত্র পুরুষ-প্রাণীদেরই সাক্ষাৎক ক্ষমতা থাকে—অর্থোপ্টেরা, পুরুষ-প্রাণীদের সাক্ষাৎক অঙ্গ, সেগুলির গঠনকাঠামোর বিভিন্নতা; বৃক্ষপ্রিয়তা, গাছবর্ণ—নিউরোপ্টেরা (Neuroptera), স্ত্রী-পুরুষের গাছবর্ণের পার্থক্য—হাইমেনোপ্টেরা (Hymenoptera), বৃক্ষপ্রিয়তা ও গাছবর্ণ—কোলিওপ্টেরা (Coleoptera), গাছবর্ণ; এদের বড় বড় শৃঙ্গ থাকে, আপাতভাবে যেগুলিকে অঙ্গসম্ভা বলেই মনে হয়; লড়াই; উচ্চনাঙ্গাধীন কক'শ শব্দসৃষ্টির অঙ্গ, যেগুলি সাধারণত স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের শরীরেই দেখা যায়।

কীটপতঙ্গদের জগৎটা রীতিমতো বিশাল। এই বিশাল জগতের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের স্থানান্তর গমনের অঙ্গে কখনও-কখনও কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়, এদের বিভিন্ন ইঞ্জিয়ার মধ্যেও প্রায়শই নানান পার্থক্য থাকে, যেমন এদের অনেক প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীদের মাথায় চমৎকার পালকওয়ালা শুঙ্গ থাকে কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীদের তা থাকে না। ইফেমেরা (Ephemerae) বর্গের মদম্ম ক্লোইঅন-দের (Chlocon) পুরুষ-প্রাণীদের বড় বড় চোখ থাকে, কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীদের আদৌ কোনও চোখ থাকে না। কয়েক ধরনের পতঙ্গদের, যেমন মিউটিলিডে-দের (Mutillidae) স্ত্রী-প্রাণীদের শরীরে আলোকগ্রাহী অঙ্গ (Ocelli) থাকে না এবং তাদের কোনও ডানাও থাকে না। তবে এখানে আমরা মূলত আলোচনা করতে চাইছি সেইসব অঙ্গ নিয়ে যেগুলোর সাহায্যে একটি পুরুষ-প্রাণী অন্য একটি পুরুষ-প্রাণীকে যুদ্ধে কিংবা প্রেমনিবেদনের উৎকর্ষতায় পরাজিত করে, পরাজিত করে তার শক্তি, যুদ্ধপ্রিয়তা, অঙ্গসম্ভা বা সাক্ষাৎক গুণাবলীর সাহায্যে। তাই, যে-সব অসংখ্য উপায়ের সাহায্যে পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের আয়ত্তে আনে, সেগুলোর কথা সংক্ষেপে একটু বলে নিলে ভালো হয়। পুরুষ-প্রাণীদের পেটের ওপর দিকের জটিল অঙ্গের কথা আমরা আগেই বলেছি, যেগুলোকে প্রাথমিক অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত

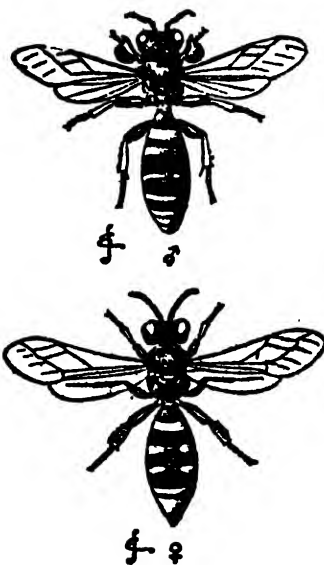
করাটাই বোধহয় যুক্তিসঙ্গত।^১ কিন্তু এগুলো ছাড়াও, মিঃ বি. ডি. ওয়ালশ্ যেমন বলেছেন, “স্ত্রী-প্রাণীদের শক্ত করে ঝাঁকড়ে ধরার মতো একটা আপাত-তুচ্ছ ব্যাপারে পুরুষ-প্রাণীদের সক্ষম করে তোলার জন্য প্রকৃতি যে তাদের কত বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ যুগিয়ে দিয়েছে, তা ভাবলে রীতিমতো আশ্চর্যই হতে হয়।” চোয়ালও অনেক সময় এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, করিডালিস কর্ণাটাগ-দের (নিউরোপ্টেরা বর্গের এক ধরনের পতঙ্গ, অনেকটা গয়াল-পোকা জাতীয়) পুরুষ-প্রাণীদের বিরাট আকারের ঝাঁকানো চোয়াল থাকে যা স্ত্রী-প্রাণীদের চোয়ালের থেকে বহুগুণ বড়। এদের এই চোয়ালে কোনও দাঁত থাকে না বরং মসৃণ হয়, ফলে এর সাহায্যে স্ত্রী-প্রাণীদের কোনও আঘাত না দিয়েই ঝাঁকড়ে ধরতে পারে এরা। উত্তর আমেরিকার এক ধরনের পুরুষ গুবরে-পোকাদের (Lucanus elaphus) চোয়ালও স্ত্রী-পোকাদের চেয়ে অনেক বড় হয় এবং স্ত্রী-প্রাণীদের ঝাঁকড়ে ধরার জন্য এই চোয়াল কাজে লাগায় তারা—তবে খুব সম্ভবত চোয়ালটা তাদের লড়াইয়ের সময়েও একইভাবে কাজে লাগে। এক ধরনের বেল-বোলতাদের (Amphipila) স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের চোয়াল প্রায় একইরকম হলেও সেগুলোর প্রয়োগ হয় সম্পূর্ণ আলাদা উদ্দেশ্যে। অধ্যাপক ওয়েস্টউড বলেছেন, এদের পুরুষ-প্রাণীরা “মিলনের জন্য অতিরিক্তরকম ব্যগ্র হয়ে থাকে, নিজেদের কান্ডের মতো চোয়াল দিয়ে সঙ্গিনীর ঘাড়ের কাছটা ঝাঁকড়ে ধরে তারা।”^২ অন্তর্দিকে,

১। প্রায়-সদৃশ বিভিন্ন প্রজাতির পুরুষ-প্রাণীদের এই অঙ্গগুলোর মধ্যে প্রায়শই নানান পার্থক্য থাকে, সেইসঙ্গেই বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যও থাকে এই অঙ্গগুলোর। তবে মিঃ আর. ম্যাকলাখ্‌লান আমাকে যেমনটা বলেছেন, তার সঙ্গে একমত হয়ে আমিও মনে করি কর্মগত গুণাবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখলে একটা কথা মনে নিতেই হবে যে এই অঙ্গ-গুলোর গুরুত্বকে একটু বেশিরকমই বাড়িয়ে দেখা হয়েছে। অনেকেই বলেছেন যে সম্পূর্ণ পার্থক্যবদ্ধ কিংবা সদ্য জারমান (incipient) বিভিন্ন প্রজাতির আন্তঃমিশ্রণ প্রাতিহত করার ব্যাপারে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা নিয়ে থাকে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের এইসব অঙ্গের হোটেখাটো পার্থক্যগুলো এবং তার ফলে ওইসব প্রাণীদের বিকাশেও এই পার্থক্যগুলো রীতিমতো সাহায্য করে থাকে। কিন্তু ঘটনা যে তা নয়, সেটা বোঝা যায় বিভিন্ন পৃথক পৃথক প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে মিলন সংক্রান্ত পর্ববৈকল্যের নানান নথিপত্র থেকে (দ্রষ্টব্য, ব্রন, “Geschichte der Natur.” B. ii, ১৮৪০, পৃঃ ১৬৪ ; এবং, ওয়েস্টউড, “Transact. Ent. Soc.”, খণ্ড ৩, ১৮৪২, পৃঃ ১৯৬)। মিঃ ম্যাকলাখ্‌লান আমাকে জানিয়েছেন (দ্রষ্টব্য, “Stett. Ent. Zeitung,” ১৮৬৭, পৃঃ ১৬৬) যে ডঃ অগ. মেরার স্বখন ফ্রাইগ্যানিডে-দের (Phryganidae) বেশ কিছু প্রজাতির প্রাণীদের একজরগার আবশ্য করেছিলেন—যাদের পরম্পরের মধ্যে এই ধরনের সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকে—তখন তাদের বিভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে “মিলন ঘটেছিল” এবং তাদের একটি জোড়া উর্বর ডিম্বাণু সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছিল।

২। “মডার্ন ক্র্যানিওস্কোপ অফ ইনসেক্টস”, খণ্ড ২, পৃঃ ২০৬, ২০৬। মিঃ ওয়ালশ্, যিনি চোয়ালের এই দু’ধরনের ব্যবহারের দিকে আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি জানিয়েছেন যে এ ঘটনা তিনি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন।

এদের স্ত্রী-প্রাণীরা তাদের চোয়ালটা কাজে লাগায় বালিতে গর্ত খোঁড়ায় জন্ত এবং বাসা বানানোর জন্ত ।

অনেক পুরুষ গুবরে-পোকাদের সামনের পায়ের গুল্ফটা ছড়ানো ধরনের হয় অথবা তাতে লোমের চণ্ডা পুঁটুলি থাকে । জলচর গুবরে-পোকাদের অনেক বর্গের পুরুষদের একটা গোল ও চ্যাপ্টা মতন শোষক (sucker) থাকে যার সাহায্যে তারা স্ত্রী-প্রাণীদের পিচ্ছিল শরীরে নিজেদেরকে আটকে রাখতে সক্ষম হয় । একটা অস্বাভাবিক ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যায় । কয়েক ধরনের জলচর গুবরে-পোকাদের (Dytiscus) স্ত্রী-প্রাণীদের সামনের ডানাগুলোয় গভীর খাঁজ-কাটা থাকে এবং অ্যাসিলিয়াস সালকাটাস (Acilius sulcatus) বর্গের স্ত্রী-প্রাণীদের সামনের ডানাগুলো লোমে ঢাকা থাকে, যার ফলে তাদেরকে আঁকড়ে ধরতে পুরুষদের সুবিধে হয় । আবার অন্য কয়েক ধরনের জলচর গুবরে-পোকাদের (Hydroporus) স্ত্রী-প্রাণীদের সামনের ডানায় ছিদ্র থাকে এবং সেটাও ওই একই কাজে লাগে ।^৩ ক্র্যাব্রো ক্রাই-



৯-নং ছবি—ক্র্যাব্রো ক্রাইব্রেরিয়াস ।

ওপরের ছবিটি পুরুষ-পতঙ্গের, নীচের ছবি স্ত্রী-পতঙ্গের ।

ব্রেরিয়াস-দের (Crabro cribrarius—৯নং ছবি) পুরুষ-প্রাণীদের পায়ের

৩। এখানে আমরা শিবরূপভার একটা বিচিত্র ও অব্যাক্যাত ঘটনার সম্মুখীন হই, কারণ ডাইস্টিকাস-দের (Dysticus) চারটি ইউরোপীয় প্রজাতির কিছ্রু কিছ্রু স্ত্রী-প্রাণীদের এবং হাইড্রোপোরাস-দের (Hydroporus) কয়েকটি প্রজাতির স্ত্রী-প্রাণীদের সামনের ডানাগুলো একেবারে মসৃণ হতেই দেখা যায় । লোমে ঢাকা বা ছিদ্রবৃত্ত সামনের ডানা এবং একেবারে মসৃণ সামনের ডানা—এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোনও স্তরের বোঁজও এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি ।

জজ্বাহিটা একটা চওড়া শক্ত পাতের মতন হয়ে ছড়িয়ে থাকে, তার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিল্লিময় ছিদ্র থাকে এবং তার ফলে এই অঙ্গটাকে ঠিক চালনি-র মতো দেখতে লাগে। পেন্থে (Penthe—গুবরে-পোকাদের একটি বর্গ) বর্গের পুরুষ-প্রাণীদের গুহের কয়েকটি মধ্যবর্তী সন্ধি একটু ছড়ানো ধরনের হয় এবং নীচের দিকে লোমের পুঁটুলি থাকে—ব্যাপারটা ঠিক ক্যারাবাইডে-দের পায়ের গুল্ফের মতোই “এবং প্রয়োজনীয়তাটাও একই।” পুরুষ গয়াল-পোকাদের “ল্যাজের শেষপ্রান্তের উপাঙ্গটার অসংখ্য পরিবর্তন ঘটেছে, একেকজনের ক্ষেত্রে এই উপাঙ্গটা একেকরকম রূপ নিয়েছে, এবং প্রতিটি



১০নং ছবি—

ট্যাফ্রোডেসেস ডিসটর্টাস
(অনেক বড় করে
দেখানো হয়েছে)।
ওপরের ছবিটি পুরুষ-
পতঙ্গের, নীচের ছবি
স্ত্রী-পতঙ্গের।

রূপই খুব বিচিত্র ধরনের। স্ত্রী-প্রাণীদের ঘাড়ের কাছটা যাতে তারা ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে, তার জন্তেই দেখা দিয়েছে এই বৈচিত্র্যগুলো।” শেষত, বহু পুরুষ-পতঙ্গের পায়ের অদ্ভুত ধরনের কাঁটা, শক্ত গাঁট কিংবা নখজাতীয় জিনিস থাকে। কখনও-কখনও এদের পুরো পা-টাই আনত কিংবা মোটা ধরনের হয়ে থাকে, তবে এটাকে কিছুতেই যৌন বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা চলে না। আবার অনেক সময় এদের একজোড়া পা কিংবা তিনজোড়া পা-ই বেশ দীর্ঘ হয়, কখনও-কখনও অত্যধিক দীর্ঘ হতেও দেখা যায়।

সমস্ত বর্গের বহু প্রজাতিরই স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে নানারকম পার্থক্য লক্ষ করা যায় কিন্তু সেগুলোর অর্থ বুঝে ওঠা যায় না। এ ব্যাপারে এক ধরনের গুবরে-পোকাদের (১০নং চিত্র) কথা উল্লেখ করা যায়। এদের পুরুষ-প্রাণীদের বাদিকের চোয়ালটা অনেকখানি প্রসারিত হয়ে থাকে, ফলে এদের মুখটাও অনেকখানি বেকে যায়। ক্যারাবিডাস বর্গের অন্তর্ভুক্ত ইউরিগন্থাথাস (Eurygnathus) নামক এক ধরনের গুবরে-পোকাদের কথা উল্লেখ করেছেন মিঃ উলার্টন। এদের পুরুষ-প্রাণীদের থেকে স্ত্রী-প্রাণীদের মাথাটা অনেক বেশি চওড়া ও বড় হয় (তবে সব স্ত্রী-প্রাণীর মাথা সমান চওড়া ও সমান বড় হয় না)। এরকম অসংখ্য ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। লেপি-ডোপ্টেরা-দের মধ্যে এরকম দৃষ্টান্ত প্রচুর চোখে পড়ে। এই বর্গের অন্তর্গত কয়েক ধরনের পুরুষ-প্রজাপতিদের মধ্যে একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ করা যায়। এদের সামনের পা-গুলো কমবেশি ক্ষয়প্রাপ্ত ধরনের হয় এবং জজ্বাহি ও গুল্ফ-গুলো অনেকটা লুপ্তপ্রায় গ্রন্থির

আকার নেয়। এদের স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের ডানার মধ্যেও নানান পার্থক্য থাকে। পার্থক্য থাকে তাদের ডানার ঝিল্লিতে^৪ এবং কখনও-কখনও দেহ-রেখাতেও, যেমনটা দেখা যায় অ্যারিকোরিস এপিটাস (*Aricoris epitus*) প্রজাতির ক্ষেত্রে। এই শেবোক্ত দৃষ্টান্তটি মিঃ এ. বাটলার আমাকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দেখিয়েছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার কয়েক ধরনের পুরুষ-প্রজাপতিদের ডানার কিনারায় লোমের গুচ্ছ থাকে এবং পিছনের জোড়ার চাকতিতে আবের মতো শক্ত অংশ দেখা যায়। মিঃ ওয়নফোর দেখিয়েছেন যে ব্রিটেনের কয়েক ধরনের প্রজাপতিদের শুধুমাত্র পুরুষ-প্রাণীদেরই শরীরের কোনও-কোনও অংশ বিচিত্র ধরনের আঁশে ঢাকা হয়।

স্ত্রী-জোনাকিদের শরীরের উজ্জ্বল আলোর ব্যাপারে আজ পর্যন্ত বহু আলোচনা হয়েছে। পুরুষ-জোনাকিদের এবং শূককীটদের, এমনকি ডিমেরও আলো থাকে, তবে এদের প্রত্যেকের আলোর দীপ্তি নিতান্তই ক্ষীণ হয়। কয়েকজন লেখকের মতে এই আলোটা শত্রুদের ভয় দেখিয়ে দূরে সরানোর উদ্দেশ্যেই কাজে লাগে, আবার অন্য কয়েকজন বলেছেন যে ওই আলোটা পুরুষ-জোনাকিদের সাহায্য করে স্ত্রী-জোনাকিদের কাছে পৌঁছতে। অবশেষে মিঃ বেন্ট এই প্রশ্নের একটা মোটামুটি নিশ্চিত সমাধান হাজির করতে পেরেছেন। ল্যাম্পিরিডে (*Lampyridae*) বর্গের বেশ কিছু ধরনের পতঙ্গদের নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখেছিলেন যে পতঙ্গভূক স্তম্ভপায়ীরা ও পাখিরা এদেরকে খেতে একেবারেই পছন্দ করে না। তাঁর এই মতটা মিঃ বেটস-এর মতের সঙ্গে পুরোপুরি সাযুজ্যপূর্ণ। মিঃ বেটস বলেছেন যে অনেক ধরনের পতঙ্গরা এই ল্যাম্পিরিডেদেরকে ছবছ অল্পকরণ করার চেষ্টা করে। উদ্দেশ্যটা হল—এর ফলে খাদকরা তাদেরকে ল্যাম্পিরিডে বর্গের পতঙ্গ বলে মনে করে খেতে আসবে না, ফলে তারা বেঁচে যাবে। মিঃ বেটস আরও বলেছেন যে আলোকপ্রভ প্রজাতির পতঙ্গদেরকে দেখামাত্রই তাদের খাদকরা বুঝতে পারে খাচ্ছিল সেবে তারা নিতান্তই অস্বস্তিকর, এবং এই ব্যাপারটা আলোকপ্রভ প্রজাতির পতঙ্গদের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এই একই ব্যাখ্যা ইলেকটারদের (*Elater*) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে যাদের উভয় লিঙ্গের প্রাণীরাই উজ্জ্বল আলোকপ্রভ হয়ে থাকে। স্ত্রী-জোনাকিদের ডানাগুলো কেন বিকশিত হয়ে ওঠেনি তা আমাদের জানা নেই, তবে তাদের বর্তমান চেহারাটার সঙ্গে শূককীটের চেহারার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকে। আমরা জানি বহু জীবজন্তুই শূককীট খেতে ভালবাসে। এ থেকেই বুঝে

৪। ই. ডাবল্ডে, “জ্যানাল’স অ্যাড ম্যাগ. অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি”, খণ্ড ১, ১৮৪৮, পৃঃ ৩৭৯। এর সঙ্গে আমি যোগ করতে পারি যে হাইমেনোপটেরা বর্গের কিছু-কিছু পতঙ্গদের (দ্রষ্টব্য, শার্ড, “ফনোমিরাল হাইমেনোপ.”, ১৮৩৭, পৃঃ ৩৯-৪০) স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের ডানার ঝিল্লিতে পার্থক্য থাকে।

নেওয়া যায় পুরুষ-জোনাকিদের থেকে স্ত্রী-জোনাকিরা কেন অনেক বেশি আলোকপ্রভ ও দৃষ্টি-আকর্ষক হয়ে থাকে আর একইভাবে শূককীটেরাও কেন আলোকপ্রভ হয়।

স্ত্রী-পুরুষের আকারগত পার্থক্য। সব ধরনের পতঙ্গদের মধ্যেই পুরুষ-পতঙ্গরা আকারে সাধারণত স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে ক্ষুদ্রতর হয়ে থাকে, এমনকি শূককীট দশাতেও এই পার্থক্যটা লক্ষ করা যায়। রেশম-কীটদের (*Bombyx mori*) স্ত্রী ও পুরুষ-গুটির মধ্যকার পার্থক্যটা এতই বেশি যে ফ্রান্সে তাদেরকে এক বিশেষ ধরনের ওজন-পদ্ধতির সাহায্যে পৃথক করা হয়ে থাকে। প্রাণিজগতের নিম্নতর শ্রেণীগুলির ক্ষেত্রে স্ত্রী-প্রাণীদের বৃহত্তর আকারটা সাধারণত নির্ভর করে তাদের প্রচুর সংখ্যক ডিম্বাণু সৃষ্টির ওপরেই। কীট-পতঙ্গদের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটা অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত সত্য বলেই মনে হয়। তবে ডঃ ওয়ালেস এ ব্যাপারে অনেক বেশি সম্ভাব্য একটা ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। বম্বিক্স সিনথিয়া (*Bombyx cynthia*) ও ইয়ামামাই (*Yamamai*) গুঁয়োপোকাদের এবং বিশেষত কয়েক ধরনের বামনাকৃতি গুঁয়োপোকাদের (যাদেরকে বড় করে তোলা হয়েছিল অনভ্যন্ত খাদ্যের ওপরে নির্ভরশীল অথ একটি বংশধারা থেকে) বিকাশপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করে তিনি বলেছেন, “প্রতিটি পোকা যত বেশি সুন্দর হয়, তাদের রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও তত বেশি হয়ে থাকে। এই কারণেই তাদের স্ত্রী-প্রাণীরা, যারা আকারে বড় ও ওজনে ভারি হয়ে থাকে, তাদেরকে অসংখ্য ডিম বহন করতে হয় বলে তাদের সংখ্যা পুরুষদের থেকে কম হয়, কারণ পুরুষরা আকারে ক্ষুদ্রতর হয় এবং পরিণত হয়ে ওঠার সময়টাও অনেক কম লাগে তাদের।” যেহেতু অধিকাংশ পতঙ্গই স্বল্পকালজীবী হয় এবং যেহেতু তাদেরকে নানান বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, সেহেতু তাদের স্ত্রী-প্রাণীরা যত দ্রুত গর্ভবতী হতে পারে ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল। এই উদ্দেশ্যটা সফল হতে পারে একমাত্র তখনই, যখন প্রচুর সংখ্যক পুরুষ-পতঙ্গ আগেই পরিণত হয়ে উঠে স্ত্রী-পতঙ্গদের পরিণত হয়ে ওঠার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতে পারে। মিঃ এ. আর. ওয়ালেস সঙ্গতভাবেই বলেছেন যে এই ঘটনাটাও সম্ভব হতে পারে একমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফতই। কারণ আকারে ক্ষুদ্রতর পুরুষ-পতঙ্গরাই সবচেয়ে আগে পরিণত হয়ে উঠবে আর তার ফলে তারা প্রচুর সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হবে এবং এই সন্তানরা তাদের জন্মদাতাদের ক্ষুদ্রতর আকারের উত্তরা-কারী হয়ে উঠবে, অতীতকে আকারে বড় পুরুষ-পতঙ্গদের পরিণত হয়ে উঠতে বিলম্ব হবে এবং তার ফলে তাদের সন্তানসংখ্যাও আপনা থেকেই কম হয়ে যাবে।

তবে জ্বী-পতঙ্গদের তুলনায় পুরুষ-পতঙ্গদের ক্ষুদ্রতর হওয়ার এই নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। এইসব ব্যতিক্রমের কারণ অল্পভব করাও এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। জ্বী-পতঙ্গদের দখল করার জন্য যাদেরকে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় তাদের পক্ষে শরীরের আকার বড় হওয়া এবং শক্তি বেশি থাকাটা একটা বাড়তি সুবিধা তো বটেই। স্ট্যাগ-বিটল-দের (Lucanas) পুরুষ-পতঙ্গরা আকারে জ্বী-পতঙ্গদের চেয়ে বড় হয়ে থাকে। তবে অন্য কয়েক ধরনের বিটল বা গুবরে-পোকারা নিজেদের মধ্যে সংগ্রামে লিপ্ত হয় না অথচ তাদের মধ্যেও পুরুষ-পতঙ্গরা আকারে জ্বী-পতঙ্গদের চেয়ে বড় হয়ে থাকে। এই ঘটনার অর্থ কী, আমাদের জানা নেই। তবে এদের কারুর কারুর মধ্যে, যেমন বিশালাকার ডাইনাসটাস (Dynastes) এবং মেগাসোমা-দের (Megasoma) মধ্যে, আমরা অন্তত এটুকু লক্ষ করি যে জ্বী-পতঙ্গদের চেয়ে আগে পরিণত হয়ে ওঠার জন্য পুরুষ-পতঙ্গদের আকারে ক্ষুদ্রতর হওয়ার কোনও প্রয়োজন হয় না, কারণ এই পতঙ্গরা মোটেই স্বল্পকালজীবী হয় না আর তার ফলে জ্বী-পুরুষের মিলনের জন্য এরা পর্যাপ্ত সময় পেয়ে থাকে। একইভাবে পুরুষ গ্যাল-পোকারা (Libellulidae) অনেক সময় জ্বী-পোকাদের চেয়ে আকারে যথেষ্ট বড় হয়ে থাকে, কিন্তু কখনোই তাদের থেকে আকারে ছোট হয় না। মিঃ ম্যাক্‌লাখ্‌লান-এর মতে, এক সপ্তাহ বা এক পক্ষকাল অতিক্রান্ত না-হওয়া পর্যন্ত এবং নিজেদের যথোপযুক্ত পুরুষালি গাঢ়বর্ণ অর্জন না-করা পর্যন্ত তারা সাধারণত জ্বী-পতঙ্গদের সঙ্গে মিলিত হয় না। তবে সবথেকে বিচিত্র ঘটনাটা লক্ষ করা যায় ছলবিশিষ্ট হাইমেনোপ্টেরা-দের (Hymenoptera) মধ্যে, যা থেকে বোঝা যায় উভয় লিঙ্গের সদস্যদের আকারের পার্থক্যের মতো অতি তুচ্ছ একটা বৈশিষ্ট্যের কত জটিল এবং সহজেই-নজর-এড়িয়ে-যাওয়া সম্পর্কগুলোর ওপর নির্ভর করে দেখা দিতে পারে। মিঃ এফ. স্মিথ আমাদের জানিয়েছেন যে এই বিশাল বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব পতঙ্গদের মধ্যেই ওই সাধারণ নিয়মটা ক্রিয়াশীল, অর্থাৎ পুরুষ-পতঙ্গরা আকারে জ্বী-পতঙ্গদের চেয়ে ক্ষুদ্রতর হয় এবং জ্বী-পতঙ্গদের থেকে প্রায় এক সপ্তাহ আগেই তারা পরিণত হয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু মোমাহিদের (Bees) ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্তরকম। এদের এপিস মেলিফিকা (Apis mellifica), অ্যান্থিডিয়াম ম্যানিকাটাম (Anthidium manicatum) আর অ্যান্থোফোরা অ্যাসেরভোরাম-দের (Anthophora acervorum) মধ্যে এবং ফসোর-দের (Fossore) মেথোকা ইখনউমোনিডেস (Methoca ichneumonides) শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গরা জ্বী-পতঙ্গদের চেয়ে আকারে বড় হয়। এই ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায় যে উড়ন্ত অবস্থায় মিলন এইসব প্রজাতির ক্ষেত্রে একান্তই প্রয়োজনীয় এবং শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় জ্বী-পতঙ্গদের বহন করার

জন্ম যথেষ্ট শক্তি ও বড় আকারটা পুরুষ-পতঙ্গদের পক্ষে নিতান্তই অপরিহার্য। শরীরের আকার ও পরিণত হয়ে ওঠার সময়কালের মধ্যে সাধারণত যে সম্পর্কটা ক্রিয়াশীল থাকে, এক্ষেত্রে তার বিপরীত চিত্রটাই চোখে পড়ে আমাদের। কারণ এদের মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গরা আকারে বৃহত্তর হলেও ক্ষুদ্রতর স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে আগেই পরিণত হয়ে বেরিয়ে আসে তারা।

এবার আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর পতঙ্গদের নিয়ে আলোচনা করব এবং তা করতে গিয়ে আমরা বেছে নেব আমাদের আলোচনার পক্ষে অধিক গুরুত্বসম্পন্ন তথ্যগুলিকেই। লেপিডোপ্টেরা-দের (প্রজাপতি ও মথ) নিয়ে একটি পৃথক পরিচ্ছেদে আলোচনা করব আমরা।

থাইস্যানিউরা (Thysanura) শ্রেণী। নিম্নস্তরের এই পতঙ্গদের ডানা থাকে না, গায়ের রঙ ক্যাকাশে হয়, আকারে অত্যন্ত ছোট এবং মাথা ও শরীর অত্যন্ত কুংসিত ধরনের হয়ে থাকে। এদের স্ত্রী আর পুরুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না, কিন্তু এদেরকে দেখলে বোঝা যায় প্রাণিজগতের একেবারে নিম্ন স্তরেও পুরুষরা কত সম্বন্ধে স্ত্রী-প্রাণীদের কাছে প্রেমনিবেদন করে থাকে। স্মর জে. লুবক বলেছেন, “এইসব ক্ষুদ্রাকার প্রাণীরা (*Smynturus luteus*) কিভাবে নিজেদের মধ্যে প্রেমের খেলা খেলে, তা দেখা এক মজার অভিজ্ঞতা। এদের পুরুষ-প্রাণীরা স্ত্রী-প্রাণীদের চেয়ে আকারে অনেকটাই ছোট হয় এবং তারা স্ত্রী-প্রাণীদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। ভারপর স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীরা মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়, ভেড়ারা যেভাবে খেলা করে সেইভাবে একবার এগোয় আবার পিছোয় এবং একে অপরকে চুঁ মারে। অতঃপর স্ত্রী-প্রাণীটি পালানোর ভান করে, পুরুষ-প্রাণীটি রাগের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে তাকে তাড়া করে এবং তার সামনে চলে গিয়ে আবার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রী-প্রাণীটি তখন খুব লাজুকভাবে পিছু ফেরে, কিন্তু তার তুলনায় দ্রুততর ও অধিকতর সক্রিয় পুরুষ-প্রাণীটিও তৎক্ষণাৎ ধেয়ে আসে তার দিকে এবং নিজের শুঙ্গ দিয়ে চাবুক মারার মতো করে আঘাত করে তাকে। অতঃপর কিছুক্ষণ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে তারা, শুঙ্গ দিয়ে খেলা করে এবং চারপাশের সবকিছু ভুলে একে অপরকে নিয়ে বিভোর হয়ে থাকে।”

ডিপ্টেরা (মাছি ইত্যাদি) শ্রেণী। এদের স্ত্রী-পুরুষের গায়ের রঙে কোনও পার্থক্য থাকে না বললেই চলে। এদেরকে পর্যবেক্ষণ করে মিঃ এফ. ওয়াকার দেখেছিলেন যে এই শ্রেণীর বাইবো (*Bibio*) বর্গের স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যেই গায়ের রঙের সবথেকে বেশি পার্থক্য থাকে—পুরুষদের

গায়ের রঙ হয় কালচে অথবা বন কালো এবং জ্বী-পতঙ্গরা ফ্যাকাশে গোছের খয়েরি-কমলা রঙের হয়ে থাকে। মিঃ ওয়ালেস কর্তৃক নিউ গিনিতে আবিষ্কৃত ইল্যাফোমাইয়া (*Elaphomyia*) বর্গের পতঙ্গরা বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়ার দাবি রাখে, কারণ এদের পুরুষ-পতঙ্গদের শুঙ্গ থাকে কিন্তু জ্বী-পতঙ্গদের আদৌ কোনও শুঙ্গ থাকে না। এই শুঙ্গগুলো উদগত হয় চোখের নীচে থেকে এবং পুরুষ-হরিণের শুঙ্গের সঙ্গে এদের এই শুঙ্গের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়—হরিণদের শুঙ্গের মতোই এদের শুঙ্গেও শাখা থাকে। এদের একটা প্রজাতির ক্ষেত্রে এই শুঙ্গগুলো দৈর্ঘ্যে তাদের গোটা শরীরটার সমান হয়ে থাকে। আপাতভাবে মনে হতে পারে যে লড়াই করার জন্তই হয়তো এই শুঙ্গগুলো অর্জন করেছে এরা। কিন্তু এদের একটা প্রজাতির ক্ষেত্রে এই শুঙ্গগুলো অত্যন্ত চমৎকার লালচে রঙের হয়, ধারগুলো হয় কালো রঙের আর মাঝখানে একটা ফ্যাকাশে রঙের ডোরা থাকে, তাছাড়া সামগ্রিকভাবেই এই বর্গের পতঙ্গদের দেখতে খুব সুন্দর হয়—এই তথ্যগুলো মাথায় রাখলে ওই শুঙ্গগুলোকে লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা না করে অঙ্গসজ্জা হিসেবে বিবেচনা করাটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। ডিপ্‌টেরা শ্রেণীর কিছু কিছু পুরুষ-পতঙ্গ যে নিজের মধ্যে লড়াই করে, তা আমরা জানি। টিপুলে-দের (*Tipulae*) মধ্যে এই ব্যাপারটা বহুবার লক্ষ করেছেন অধ্যাপক ওয়েস্টউড। ডিপ্‌টেরা শ্রেণীর অত্র কিছু বর্গের পুরুষরা জ্বী-পতঙ্গদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে সুর বা সঙ্গীতের সাহায্যে—অস্তুত আপাতভাবে তাই-ই মনে হয়। এরিস্টালিস (*Eristalis*) প্রজাতির দুটি পুরুষ-পতঙ্গকে একটি জ্বী-পতঙ্গের কাছে প্রেমনিবেদন করতে দেখেছিলেন এইচ. ম্লার। তারা দুজনে জ্বী-পতঙ্গটির কাছে ঘেঁষে এসে তার চারপাশে উড়ে-উড়ে বেড়াচ্ছিল এবং উড়তে উড়তেই একটা তীক্ষ্ণ গুন্‌গুন শব্দ করে চলেছিল। ডাঁশ এবং মশারাও (*Culicidae*) এইরকম গুঞ্জন বা গুন্‌গুন শব্দের সাহায্যেই পরস্পরকে আকৃষ্ট করে বলে মনে হয়। অধ্যাপক মেয়ার সম্প্রতি সুনিশ্চিতভাবে জানিয়েছেন যে এদের পুরুষ-পতঙ্গদের হল বা শুঙ্গের রোমগুলো একটা সুর-বাঁধার যন্ত্রের (*tuning-fork*) দ্বারা সৃষ্ট সুরের সঙ্গে মিল রেখে সমান তালে স্পন্দিত হয় (যন্ত্রটি থেকে নির্গত শব্দের সীমার মধ্যে তারা থাকলে তবেই এই স্পন্দনটা লক্ষ করা যায়)। বড় রোমগুলো সমান তালে স্পন্দিত হয় খাদের সুরের সঙ্গে আর ছোট রোমগুলো স্পন্দিত হয় চড়া সুরের সঙ্গে। ল্যান্ডোয়াও (*Landois*) বলেছেন যে বিশেষ বিশেষ সুর সৃষ্টি করে তিনি প্রায়শই ডাঁশদের পুরো এক-একটা দলকে নিজের কাছে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এইসঙ্গেই যোগ করা যায় যে ডিপ্‌টেরা শ্রেণীর পতঙ্গদের স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত উন্নত ধরনের হয় বলে এদের মানসিক ক্ষমতাও সম্ভবত অস্বাভাবিক

অধিকাংশ পতঙ্গদের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।*

হেমিপ্টেরা (মেঠো-ছারপোকা জাতীয়) শ্রেণী। ব্রিটেনে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিগুলিকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন মিঃ জে. ডব্লিউ. ডগলাস এবং এদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্যের কথা আমাকে জানিয়েছেন তিনি। এদের কোনও-কোনও প্রজাতির পুরুষদের ডানা থাকে কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীদের কোনও ডানা থাকে না। শরীর, সম্মনের ডানা, শুষ্ক ও গুলফ—এই সবকিছুর ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য থাকে। তবে এই পার্থক্যগুলোর তাৎপর্য আমাদের জানা নেই বলে এ নিয়ে আলোচনার চেষ্টা থেকে আপাতত নিরস্ত থাকছি আমরা। এদের স্ত্রী-প্রাণীরা সাধারণত পুরুষদের চেয়ে আকারে বড় ও বেশি ছুটপুট হয়। ব্রিটেনের প্রজাতিগুলির ক্ষেত্রে, এবং মিঃ ডগলাসের জ্ঞাত তথ্য অনুসারে, বহিরাগত প্রজাতিগুলির ক্ষেত্রেও, স্ত্রী আর পুরুষ-প্রাণীদের গায়ের রঙে সাধারণত তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না। তবে ব্রিটেনের ছ'টি প্রজাতির ক্ষেত্রে এদের স্ত্রী-প্রাণীদের তুলনায় পুরুষ-প্রাণীদের গায়ের রঙ অনেক বেশি কালো হয় এবং অল্প চারটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-প্রাণীদের গায়ের রঙ পুরুষদের তুলনায় বেশি কালো হয়। কয়েকটি প্রজাতির উভয় লিঙ্গের সদৃশদেরই গায়ের রঙ খুব উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এদের শরীর থেকে একটা তীব্র গা-বিন্ধিনে গন্ধ ছড়ায়। এ থেকে মনে হয় যে এদের গায়ের ওই উজ্জ্বল রঙটা আসলে একটা সঙ্কেত হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ পতঙ্গভূক প্রাণীদেরকে ওই রঙটা জানিয়ে দেয় যে খাওয়া হিসেবে এই পতঙ্গরা মোটেই ঝুঁকির হবে না। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে গায়ের রঙটা সরাসরিভাবেই এদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে থাকে। যেমন অধ্যাপক হফমান আমাকে জানিয়েছেন যে এদের লালচে ও সবুজ রঙের নৃতাত্ত্বিক প্রজাতির পতঙ্গদেরকে তিনি লেবুগাছের ডালে (যে-সব গাছে এই পতঙ্গদের হামেশাই দেখা যায়) ফুটে থাকা ঝুঁড়িগুলোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন, কিছুতেই তাদেরকে আলাদা করে চিনে উঠতে পারেন না।

রেডুভিডে-দের (Reduvidae) কয়েকটি প্রজাতির পতঙ্গরা একরকম তীক্ষ্ণ ও কর্কশ শব্দ করে থাকে। এদের মধ্যে পাইরেটস স্ট্রাইডিউলাস-দের (*Pirates stridulus*) ব্যাপারে বলা হয় যে এদের বুকের সবথেকে সামনের অংশের গহ্বরটি (prothoracic cavity) বাড়ির মধ্যে চলাচল করে বলেই এই

*। প্রস্তুত, মিঃ বি. টি. লোনে-র কৌতুহলোদ্দীপক গ্রন্থ “অন দ্য অ্যানাটমি অফ দ্য রোম্বাই, মাস্কা ভমিটোরিয়া” (*Musca Vomitoria*), পৃঃ ১৪। এই গ্রন্থেই (পৃঃ ৩৩) তিনি বলেছেন যে “বন্দী মাছিরা এক ধরনের বিলাপপূর্ণ অশ্রুত সুর ছড়াতে থাকে এবং তা শুনে অন্য মাছিরা সেখান থেকে উধাও হয়ে যায়।”

শব্দটা সৃষ্টি হয়ে থাকে। ওয়েস্টারিং-এর মতে, রেডুভিয়াস পার্সোন্টাটাস-রাও (*Reduvius personatus*) এ-রকম তীক্ষ্ণ ও কর্কশ শব্দ করে থাকে। তবে এটাকে যৌন বৈশিষ্ট্য বলে মনে করার কোনও কারণ আমি খুঁজে পাইনি— একমাত্র যে-সব পতঙ্গরা সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে না, তাদের ক্ষেত্রে এটাকে একটা যৌন বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাদের ক্ষেত্রে এই শব্দটা সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে ডাকার যৌন-সংকেত হওয়াটাই স্বাভাবিক, অন্যথায় তাদের শরীরে এ ধরনের শব্দ-সৃষ্টিকারী অঙ্গ থাকার কোনও অর্থই থাকে না।

হোমোপ্টেরা (Homoptera) শ্রেণী। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কোনও অরণ্যে ঘোরার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে, তাঁরা নিশ্চয়ই কখনও-না-কখনও পুরুষ ঘূঘুরে-পোকাদের (*Cicadae*) ডাক শুনে বিম্বিত হয়েছেন। এদের জ্বী-পতঙ্গরা কিন্তু মুক হয়, কোনও শব্দ করতে পারে না। এই ঘটনাটা লক্ষ করেই গ্রীক কবি জেনারথাস লিখেছিলেন, “পৃথিবীতে ওই ঘূঘুরেরাই স্তম্ভী, কারণ তাদের জ্বীদের কণ্ঠে কোনও শব্দ ফোটে না।” ব্রাজিলের তীরভূমি থেকে মিকি মাইল দূরে যখন নোঙর ফেলেছিল ‘বিগল্’ জাহাজ, তখন জাহাজে বসেই তীর থেকে ভেসে আসা ওই ঘূঘুরে-পোকাদের ডাক শোনা যেত। ক্যাপ্টেন ছানুক্ক বলতেন এক মাইল দূর থেকেও নাকি ওই ডাক শুনে পাওয়া যায়। এই পতঙ্গদের এই ডাক বা গান শোনার জ্ঞান প্রাচীনকালে গ্রীকরা এদের খাঁচায় আটকে রাখত, এখন আটকে রাখে চীনারা। এ থেকে বোঝা যায় যে এদের ডাক শুনে অস্তুত কিছু মাহুষের বেশ ভালই লাগে। ঘূঘুরে-পোকারা সাধারণত দিনের বেলাতেই ডাকে বা গান গায়, অল্পদিকে ফাল্গোরিডে-রা (*Fulgoridae*) নৈশগায়ক হিসেবেই বেশি পরিচিত। ল্যাণ্ডোয়ার মতে, এই শব্দটা উদ্ভূত হয় ওঠের কম্পন থেকে এবং এই কম্পনটা সৃষ্টি হয় শ্বাসনালী থেকে নির্গত বাতাসের তরঙ্গের দ্বারা। কিন্তু এই মতটা নিয়ে সম্প্রতি কিছু বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ডঃ পাওয়েল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে এই শব্দটা উদ্ভূত হয় একটা ঝিল্লির কম্পন থেকে এবং এই কম্পনটা সৃষ্টি হয় একটি বিশেষ পেশীর সাহায্যে। জীবন্ত পতঙ্গরা যখন এইরকম শব্দ সৃষ্টি করে তখন লক্ষ করলে ওই ঝিল্লিটার কম্পন দেখতে পাওয়া যায়। মৃত পতঙ্গদের ওই পেশীটা একটু শুকনো আর শক্ত হয়ে যাওয়ার পর একটা পিমের মাথা দিয়ে সেটাতে টান দিলে তাদের শরীর থেকেও ওই একই শব্দ নির্গত হয়। এদের জ্বী-পতঙ্গদের শরীরেও শব্দসৃষ্টিকারী সমস্ত জটিল অঙ্গগুলোই বিদ্যমান থাকে, তবে সেগুলো পুরুষদের মতন অতটা উন্নত অবস্থায় থাকে না এবং সেগুলো কখনোই শব্দ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃতও হয় না।

এদের এই শব্দ বা সঙ্গীত সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করেছেন ডঃ হার্টম্যান। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যুঘুরে-পোকাদের নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “শব্দগুলো এখন (৬ ও ৭ জুন, ১৮৫১) সব দিক থেকেই শোনা যাচ্ছে। আমার ধারণা এগুলো আসলে পুরুষ-পতঙ্গদের যৌন-মিলনের ডাক। আমার মাথা-সমান উচু চেস্টনাট গাছের ঘন একটা ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। আমার চারপাশে শয়ে শয়ে পুরুষ-পতঙ্গ ডেকে চলেছে একটানা। খানিক পরেই দেখলাম স্ত্রী-পতঙ্গরা দলে দলে এসে জড়ো হচ্ছে পুরুষ-পতঙ্গগুলোর চারপাশে।” তিনি আরও বলেছেন, “এ মরশুমে (অগাস্ট, ১৮৬৮) আমার বাগানের একটা ছোট নাশপাতি গাছে সিকাড়া প্রাইনোসা-দের (*Cic. pruinosa*) প্রায় পঞ্চাশটা শূককীট হয়েছিল। প্রায়শই আমি লক্ষ্য করতাম যে পুরুষ-পতঙ্গরা ওই তীক্ষ্ণ শব্দটা সৃষ্টি করছে আর স্ত্রী-পতঙ্গরা উল্লসিত ভঙ্গিতে তাদের কাছে গিয়ে হাজির হচ্ছে।” ফ্রিজ্ মুলার দক্ষিণ ব্রাজিল থেকে আমাকে লিখে জানিয়েছেন যে ওখানে তিনি প্রায়শই কোনও প্রজাতির দু-তিনটি পুরুষ-পতঙ্গকে নিজেদের মধ্যে সান্দ্রীতিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে দেখেছেন। পরস্পরের থেকে বেশ খানিকটা দূরে দূরে থেকে রীতিমতো উচ্চকণ্ঠে ডাকাডাকি শুরু করে এরা। একজনের গান বা ডাক শেষ হওয়া মাত্রই আরেকজন ডাকতে শুরু করে, সে চূপ করা মাত্রই শুরু করে দেয় অন্য আরেকজন। পুরুষ-পতঙ্গদের নিজেদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে। এ থেকে মনে হয় যে ওই শব্দ শুনেই স্ত্রী-পতঙ্গরা তাদেরকে খুঁজে বার করে তো বটেই, সেইসঙ্গেই স্ত্রী-পাখিদের মতো তারাও সবথেকে আকর্ষণীয় পুরুষ-কণ্ঠের দ্বারা উত্তেজিত বা প্রলুব্ধ হয়।

হোমোপ্টেরাদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে অঙ্গসম্বন্ধগত কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের কথা আমার গোচরে আসেনি। মিঃ ডগলাস আমাকে জানিয়েছেন যে ব্রিটেনে এদের তিনটি প্রজাতির মধ্যে পুরুষ-পতঙ্গরা কালো রঙের হয় অথবা তাদের গায়ে কালো ডোরা থাকে, আর স্ত্রী-পতঙ্গরা খানিকটা ফ্যাকাশে রঙের হয়ে থাকে।

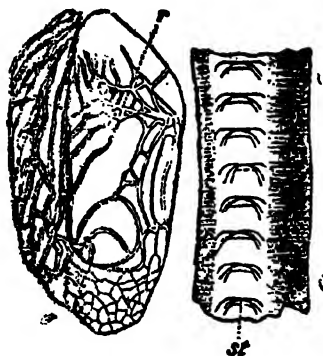
অর্থোপ্টেরা (ঝিঁঝিঁপোকা ও ফড়িং) শ্রেণী। এই শ্রেণীর তিনটি বর্গের পুরুষ-পতঙ্গদের সঙ্গীত বা শব্দ সৃষ্টি করার শক্তিতে উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি বর্গ হল অ্যাকেটিডে (*Achetidae*) বা ঝিঁঝিঁপোকা, লোকাষ্টিডে (*Locustidae*) বা পদ্মপাল এবং অ্যাক্রিডিডে (*Acridiidae*) বা ফড়িং। পদ্মপালরা যে শব্দ সৃষ্টি করে তা এতই উচ্চ হয় যে রাতের বেলায় অন্তত এক মাইল দূর থেকেও তা শোনা যায়। এদের কয়েকটি প্রজাতির দ্বারা সৃষ্ট শব্দ মোটেই কর্কশ নয়, এমনকি মাহুঘের কানেও তা প্রতিধ্বনিত শোনায়

আর তা শোনার জন্যই আমাজন অঞ্চলের ইণ্ডিয়ানরা এদেরকে বেতের খাঁচায় আটকে রাখে। এদেরকে যারা পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছেন যে মুক জ্বী-পতঙ্গদেরকে ডাকা অথবা উত্তেজিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় এই শব্দসৃষ্টির ক্ষমতাটা। রাশিয়ার পরিযায়ী পতঙ্গপালদের মধ্যে জ্বী-পতঙ্গদের দ্বারা মনোমতো পুরুষ-পতঙ্গ নির্বাচন করার একটা কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের কথা উল্লেখ করেছেন কোর্টে (Korte)।^৬ এই প্রজাতির (*Pachytylus migratorius*) পুরুষ-পতঙ্গরা যখন জ্বী-পতঙ্গদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন অল্প কোনও পুরুষ-পতঙ্গকে সেদিকে এগোতে দেখলে রাগে অথবা দীর্ঘায় প্রচণ্ড জোরে শব্দ করতে শুরু করে তারা। সাধারণ ঝিঁঝিঁপোকারা রাগে কোনও কারণে চমকিত বা আতঙ্কিত হলে অজ্ঞাত ঝিঁঝিঁপোকাদের সতর্ক করার জন্য ডাকতে শুরু করে। উত্তর আমেরিকার কেলি-ডিড-রা (*Platyphyllum concavum*, এক ধরনের পতঙ্গপাল) কোনও একটা গাছের ওপরদিকের ডালে চড়ে বসে এবং “সন্ধ্যাবেলায় উচুগলায় ডাকাডাকি করতে শুরু করে আর তার প্রত্যুত্তরে আশপাশের গাছ থেকে ভেসে আসতে থাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের গলার স্বর। সবার ডাকাডাকি মিলে এলাকাটা ভরে উঠে ‘কেলি-ডিড-শি-ডিড’ রবে। সারারাত ধরে চলতে থাকে এই ডাকাডাকির পালা।” ইউরোপীয় মেঠো-ঝিঁঝিঁপোকাদের (অ্যাকেটিডে বর্গের অন্তর্ভুক্ত) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মিঃ বেটস বলেছেন, “পুরুষ-পতঙ্গরা সন্ধ্যাবেলায় নিজেদের গর্তের প্রবেশপথের সামনে বসে উঁচুগলায় ডাকতে শুরু করে। কোনও জ্বী-পতঙ্গ তার দিকে এগিয়ে না-আসা পর্যন্ত একটানা ডেকে চলে তারা। কোনও জ্বী-পতঙ্গ এগিয়ে আসার পরেও তারা ডাকে ঠিকই, তবে ওই উঁচু স্বরটা তখন অনেক মৃদু, অনেক নিচু হয়ে যায়। অতঃপর ওই সফল সঙ্গীতজ্ঞটি নিজের গুপ্ত দিয়ে আদর করতে শুরু করে তার বিজিতা সঙ্গিনীকে।”^৭ ডঃ স্কাডার একবার একটি পরীক্ষা করেছিলেন। একটা শজারুর কাঁটাকে একটা উথার গায়ে ঘষে ঘষে এক ধরনের শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। সেই শব্দ শুনে উত্তেজিত হয়ে এই বর্গের একটি পতঙ্গ পাণ্টা শব্দ সৃষ্টি করে তার জবাব দিতে শুরু করেছিল। ফন সিবল্ড পরীক্ষা করে দেখেছেন এদের উভয় লিঙ্গেরই সমস্তদের শ্রবণযন্ত্রটা খুব শক্তিশালী হয়। এই শ্রবণযন্ত্রটা তাদের সামনের পায়ে থাকে।

৬। ভ্যাটি আম পেয়েছি কোপেন-এর (Koppen) লেখা থেকে। দ্রষ্টব্য, কোপেন, “Ueber die Heuschrecken in Sudrussland”, পৃঃ ৩২। অনেক চেষ্টা করেও কোর্টের নিজের লেখাটি সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি আমি।

৭। “দ্য ন্যাচারালিষ্ট অন দ্য আমাজন’স্”, খণ্ড ১, পৃঃ ২৫২। উল্লিখিত তিনটি বর্গের পতঙ্গদের সঙ্গীত বা শব্দসৃষ্টির অঙ্গগুলির ক্রমবিন্যাস প্রসঙ্গে চমৎকার আলোচনা করেছেন মিঃ বেটস।

উল্লিখিত তিনটি বর্গের পতঙ্গদের শব্দ সৃষ্টি করার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। অ্যাকটেডে বর্গের পুরুষ-পতঙ্গদের উভয় পক্ষাবরণীতে একই অঙ্গ থাকে। ল্যাণ্ডোয়া বলেছেন, মেঠো-ঝিঁঝিঁপোকাদের (*Gryllus Campestris*, ১১নং চিত্র) এই অঙ্গটি গঠিত হয় পক্ষাবরণীর একটি নার্ভার-এর



১১নং ছবি—গ্রাইলাস ক্যাম্পেসট্রিস (ল্যাণ্ডোয়ার গ্রন্থ থেকে নেওয়া)।

ডানাদিকের ছবি—ডানার নার্ভার-এর নীচের দিক, অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে। ছবিতে দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে (st)। বাঁদিকের ছবি—পক্ষাবরণীর ওপরের দিক, যাতে রয়েছে অভিক্ষিপ্ত ও মসৃণ নার্ভার, যার ওপর দিয়ে দাঁতগুলি (r) ঘর্ষিত হয়।

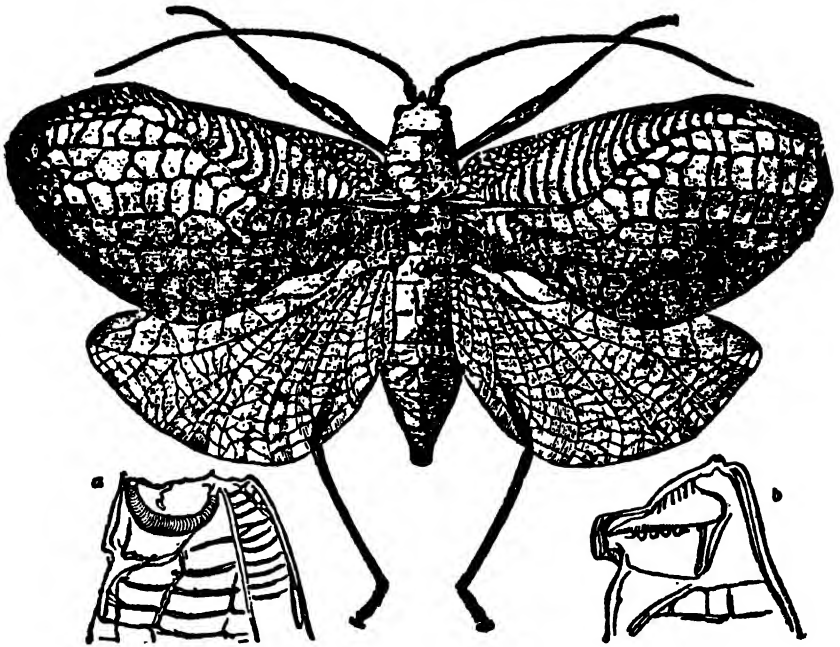
(nervure) নীচের দিকে অবস্থিত ১৩২ থেকে ১৩৮-টি তীক্ষ্ণ ও তির্যক দাঁতের (st) সাহায্যে। ওই দৃশ্যবিশিষ্ট নার্ভারটি বিপরীত দিকের ডানার ওপরদিকের একটি অভিক্ষিপ্ত, মসৃণ ও শক্ত নার্ভার-এর (r) ওপর দিয়ে দ্রুত ঘষে যায়। প্রথমে একটি ডানা অল্প ডানাটির ওপরে ঘষিত হয়, তারপর দ্বিতীয় ডানাটি ঘষিত হয় প্রথম ডানাটির ওপরে। দুটি ডানো একইসঙ্গে একটু উচু হয়ে ওঠে, তার ফলে অহুরণন অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের পক্ষাবরণীর নীচের দিকে লেজের মতো একটা চাকতি থাকে। গ্রাইলাস-দের (*Gryllus*) অন্য একটি প্রজাতির, যারা গ্রাইলাস ডোমেস্টিকাস (*G. domesticus*) নামে পরিচিত, তাদের নার্ভার-এর নীচের দিকের দাঁতের একটা ছবি পাঠকদের সামনে পেশ করছি আমি (১২নং চিত্র)। এই



১২নং ছবি—গ্রাইলাস ডোমেস্টিকাস-এর নার্ভারের দাঁত (ল্যাণ্ডোয়ার গ্রন্থ থেকে নেওয়া)।

দাঁতগুলির গঠন সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডঃ গ্রুবার বলেছেন—এদের ডানা এবং শরীর যে-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ ও রোমের দ্বারা আবৃত থাকে সেই আঁশ ও রোমগুলি থেকেই নির্বাচনের সাহায্যে গড়ে উঠেছে এই দাঁতগুলি। কোলিওপ্টেরা-দের (Coleoptera) ব্যাপারে এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি আমিও। তবে এইসঙ্গেই ডঃ গ্রুবার আরও বলেছেন যে একটি ডানার সঙ্গে অল্প ডানাটির ঘর্ষণের ফলে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, তা-ও এই দাঁতগুলি গড়ে ওঠার আংশিক কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

লোকাস্টিডে-দের (Locustidae) ক্ষেত্রে পরস্পরের বিপরীত দিকে অবস্থিত পক্ষাবরণীগুলির গঠনকাঠামো পরস্পরের থেকে পৃথক ধরনের হয় (১৩নং চিত্র) এবং পূর্বোক্ত বর্গের পতঙ্গদের মতো এদের ক্ষেত্রে প্রথম ডানাটি



১৩নং ছবি—ক্লোরোক্যালাস টানানা (Chlorocaelus Tanana : হেটস-এর গ্রন্থ থেকে নেওয়া)।

a, b—পরস্পরের বিপরীত দিকের পক্ষাবরণীগুলির বিভিন্ন অংশ।

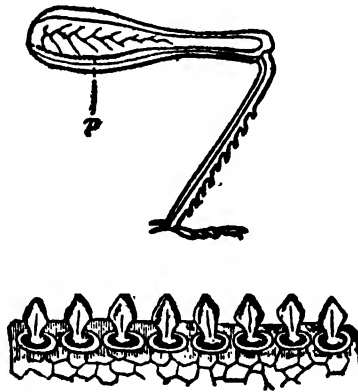
দ্বিতীয় ডানাটির ওপরে অবস্থিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ডানাটি প্রথম ডানাটির ওপর অবস্থিত হতে পারে না। বাদিকের ডানাটি, যেটি ছড়ি হিসেবে কাজ করে, সেটি এসে পড়ে ডানদিকের ডানাটির ওপরে, যেটি বেহালা হিসেবে কাজ করে। বাদিকের ডানাটির নীচের দিকের একটি নার্ভারে (a) করাতের মতো তীক্ষ্ণ খাঁজ-কাটা থাকে এবং সেটি তার বিপরীত দিকের অর্থাৎ ডানদিকের ডানার ওপর দিকের অভিক্ষিপ্ত নার্ভারের ওপরে অবস্থিত হয়। ব্রিটেনের ফাসগোনিউয়া

ভিরিডিসিমা (*Phasgonura viridissima*) প্রজাতির পতঙ্গদেরকে পর্যবেক্ষণ করে আমি দেখেছি এদের খাঁজ-কাটা নার্তারটি ঘষিত হয় বিপরীত ডানার একেবারে পিছনদিকের গোলাকার কোণটির সঙ্গে এবং এই বিপরীত ডানার প্রান্তটি বেশ পুরু, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও বাদামি রঙের হয়ে থাকে। এদের ডানদিকের ডানায় (বাদিকের ডানায় এটি থাকে না) রূপোলি ধাতুর (talc) মতো স্বচ্ছ একটা ছোট চাকতি থাকে, চাকতিটির চারদিক ঘিরে অনেকগুলি নার্তার থাকে এবং এটিকে চিহ্নিত করা হয় স্পেকিউলাম (*Speculum*) বা আয়না নামে। এই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত এফিপিগার ভিটিয়াম (*Ephippiger vitium*) প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে বিচিত্র ধরনের একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এদের পক্ষাবরণীগুলো আকারে অত্যন্ত ছোট হয়, কিন্তু “বুকের একেবারে সামনের অংশের পিছনদিকটি পক্ষাবরণীগুলির উপরে গম্বুজের মতো উঁচু হয়ে থাকে। এদের ডাক বা শব্দকে আরও জোরদার করে তোলার জগুই সম্ভবত এই পরিবর্তনটি সাধিত হয়েছে।”

অ্যাকাটিডে, যাদের উভয় পক্ষাবরণীর গঠনকাঠামো একইরকম হয় এবং সেগুলির কাজও এক হয়, তাদের থেকে লোকাস্টিডেদের (আমার মতে এই শ্রেণীর উৎকৃষ্টতম সঙ্গীতজ্ঞ বা শব্দসৃষ্টিকারীরা এই বর্ণেরই অন্তর্ভুক্ত) সঙ্গীত বা শব্দ সৃষ্টির অঙ্গগুলি যে অনেক বেশি পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য বা গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তবে এই লোকাস্টিডেদের ডেক্টিকাস (*Decticus*) নামক প্রজাতিটির ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলেন ল্যাণ্ডোয়া। তিনি দেখেছিলেন এদের ডানদিকের পক্ষাবরণীর নীচের দিকে ছোট ও সঙ্গীর্ণ একসারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত (প্রায় প্রাথমিক স্তরের) থাকে। এই পক্ষাবরণীটি অল্প পক্ষাবরণীটির নীচের দিকে থাকে এবং কখনোই বেহালার ছড় হিসেবে কাজ করে না। ফাসগোনিউরা ভিরিডিসিমা প্রজাতির পতঙ্গদের ডানদিকের পক্ষাবরণীর নীচের দিকে এই একইরকম প্রাথমিক অঙ্গ লক্ষ করেছি আমি। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে আমরা এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে লোকাস্টিডেদেরা উদ্ভূত হয়েছে এমন একটি আদিরূপ থেকে যাদের উভয় পক্ষাবরণীরই নীচের দিকে খাঁজ-কাটা নার্তার ছিল (আঙ্গকের দিনের অ্যাকেটিডেদের মতো) এবং সেগুলোকে যখন-খুশি বেহালার ছড় হিসেবে ব্যবহার করা যেত। তবে লোকাস্টিডেদের মধ্যে পক্ষাবরণী দুটি শ্রম-বিভাজনের নীতি অনুযায়ী ক্রমশ পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও নিখুঁত হয়ে উঠেছে—একটি পক্ষাবরণী কাজ করে ছড় হিসেবে, অন্যটি কাজ করে বেহালা হিসেবে। ডঃ গ্রুবারও এই একই কথা বলেছেন এবং সেইসঙ্গেই দেখিয়েছেন যে এদের প্রাথমিক দশার দাঁতগুলি সাধারণত ডানদিকের ডানায় নীচের দিকেই থাকে। অ্যাকেটিডেদের সাদামাটা বা

বৈশিষ্ট্যহীন অঙ্গগুলো কোন্ কোন্ স্তরের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে তা আমাদের জানা নেই। তবে খুব সম্ভবত প্রথম অবস্থায় এদের দুটি পক্ষাবরণীর নীচের অংশগুলো একে অপরের ওপরে এসে পড়ত (ঠিক যেমনটা দেখা যায় আজকের দিনের অ্যাকটিডেদের মধ্যে) এবং নার্তারগুলোর ঘর্ষণের ফলে একটা কর্কশ শব্দ সৃষ্টি হত—যেমনটা ঘটে থাকে এদের জ্বী-পতঙ্গদের পক্ষাবরণীর ক্ষেত্রে।^৮ এইভাবে মাঝেমধ্যে ঘটনাচক্রে যে কর্কশ শব্দটা সৃষ্টি করত পুরুষ-পতঙ্গরা, যা হয়তো জ্বী-পতঙ্গদের উদ্দেশ্যে তাদের মিলনের আহ্বান হিসেবেও কিছুটা ভূমিকা পালন করত, তা যে যৌন নির্বাচন মারফত অনায়াসেই অত্যন্ত জোরদার একটা শব্দে পরিণত হতে পারে (প্রথম থেকেই বিদ্যমান নার্তার-গুলির রক্ষণায় নানান পরিবর্তনের ফলে)—তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

এই শ্রেণীর অস্তিত্ব বা তৃতীয় বর্গ হচ্ছে অ্যাক্রিডিডে বা ফড়িংরা। এদের ক্ষেত্রে ওই কর্কশ শব্দটা উদ্ভূত হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে, এবং, ডঃ স্কাডার-এর মতে, এদের এই শব্দটা আগের দুটি বর্গের পতঙ্গদের দ্বারা সৃষ্ট শব্দের মতো অত তীক্ষ্ণও হয় না। এদের উর্বাস্থির (femur) ভিতরের দিকে (১৪নং চিত্র, p)



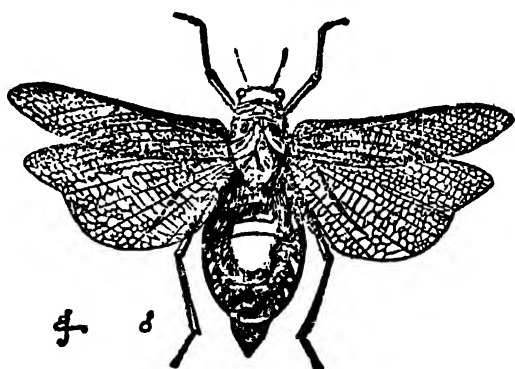
১৪নং ছবি—স্টেনোবোথ্রাস প্র্যাটোরাম-এর (Stenobothrus pratorum) পিছনের
পা ; p—লবঙ্গসৃষ্টকারী অংশ।

নীচের ছবি : ওই অংশটি গঠনকারী দাঁতের সারি—অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে
(ল্যাপ্লেয়ার গ্রন্থ থেকে নেওয়া)

লম্বালম্বিভাবে একসারি ক্ষুদ্রাকার, স্ফুদ্র, শল্যচিকিৎসকের ছুরিকাভূল্য (lancet) এবং স্থিতিস্থাপক (elastic) চরিত্রের দাঁত থাকে। সংখ্যায় এগুলো ৮৫ থেকে

৮। মিঃ ওয়াল-শ-ও আমাদের জানিয়েছেন যে প্যাটিফাইলাম কংকেভাম (Platyphyllum concavum) প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গরা বন্দী হলে “একটি পক্ষাবরণীকে অন্য পক্ষাবরণীটির সঙ্গে ঘষে একরকম ক্ষীণ ও কর্কশ শব্দ সৃষ্টি করে।”

১৩-টা পর্যন্ত হয়ে থাকে। পক্ষাবরণীর তীক্ষ্ণ ও অভিক্ষিপ্ত নার্ভারগুলোর ওপরে বসিত হয় এই দাঁতগুলো আর তার ফলে এই নার্ভারগুলো স্পন্দিত ও অস্বরণিত হয়। হ্যারিস বলেছেন—কোনও পুরুষ-পতঙ্গ যখন শব্দ সৃষ্টি করতে শুরু করে, তখন সে প্রথমে “পিছনের পায়ের নলিটাকে (shank) উরুর নীচে ঘুড়ে রাখে, সেখানে একটা খাঁজের মধ্যে আশ্রয় পায় নলিটা (নলিটাকে নিখুঁতভাবে গ্রহণ করতে পারার হাঁচাই গড়ে উঠেছে এই খাঁজটা), অতঃপর পা-টাকে দ্রুত ওঠাতে-নামাতে শুরু করে সে। দুটো বেহালাকে কখনোই একসঙ্গে বাজায় না সে, বাজায় পালা করে—প্রথমে একটাকে, তারপর অন্যটাকে।” অনেক প্রজাতির পতঙ্গদের পেটের নীচের দিকে একটা বড় গর্তের মতন কাঁপা জায়গা থাকে যা অস্বরণের কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন



১৫নং ছবি—নিউমোরা (ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত নমুনা থেকে গৃহীত)। ওপরের ছবিটি পুরুষ-পতঙ্গের, নীচের ছবিটি স্ত্রী-পতঙ্গের।

করে থাকে বলেই মনে হয়। এই বর্গেরই একটি দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতির নাম নিউমোরা (Pneumora, ১৫নং চিত্র)। এদের ক্ষেত্রে একটা নতুন ও

উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করি আমরা। এদের পুরুষ-পতঙ্গদের পেটের উভয় দিক থেকেই একটা করে খাঁজ-কাটা অংশ তির্যকভাবে সামনের দিকে বেরিয়ে থাকে এবং পিছনদিকের উর্বাস্থিগুলি এই অংশটিতেই ঘষিত হয়। এদের পুরুষ-পতঙ্গদের ডানা থাকে (স্ত্রী-পতঙ্গদের কোনও ডানা থাকে না) বলে ব্যাপারটা আরও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, কারণ অল্প পতঙ্গদের ক্ষেত্রে যেমন উরুর সঙ্গে পক্ষাবরণীর ঘর্ষণ হয় এদের ক্ষেত্রে তা হয় না। তবে এদের পিছনের পা-গুলো অত্যন্ত ছোট হওয়ার দরুনই এমনটা ঘটে থাকে—তা-ও হতে পারে। এদের উরুর ভিতরের দিকটা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ আমি পাইনি। তবে অল্পাল্প পতঙ্গদের নজির দিয়ে বিচার করলে ধরে নেওয়া যায় যে এদের উরুর ভিতরের দিকেও স্ফন্দ খাঁজ-কাটা থাকে। অর্থোপ্টেরা বর্গের অল্প যে-কোনও পতঙ্গের তুলনায় নিউমোরা প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে শব্দ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনেক বেশি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এদের পুরুষ-পতঙ্গদের গোটা শরীরটাই শব্দ বা সঙ্গীত সৃষ্টির একটা যন্ত্রের রূপ নিয়েছে যেখানে বাতাস ঢুকলে কোনও শূন্য থলির মতোই তা ফুলে ওঠে এবং তার ফলে অনুরণনটাও জোরদার হয়ে ওঠে। মিঃ ট্রিমেন আমাকে জানিয়েছেন যে উত্তমাশা অন্তরীপে এইসব পতঙ্গরা রাত্রিবেলায় ভারি সুন্দর শব্দ সৃষ্টি করে থাকে।

উপরোক্ত তিনটি বর্গেরই স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরে শব্দ বা সঙ্গীত সৃষ্টির উপযোগী কোনও অঙ্গ সাধারণত থাকে না। তবে এই নিয়মের ছ-একটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন ডঃ গ্রুবার বলেছেন এফিপিগার ভিটিয়াম (*Ephippiger vitium*) প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের শরীরেই শব্দসৃষ্টির উপযোগী অঙ্গ থাকে, তবে স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গদের এই অঙ্গটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে এমনটা ধরে নেওয়া যায় না যে ওই অঙ্গটি পুরুষ-পতঙ্গদের কাছ থেকেই সঞ্চারিত হয়েছে স্ত্রী-পতঙ্গদের মধ্যে (অল্প অনেক প্রাণীদের অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে যেমনটা ঘটে থাকে)। ওই অঙ্গটা নিশ্চয়ই উভয় লিঙ্গের পতঙ্গদের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবেই বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে সঙ্গমের মরসুমে এদের পুরুষ ও স্ত্রী-পতঙ্গরা এই শব্দের সাহায্যে পরস্পরকে কাছে ডাকে। লোকাটিডে বর্গের অল্প অধিকাংশ পতঙ্গদের মধ্যে (তবে ল্যাণ্ডোয়ার মতাহুসারে ডেকটিকাসদের মধ্যে নয়) দেখা যায় পুরুষদের শব্দসৃষ্টির অঙ্গের প্রাথমিক রূপটুকু স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরে বিद्यমান থাকে। এক্ষেত্রে খুব সম্ভবত পুরুষ-পতঙ্গদের থেকেই ওই অঙ্গটা স্ত্রী-পতঙ্গদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। অ্যাকাটিডে বর্গের স্ত্রী-পতঙ্গদের পক্ষাবরণীর ওপর দিকে এবং অ্যাক্রিডিডে বর্গের স্ত্রী-পতঙ্গদের উর্বাস্থিতে এই ধরনের প্রাথমিক অঙ্গের অস্তিত্ব লক্ষ্য

করেছেন ল্যাণ্ডোয়া। হোমোপ্টেরা শ্রেণীর স্ত্রী-প্রাণীদের শরীরেও শব্দ বা সঙ্গীত সৃষ্টির উপযোগী অঙ্গ থাকে, তবে তা থাকে একেবারে নিষ্ক্রিয় অবস্থায়, কোনও কাজে লাগে না। প্রাণিজগতের অন্যান্য শাখাগুলির মধ্যেও এমন বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে পুরুষ-প্রাণীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন অঙ্গ স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যেও প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের কথা উল্লেখ করেছেন ল্যাণ্ডোয়া। তিনি বলেছেন যে, অ্যাক্রিডিডে বর্গের স্ত্রী-পতঙ্গদের উর্বাস্থিতে শব্দসৃষ্টিকারী দাঁতগুলো সারা জীবন সেই অবস্থাতেই রয়ে যায় যে-অবস্থায় সেগুলো শূন্যকীট অবস্থায় প্রথম দেখা দেয় উভয় লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে। অতীতকালে, পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে ওই দাঁতগুলো বিকশিত হয়েই চলে এবং শেষবার নির্মোচনের পর যখন তার। সম্পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রজননক্ষম হয়ে ওঠে তখন ওই দাঁতগুলোও একেবারে নিখুঁত চেহারা নিয়ে সুষ্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উল্লিখিত তথ্যসমূহ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্থোপ্টেরা শ্রেণীর পুরুষ-পতঙ্গরা বিভিন্ন উপায়ে শব্দসৃষ্টি করে থাকে এবং হোমোপ্টেরা শ্রেণীর পুরুষ-পতঙ্গদের শব্দসৃষ্টির উপায়ের থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক।^৯ প্রাণিজগতের সর্বত্রই আমরা লক্ষ করি যে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বিভিন্ন উপায়ের সাহায্যে এই একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে থাকে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এইসব প্রাণীদের সমগ্র গঠনকাঠামোটা য় বহুবিধ পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং সম্ভবত মেটাই এই বিভিন্নতার মূল কারণ। শরীরের এক-একটা অংশে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক-একটা পরিবর্তন শব্দসৃষ্টির পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। অর্থোপ্টেরা শ্রেণীর তিনটি বর্গ ও হোমোপ্টেরা শ্রেণীর পতঙ্গদের শব্দসৃষ্টির উপায়ের বিভিন্নতা থেকে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি স্ত্রী-পতঙ্গদের ডাকা বা তাদের প্রলুব্ধ করার জন্য পুরুষ-পতঙ্গদের পক্ষে এই অঙ্গগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থোপ্টেরাদের মধ্যে এই অঙ্গগুলোর ব্যাপারে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে তা আজ আর আমাদের বিস্মিত করে না, কারণ ডঃ স্কাডার-এর আবিষ্কার আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে এইসব পরিবর্তন একদিনে ঘটেনি, ঘটেছে দীর্ঘ সময় ধরে। নিউ ব্রান্সউইক-এর ডেভোনিয়ান (Devonian, ভূতাত্ত্বিক যুগ যা মোটামুটিভাবে ৩২৫ থেকে ৩৪৫ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল) স্তরসমষ্টি থেকে সম্প্রতি একটি পতঙ্গের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন ডঃ স্কাডার। দেখা গেছে পতঙ্গটির শরীরে “পুরুষ-লোকাপ্তিডেদের সেই সুপরিচিত বাণ্যযন্ত্র বা শব্দসৃষ্টির অঙ্গটি বিদ্যমান।”

৯। সম্প্রতি অর্থোপ্টেরা শ্রেণীর কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে এমন কিছু প্রাথমিক অঙ্গের সম্ভান পেয়েছেন ল্যাণ্ডোয়া যেগুলো হোমোপ্টেরা শ্রেণীর পতঙ্গদের শব্দসৃষ্টির অঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত। ঘটনাটা রীতিমতো বিস্ময়কর।

পতঙ্গটি যে বহুলাংশে নিউরোপ্টেরা শ্রেণীর পতঙ্গদের সদৃশ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেইসঙ্গেই নিউরোপ্টেরা ও অর্থোপ্টেরা শ্রেণীর পতঙ্গদেরকে একত্রে গ্রহণিতও করে দিয়েছে পতঙ্গটি (অতি প্রাচীন যুগের বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা প্রায়শই চোখে পড়ে)।

অর্থোপ্টেরা শ্রেণীর পতঙ্গদের ব্যাপারে আর অল্প কয়েকটা কথাই বলার আছে। এদের কয়েকটি প্রজাতির পতঙ্গরা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় হয়। দুটি পুরুষ মেঠো-ঝিঁঝিঁপোকা (*Gryllus campestris*) এক জায়গায় আটকা পড়লে তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দেয় এবং কোনও-একজন মারানো-যাওয়া অবধি সে-লড়াই বন্ধ হয় না। মাটিস (*Mantis*) প্রজাতির পতঙ্গরা তাদের সামনের দিকের তরবারির মতো প্রত্যঙ্গের সাহায্যে মারামারি করে, যেভাবে তরবারির সাহায্যে যুদ্ধ করে অস্বারোহী সৈনিকরা। চীনারা এইসব পতঙ্গদেরকে বাঁশের তৈরি ছোট ছোট খাচায় আটকে রাখে এবং লড়ায়ে-মোরগদের মতো এদের মধ্যেও বাছাই করে মিলন ঘটায়। গাভ্রবর্ণের ব্যাপারে বলা যায়—কয়েক ধরনের পঙ্গপালদের শরীরে চমৎকার অঙ্গসজ্জা থাকে। এদের পিছনের ডানাগুলো লাল, নীল ও কালো রঙে চিত্রিত হয়। কিন্তু যেহেতু এই গোটা শ্রেণীটার কোনও প্রজাতির ক্ষেত্রেই স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গদের গাভ্রবর্ণের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না, সেহেতু এদের গায়ের ওই উজ্জল রঙটাকে যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবে ধরে নেওয়ারও কোনও কারণ থাকে না। উজ্জল গাভ্রবর্ণটা হয়তো এইসব পতঙ্গদের জীবনে একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে, কারণ ওই গাভ্রবর্ণ অন্যদেরকে জানিয়ে দেয় যে খাণ্ড হিসেবে এরা মোটেই রুচিকর হবে না। নানা জাতের পাখি ও টিকটিকিদের সামনে এক জাতের উজ্জল রঙের ইণ্ডিয়ান পঙ্গপালকে খাণ্ড হিসেবে এগিয়ে দিয়ে দেখা গেছে ওইসব পাখি বা টিকটিকিরা কখনোই তাদেরকে খাণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেনি। তবে এই শ্রেণীর কয়েকটি প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। এক জাতের আমেরিকান ঝিঁঝিঁপোকাদের^{১০} পুরুষদের গায়ের রঙ একেবারে হাতির দাঁতের মতন সাদা হয়, কিন্তু এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের গায়ের রঙ সাদাটে থেকে শুরু করে সবুজাভ-হলুদ অথবা দীর্ঘ কাল্চে হয়ে থাকে। মিঃ ওয়াল্শ আমাকে জানিয়েছেন যে স্পেকট্রাম ফিমোরেটাম (*Spectrum femoratum*—ফাসমিডে বর্ণের এক ধরনের পতঙ্গ) প্রজাতির পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের গায়ের রঙ উজ্জল বাদামি-হলুদ হয় আর পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-পতঙ্গদের গায়ের রঙ হয় খানিকটা

১০। ইক্যান্থাস নিভালিস (*Oecanthus nivalis*)। হ্যারিস, “ইনসেক্টস অফ নিউ ইংল্যান্ড”, পৃঃ ১২৪। ভিক্টর ক্যারুস আমাকে জানিয়েছেন যে ইউরোপের ইক্যান্থাস পেল্লুসিডাস (*Oecanthus pellucidus*) প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যেও একইরকম পার্থক্য থাকে।

ফ্যাকাশে, আবছা, ধূসর বাদামি ধরনের। উভয় লিঙ্গেরই অল্পবয়সী পতঙ্গদের গায়ের রঙ হয় সবুজ।” শেষত উল্লেখ করা যায় এক ধরনের ‘কিংকিং’ পোকাদের কথা। এদের পুরুষ-পতঙ্গদের “একটা দীর্ঘ ঝিল্লিময় উপাঙ্গ থাকে যেটা তাদের মুখের ওপর ঘোমটার মতো পড়ে থাকে।” তবে এই উপাঙ্গটা এদের কোন কাজে লাগে, তা আমাদের জানা নেই।

নিউরোপ্টেরা (Neuroptera) শ্রেণী। এদের ব্যাপারে এখানে বিশেষ কিছু বলার দরকার নেই, শুধু গায়ের রঙের বিষয়টা ছাড়া। এদের এফিমেরিডে (Ephemeridae) বর্গের পতঙ্গদের স্ত্রী-পুরুষের গাত্রবর্ণের আভাষ সামান্য পার্থক্য থাকে, কিন্তু তার দরুন যে পুরুষ-পতঙ্গরা স্ত্রী-পতঙ্গদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এমন কথা বলা চলে না। লাইবেলুলিডে (Libellulidae) বা গয়াল-পোকাদের শরীর উজ্জ্বল সবুজ, নীল, হলুদ এবং সিঁচুররঙা আভাষ সম্বিজিত হয়। এদের স্ত্রী-পুরুষের গায়ের রঙে কিছু পার্থক্যও প্রায়শই চোখে পড়ে। অধ্যাপক ওয়েস্টউড বলেছেন, অ্যাগ্রিয়নিডে (Agrionidae) বর্গের কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের “গাত্রবর্ণ ঘন নীল এবং ডানাগুলি কালো রঙের হয়, অত্যাধিক এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের গাত্রবর্ণ হয় হালকা সবুজ এবং তাদের ডানায় কোনও রঙ থাকে না।” আবার অ্যাগ্রিয়ন র্যাম্বুরি (Agrion Ramburii) প্রজাতির পতঙ্গদের ক্ষেত্রে রঙের এই ব্যাপারটা ঠিক উলটো হয়। উত্তর আমেরিকার হেটেরিনা (Hetaerina) বর্গের পতঙ্গদের ক্ষেত্রে একমাত্র পুরুষ-পতঙ্গদেরই হু-ডানার নীচের দিকে একটা করে গাঢ় লাল বিন্দু থাকে। অ্যানাক্স জুনিয়াস (Anax Junius) প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের পেটের নীচের দিকটা ঘন সাগর-নীল রঙের হয় আর স্ত্রী-পতঙ্গদের ক্ষেত্রে এই রঙটা হয় ঘাসের মতো সবুজ। অত্যাধিক, এদের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত গম্ফাস (Gomphus) বর্গের এবং অত্যাধিক আরও কয়েকটি বর্গের স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙে তেমন কোনও পার্থক্য থাকে না। গোটা প্রাণিজগতের সর্বত্রই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য অথবা সামান্য পার্থক্য কিংবা একেবারেই কোনও পার্থক্য না-থাকার ঘটনা আকর্ষণীয় চোখে পড়ে। লাইবেলুলিডেদের অনেক প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙে বিস্তার পার্থক্য থাকলেও এদের স্ত্রী-পতঙ্গদেরকে দেখতে বেশি সুন্দর নাকি পুরুষ-পতঙ্গদের, তা বলা প্রায়শই বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একটু আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে অ্যাগ্রিয়নদের একটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গদের স্বাভাবিক গাত্রবর্ণটা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। এইসব পতঙ্গদের কারুর ক্ষেত্রেই গায়ের রঙটা তাদের রক্ষাকবচ হিসেবে অজিত হয়েছে বলে মনে হয় না। এই বর্গের পতঙ্গদেরকে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ

করেছেন মি: ম্যাকলাখ্‌লান। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে পাখি অথবা অন্যান্য শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প যে-কোনও পতঙ্গের চেয়ে গয়াল-পোকাদের (যাদেরকে পতঙ্গ-জগতের বাদশা বলা যায়) অনেক কম থাকে এবং তাঁর মতে এদের গায়ের উজ্জ্বল রঙটা যৌন আকর্ষণ হিসেবেই কাজ করে। কিছু কিছু গয়াল-পোকা বিশেষ বিশেষ রঙের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। মি: প্যাটারসন দেখেছিলেন অ্যাগ্রিয়নিডেরা, যাদের পুরুষদের গায়ের রঙ নীল হয়, তারা দল বেঁধে জমায়েত হত একটা মাছধরা জাহাজের নীলরঙা ভেলার ওপরে, আবার ওইখানেই অল্প দুটি প্রজাতির পতঙ্গরা উজ্জ্বল সাদা রঙের দ্বারা আকৃষ্ট হত।

স্কেলভার-ই (Schelver) প্রথম লক্ষ করেন যে দুটি উপ-বর্গের কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গরা যখন পুতুলি (Pupa) অবস্থা থেকে প্রথম বেরিয়ে আসে তখন তাদের গায়ের রঙ ঠিক স্ত্রী-প্রাণীদের মতোই থাকে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাদের গায়ের রঙটা হুধে-নীল বর্ণের হয়ে ওঠে—ইথারে ও অ্যালকোহলে দ্রবণীয় এক ধরনের তেল তাদের শরীর থেকে ঝরে যায় বলেই এই ঘটনাটা ঘটে। মি: ম্যাকলাখ্‌লান-এর মতে, লাইবেলুলা ডিপ্রেসা (Libellula depressa) প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙের এই পরিবর্তনটা ঘটে তাদের রূপান্তরের অন্তত পনেরো দিন পরে, যখন স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গরা মিলনের জন্য তৈরি হয়ে ওঠে।

ব্রাউয়ার-এর (Brauer) মতে, নিউরোথেমিস-দের (Neurothemis) কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে এক ধরনের দ্বিরূপতা লক্ষ করা যায়। এদের কিছু কিছু স্ত্রী-পতঙ্গের শরীরে সাধারণ ডানা থাকে, আবার অল্প কিছু স্ত্রী-পতঙ্গের ডানাগুলো “ওই প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের ডানার মতো প্রচুর শিরাবিশিষ্ট হয়।” এই ঘটনাটিকে ব্রাউয়ার “ব্যাখ্যা করেছেন ডারউইনীয় নীতির সাহায্যে। তাঁর মতে এইভাবে পাশাপাশি প্রচুর শিরা উঠে থাকাটা এদের পুরুষদের একটা অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্য যা সাধারণ নিয়ম অনুসারে সমস্ত স্ত্রী-পতঙ্গদের মধ্যে সঞ্চারিত না হয়ে আকস্মিকভাবে তাদের কয়েকজনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে।” অ্যাগ্রিয়নদের কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে দ্বিরূপতার আর-একটি দৃষ্টান্তের কথা আমাকে জানিয়েছেন মি: ম্যাকলাখ্‌লান। এদের কিছু কিছু পতঙ্গের গাত্রবর্ণ কমলা রঙের হয় এবং এই পতঙ্গরা সর্বদাই স্ত্রী-পতঙ্গ হয়ে থাকে। খুব সম্ভবত এটা পূর্বানুবৃত্তির (reversion) একটা উদাহরণ, কারণ প্রকৃত লাইবেলুলেদের উভয় লিঙ্গের পতঙ্গদের গাত্রবর্ণ যখন আলাদা হয় তখন স্ত্রী-পতঙ্গদের গায়ের রঙ কমলা বা হলুদ হয়ে থাকে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে অ্যাগ্রিয়নরা এমন কোনও আদিক্রম থেকে উদ্ভূত হয়েছে যাদের সঙ্গে যৌন বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে প্রকৃত লাইবেলুলে-দের সাদৃশ্য ছিল, তাহলে এইভাবে

পরিবর্তিত হওয়ার প্রবণতাটা শুধুমাত্র জ্বী-প্রাণীদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকার মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার মতো আর কিছু থাকে না।

বেশির ভাগ গয়াল-পোকাই যে আকারে বড়, শক্তিশালী ও হিংস্র প্রকৃতির হয়, তা ঠিক। কিন্তু একমাত্র অ্যাট্রিয়নদের কয়েকটি ক্ষুদ্রতর প্রজাতি ছাড়া এদের আর কোনও প্রজাতির পুরুষদেরকে নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে দেখেননি যিঃ ম্যাক্‌লাথলান। এই শ্রেণীর আর-একটি বর্গ হল টারমাইট (Termite) বা উইপোকা। এরা যখন দল বেঁধে কোথাও বাস করে, তখন প্রায়শই এদের জ্বী-পুরুষ উভয়কেই ছুটে বেড়াতে দেখা যায়—“পুরুষ-পোকারা ছোটো জ্বী-পোকাদের পিছনে, কখনও-কখনও দুটি পুরুষ-পোকা ধাওয়া করে একটি জ্বী-পোকাকে এবং তাকে জয় করার জন্য ব্যগ্রভাবে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয় ওই পুরুষ-পোকারা।” অ্যাট্রোপোস পালসেটোরিয়াস (Atropos pulsatorius) প্রজাতির পতঙ্গরা চোয়ালের সাহায্যে একরকম শব্দ সৃষ্টি করে এবং ওই প্রজাতির অন্য পতঙ্গরা সেই শব্দের উত্তর দেয়।

হাইমেনোপ্টেরা (Hymenoptera) শ্রেণী। সার্সেরিস-দের (Cerceris, বোলতার মতো এক ধরনের পতঙ্গ) অভ্যাস-আচরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সেই অভুলনীয় পর্যবেক্ষক মঁসিয়ে ফেব্র বলেছেন, “কোনও বিশেষ জ্বী-পতঙ্গকে দখল করার জন্য পুরুষ-পতঙ্গরা হামেশাই নিজেদের মধ্যে মারামারিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। জ্বী-পতঙ্গটি এই যুদ্ধের আপাত নিষ্পৃহ দর্শক হয়ে বসে থাকে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিজয়ী পুরুষটির সঙ্গে উড়তে উড়তে চলে যায় সে।” ওয়েস্টউড বলেছেন, এক ধরনের করাতে-মাছির (Tenthredinae) “চোয়াল বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে।” মঁসিয়ে ফেব্র-এর কাছ থেকে আমরা জেনেছি কোনও বিশেষ জ্বী-পতঙ্গকে দখল করার জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারিতে লিপ্ত হয় পুরুষ-সার্সেরিসরা। তাঁর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে রাখা দরকার যে এই শ্রেণীর পতঙ্গরা দীর্ঘ অদর্শনের পরও পরস্পরকে চিনে নিতে পারে এবং পরস্পরের প্রতি এদের আকর্ষণও খুব গভীর হয়। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা পিয়ের হবার-এর কথা উল্লেখ করতে পারি, পর্যবেক্ষক হিসেবে ঋষি নৈপুণ্য প্রস্রাভীত। কতকগুলি পিপড়েকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন হবার। চার মাস পরে তাদেরকে আবার এক জায়গায় আনেন তিনি। অতদিন পরেও পরস্পরকে চিনতে পারে তারা এবং একে অপরকে ছল দিয়ে আদর করতে থাকে। পরস্পরের অপরিচিত হলে তারা কী করত? নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে দিত। পিপড়াদের দুটো দলের মধ্যে যখন যুদ্ধ হয়, তখন অনেক সময় একই দলের পিপড়েরা ভুল করে একে অপরকে আক্রমণ

করে বসে। কিন্তু ভুলটা উপলব্ধি করতে মোটেই দেরি হয় না তাদের, তখন পরস্পরকে সাধনা দেয় তারা।

এই শ্রেণীর স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে গাভবর্ণের সামান্য কিছু পার্থক্য থাকে ঠিকই, কিন্তু একমাত্র মোমাছি বর্ণের পতঙ্গরা ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটা কখনোই খুব নজরে পড়ার মতো হয় না। তবে এদের কয়েকটি বর্ণের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই গায়ের রঙ এত চমৎকার হয় [যেমন থাইসিস-দের (*Chrysis*) মধ্যে, যাদের গায়ে সিঁছরে ও সবুজ রঙ থাকে] যে এটাকে যৌন নির্বাচনের ফল হিসেবে ধরে নেওয়াই যায়। মিঃ ওয়াল্শ্-এর মতে ইখ্‌নিউ-মোনিডে-দের (*Ichneumonidae*), প্রায় সব প্রজাতির ক্ষেত্রেই পুরুষ-পতঙ্গদের গাভবর্ণ স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে হালকা রঙের হয়। অন্তর্দিকে, টেনথ্রে ডিনিডে-দের পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙ স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে গাঢ় হয়ে থাকে। সাইরিসিডে (*Siricidae*) বর্ণের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙে প্রায়শই পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন, এদের সাইরেক্স জুবেনকাস (*Sirex Juvenicus*) প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ে কমলা রঙের ডোরা থাকে কিন্তু স্ত্রী-পতঙ্গদের রঙ হয় গাঢ় রক্তবর্ণ। তবে এদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে কাদের চাকচিক্য বেশি, তা বলা মুশকিল। ট্রেমেক্স কলাম্বো (*Tremex Columboe*) প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গদের গায়ের রঙ পুরুষ-পতঙ্গদের চেয়ে উজ্জলতর হয়। মিঃ এফ. স্মিথ আমাকে জানিয়েছেন যে বেশ কিছু প্রজাতির পুরুষ-পিঁপড়ের গায়ের রঙ কালো হয় আর স্ত্রী-পিঁপড়ের গায়ে কঠিন একটা আবরণ থাকে।

ওই পতঙ্গবিজ্ঞানীর (অর্থাৎ মিঃ এফ. স্মিথের) কাছ থেকেই আমি আরও জেনেছি যে মোমাছিদের বর্ণে, বিশেষত যে-সব প্রজাতির মোমাছির সমাজবদ্ধভাবে বাস করে না তাদের ক্ষেত্রে, স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙে প্রায়শই পার্থক্য থাকে। পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙ সাধারণত উজ্জলতর হয় এবং বহুসংখ্যক অ্যাপাথাস প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙ স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে অনেক বেশি পরিবর্তনশীল হয়। অ্যান্থোফোরা রেটুসা (*Anthophora retusa*) প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙ হয় তামাটে-বাদামি আর স্ত্রী-পতঙ্গদের রঙ পুরোপুরি কালো। জাইলোকোপা (*Xylocopa*) বর্ণের বেশ কিছু প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গদেরও গায়ের রঙ কালো হয় এবং এদের পুরুষ-পতঙ্গদের গাভবর্ণ হয় উজ্জল হলুদ রঙের। অন্তর্দিকে, কয়েকটি প্রজাতির, যেমন অ্যান্ড্রোনা ফাল্ভা (*Androena fulva*) প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গদের গায়ের রঙ পুরুষদের চেয়ে উজ্জলতর হয়ে থাকে। পুরুষ-পতঙ্গদের আত্মরক্ষার অন্ত কোনও উপায় থাকে না বলে তাদের আত্মরক্ষার কিছু-একটা উপায় দরকার হয় আর স্ত্রী-পতঙ্গরা তাদের ছলের সাহায্যে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে পারে বলে তাদের আত্মরক্ষার অন্ত কোনও উপায়ের দরকার হয় না—

গাত্রবর্ণের পার্থক্যের কারণটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়ে কোনও লাভ নেই। এইচ. মুলার, যিনি মোমাছিদের অভ্যাস-আচরণকে বিশেষভাবে পৰ্যবেক্ষণ করেছেন, তিনি বলেছেন যে এদের গায়ের রঙের এই পার্থক্যের প্রধান কারণ হল যৌন নির্বাচন। রঙের ব্যাপারে মোমাছিদের অল্পজ্ঞুতি যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মুলার বলেছেন, পুরুষ-মোমাছির। ব্যগ্রভাবে স্ত্রী-মোমাছিদের খুঁজে বেড়ায় এবং তাদেরকে দখল করার জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারিতে লিপ্ত হয়। তাঁর মতে, এইভাবে মারামারি করার দরুন কিছু কিছু প্রজাতির পুরুষ-মোমাছিদের চোয়াল স্ত্রী-মোমাছিদের চেয়ে আকারে বড় হয়ে গেছে। কোনও কোনও প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-মোমাছিদের চেয়ে পুরুষ-মোমাছির। সংখ্যায় অনেক বেশি হয়। এই সংখ্যাধিক্যটা হয় মরসুমের শুরুতেই দেখা দেয়, নয়তো সর্বদা ও সর্বত্রই বিদ্যমান থাকে, অথবা কোনও কোনও অঞ্চলে দেখা দেয়। এইরকম কিছু প্রজাতির কথা বাদ দিলে বাকি সব প্রজাতির মধ্যে কিন্তু আপাতভাবে স্ত্রী-মোমাছিদেরই সংখ্যাধিক্য থাকে। কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী-মোমাছির। অধিকতর সুন্দর পুরুষ-মোমাছিদেরকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়, আবার অন্য কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে পুরুষ-মোমাছির।ই বেছে নেয় অধিকতর সুন্দর স্ত্রী-মোমাছিদের। এর ফলস্বরূপ কয়েকটি বর্গের বেশ কিছু প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের দেখতে পরস্পরের থেকে অনেকটাই আলাদা হয় কিন্তু তাদের স্ত্রী-পতঙ্গদের মধ্যে প্রায় কোনও পার্থক্যই থাকে না, আবার অন্য কয়েকটি বর্গের ক্ষেত্রে এর ঠিক বিপরীত ঘটনাটাই চোখে পড়ে। এইচ. মুলার-এর মতে, কোনও-একটি লিঙ্গের পতঙ্গরা যৌন নির্বাচন মারফত যে গাত্রবর্ণটা অর্জন করেছে সেটা প্রায়শই কিছুটা পরিবর্তিত রূপে অন্য লিঙ্গের পতঙ্গদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে— ঠিক যেভাবে স্ত্রী-পতঙ্গদের পরাগ-সংগ্রাহক অঙ্গটি প্রায়শই সঞ্চারিত হয়ে থাকে পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে, যদিও এই অঙ্গটি ওই পুরুষ-পতঙ্গদের কোনও কাজেই লাগে না।^{১১}

১১। মঁসিয়ে পেরিয়ার তাঁর "la Selection sexuelle d' apres Darwin" ("Revue Scientifique", ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩, পৃঃ ৮৬৮) প্রবন্ধে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা না করেই একটি আপত্তি তুলেছেন। তাঁর মতে, সমাজবংশভাবে বসবাসকারী মোমাছিদের পুরুষ-পতঙ্গরা অ-নিষক্ত ডিম্বাণু থেকে জন্মায় বলে নিজেদের নতুন বৈশিষ্ট্যগুলো তারা তাদের পুরুষ-সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারে না। আপত্তিটা রীতিমতো বৈশ্বাস্কর। যে পুরুষ-মোমাছির মধ্যে উভয় লিঙ্গের মিলনকে সহজতর করে তোলার মতো কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে অথবা যা তাকে স্ত্রী-মোমাছির কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলে, তার স্ত্রীরা নিষক্ত কোনও স্ত্রী-মোমাছি এমন ডিমই প্রসব করবে যা থেকে কেবলমাত্র স্ত্রী-মোমাছিই জন্মাতে পারে। কিন্তু ওইসব ডিম থেকে জন্মানো স্ত্রী-মোমাছির। পরের বছর পুরুষ-মোমাছির। জন্ম দেবে। এ-রকম অবস্থায় ওই শ্রেণীতে পুরুষ-মোমাছির। তাদের পুরুষ-

মিউটিলি ইউরোপিয়া (*Mutilla Europaea*) প্রজাতির পতঙ্গরা এক ধরনের তীক্ষ্ণ ও কর্কশ শব্দ সৃষ্টি করে থাকে। গুরো-র (*Goureau*) মতে, এদের উভয় লিঙ্গের সদৃশদেরই শব্দ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে। তিনি আরও বলেছেন যে, পেটের তৃতীয় এবং তার পূর্ববর্তী অংশগুলোর ঘর্ষণের ফলেই এই শব্দটা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমি দেখেছি এদের শরীরের এই জায়গাগুলোয় খুব স্বল্প ও সমকেন্দ্র কিছু খাঁজ থাকে। তবে এদের বৃকের অভিক্ষিপ্ত অক্ষকাছি (*Collar*), যার মধ্যে মাথাটি গ্রন্থিবদ্ধ হয়, সেখানেও এ-রকম খাঁজ থাকে। এই অক্ষকাছিটির গায়ে ছুঁচের ডগা দিয়ে আঁচড় কাটলে ঠিক ওইরকমই একটা শব্দ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এদের পুরুষ-পতঙ্গদের ডানা থাকে কিন্তু স্ত্রী-পতঙ্গরা ডানাহীন হয়, অথচ উভয়েরই ওইভাবে শব্দ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে—ব্যাপারটা রীতিমতো বিস্ময়কর। এটা সুবিদিত যে গুঞ্জনের সাহায্যে মোমাছিরি নিজেদের বিভিন্ন আবেগ (যেমন, ক্রোধ) প্রকাশ করে থাকে। এইচ. ম্লার জানিয়েছেন, স্ত্রী-মোমাছিরির পিছনে ধাওয়া করার সময় কিছু কিছু প্রজাতির পুরুষ-মোমাছিরি এক ধরনের সুরেলা শব্দ সৃষ্টি করে থাকে।

কোলিওপ্টেরা (*কুবরে-পোকা জাতীয়*) শ্রেণী। এই শ্রেণীর কিছু প্রজাতির পতঙ্গদের গায়ের রঙ এমন হয় যার সঙ্গে মিল থাকে সেইসব জায়গার রঙের যে-সব জায়গায় তারা সাধারণত বেশি যাতায়াত করে। এর ফলে শত্রুরা তাদেরকে খুঁজে বার করতে পারে না। আবার অন্য কিছু প্রজাতির পতঙ্গদের, যেমন হীরক-কুবরেদের (*diamond-beetles*), শরীরে রঙের চমৎকার কারুকাজ থাকে—ডোরা, বিন্দু, ক্রশচিহ্ন এবং অন্যান্য মনোরম নকশায় সজ্জিত থাকে এদের সারা শরীর। একমাত্র কয়েক ধরনের পুষ্পভোজী প্রজাতি ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে গায়ের এই রঙটা তাদের আত্মরক্ষার কোনও প্রত্যক্ষ উপায় হিসেবে কাজ করে বলে মনে হয় না। তবে রঙটা কোনও সতর্কবার্তা হিসেবে কিংবা পরস্পরকে চিনে নেওয়ার উপায় হিসেবে একটা ভূমিকা হয়তো পালন করে থাকে—যেমনটা দেখা যায় জোনাকিদের

মাতামহদের বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করবে না—এমন কথা বলাটা কি বুদ্ধিসঙ্গত হবে? কিছুটা সমতুল অন্য সাধারণ প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়, দেখা যাক। সাদা রঙের কোনও চতুষ্পদ স্ত্রী-প্রাণী কিংবা সাদা রঙের কোনও স্ত্রী-পাখির সঙ্গে কালো গাধবর্ণ-বিশিষ্ট বগের কোনও পুরুষ-প্রাণী বা পুরুষ-পাখির বাদ মিলন ঘটে এবং তাদের মিলনজাত পুরুষ ও স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যেও বাদ মিলন ঘটে, তাহলে এই শেষোক্তদের সন্তানদের মধ্যে কি তাদের পুরুষ-মাতামহের কালো গাধবর্ণের কোনও উত্তরাধিকারই থাকবে না? প্রজননাক্ষম প্রাথমিক-মোমাছিরি কিভাবে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তা ব্যাখ্যা করা বোধেট দৃষ্টি ঠিকই, তবে এই প্রজননাক্ষম জীবেরা কিভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের শক্তির আওতার এসে পড়ে, তা আমি আমার “অরিজিন অফ স্পিসিস” গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করছি।

অনুপ্রভার (phosphorescence) ক্ষেত্রে । শুবরে-পোকাদের উভয় লিঙ্গের সদস্যদের গায়ের রঙ সাধারণত একইরকম হয়, কিন্তু এই রঙটা তারা যৌন নির্বাচন মারফত অর্জন করেছে কিনা তা আমাদের জানা নেই । তবে সেরকমটা হয়ে থাকা একেবারে অসম্ভব কিছুও নয়—কোনও-একটি লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যেই হয়তো প্রথমে দেখা দিয়েছিল রঙটা, তারপর তা সঞ্চারিত হয়েছে অন্য লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে । এদের যে-সব প্রজাতির মধ্যে অণ্ডাণ্ড স্পষ্ট অপ্রধান যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়, তাদের ক্ষেত্রেও এই ধারণাটা কতকাংশে সত্যি হতে পারে । মিঃ ওয়াটারহাউস, জুনিয়র, আমাকে জানিয়েছেন যে দৃষ্টিশক্তিহীন শুবরে-পোকারা, যারা পরস্পরের সৌন্দর্য অনুভব করার সুযোগ পায় না, তাদের গায়ে অনেকসময় একটা চক্চকে আন্তরণ থাকলেও কখনোই তারা উজ্জল গাত্রবর্ণের অধিকারী হয় না । তবে এরা সাধারণত গুহায় এবং অণ্ডাণ্ড অঙ্ককারাচ্ছন্ন জায়গায় বসবাস করে বলেই এদের গায়ে উজ্জল রঙ ফুটে ওঠে না—এমনটা হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয় ।

কয়েক ধরনের লংগিকর্ন (Longicorn), বিশেষত কয়েক ধরনের প্রায়োনিডে-দের (Prionidae) মধ্যে একটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়—এদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙ আলাদা আলাদা হয় । এইসব পতঙ্গদের অধিকাংশই আকারে বৃহৎ হয় এবং এদের গায়ে খুব উজ্জল রঙ থাকে । মিঃ বেটস-এর সংগ্রহশালায় আমি দেখেছি পাইরোড্‌স্‌ (Pyrodes)^{১২}

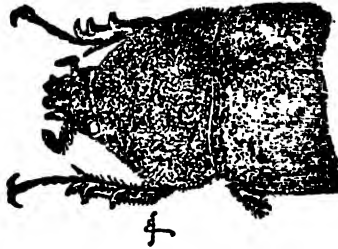
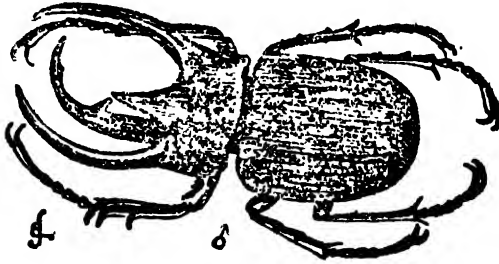
১২ । “Transact, Ent. Soc.”, ১৮৬৯, পৃঃ ৫০-এ মিঃ বেটস এই পাইরোড্‌স্‌ পাল-চৌরমাস-দের (Pyrodes pulcherrimus) কথা বর্ণনা করেছেন যাদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে রীতিমতো নজরে পড়ার মতো পার্থক্য থাকে । কোলওপুটেরা প্রাণীর অন্য যে-সব প্রজাতির স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে গাত্রবর্ণের পার্থক্য থাকার কথা আমার গোচরে এসেছে, তা থেকে কয়েকটা দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা যায় । কার্বি ও ম্পেস (“ইনট্রোডাকশন টু এনটোমোলজি”, খণ্ড ৩, পৃঃ ৩০৯) উল্লেখ করেছেন ক্যান্থারিস (Cantharis), মেলো (Meloe), র্যাগিয়াম (Rhagium) এবং লেপ্‌চুরা টেসটাসিয়া-দের (Leptura testacea) কথা । এই শ্রেণীতে প্রজাতিটির পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরে এবটা কঠিন আবরণ থাকে এবং বৃকট কালো রঙের হয়, আর স্ত্রী-পতঙ্গদের সারা শরীরটা অননুজ্জ্বল লাল রঙের হয়ে থাকে । শেষোক্ত দৃষ্টি প্রজাতির পতঙ্গরা লংগিকর্ন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত । মিঃ আর্. ট্রিমন এবং মিঃ ওয়াটারহাউস, জুনিয়র, আমাকে ল্যামেলিকর্ন (Lamellicorn) বর্ণের দৃষ্টি প্রজাতির পতঙ্গদের কথা জানিয়েছেন । এই দৃষ্টি প্রজাতি হল পেরিট্রিচিয়া (Peritrichia) ও ট্রাইখিয়াস (Trichius) । শেষোক্ত প্রজাতিটির পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙ স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে ফ্যাকাশে বা অননুজ্জ্বল হয়ে থাকে । টিলিয়াস ইলংগেটাস (Tillius elongatus) প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গরা কালো রঙের হয় আর স্ত্রী-পতঙ্গরা সর্বদাই গাঢ় নীল রঙের হয়ে থাকে এবং তাদের বৃকট হয় লাল রঙের । মিঃ ওয়ালাশ আমাকে জানিয়েছেন যে অর্সোডাকনা আট্রা (Orsodacna atra) প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গরাও কালো রঙের হয় এবং এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের (তথাকথিত O. ruficollis) বৃকট পিঙ্গল বর্ণের হয়ে থাকে ।

বর্গের পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙ স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে সাধারণত বেশি লাল হলেও এই রঙটা স্ত্রী-পতঙ্গদের তুলনায় কিছুটা অস্বচ্ছল হয় আর স্ত্রী-পতঙ্গদের গাত্রবর্ণ হয় কমবেশি উজ্জল সোনালি-সবুজ। অত্যাধিক, একটি প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গরা সোনালি-সবুজ রঙের হয় আর স্ত্রী-পতঙ্গদের গায়ে লাল ও বেগুনি-লাল রঙের উজ্জল আভা থাকে। এসমেরাল্ডা (*Esmeralda*) বর্গের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙে এত বেশি পার্থক্য থাকে যে এদেরকে পৃথক পৃথক প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এদের একটি প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই গায়ের রঙ হয় উজ্জল সবুজ, কিন্তু পুরুষ-পতঙ্গদের বুকের কাছটা লাল রঙের হয়ে থাকে। ওই প্রায়োনিডেদের, যাদের স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের গায়ের রঙে পার্থক্য থাকে, তাদের স্ত্রী-পতঙ্গদের গাত্রবর্ণ পুরুষ-পতঙ্গদের থেকে উজ্জল হয়। যৌন নির্বাচন মারফত অর্জিত গাত্রবর্ণের ব্যাপারে যে সাধারণ নিয়মটার অস্তিত্ব আমরা অত্যাধিক ক্ষেত্রে দেখতে পাই, তার সঙ্গে এদের এই ব্যাপারটা মোটেই সাযুজ্যপূর্ণ নয়।

অনেক ধরনের গুপ্ত-পোকাদের উভয় লিঙ্গের সদস্যদের মধ্যে একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্যের কথা এবার উল্লেখ করা যায়। এই পার্থক্যটা হল শুঙ্গের। পুরুষ-পতঙ্গদের মাথা ও বুক থেকে উদ্ভূত হয় এই বড় বড় শুঙ্গগুলো, কখনও-কখনও শরীরের নীচের দিক থেকেও উদ্ভূত হতে দেখা যায়। ল্যামেলিকর্ন বর্গের পতঙ্গদের এই শুঙ্গগুলোকে দেখতে অনেকটা হরিণ, গণ্ডার ইত্যাদি চতুষ্পদ প্রাণীদের শুঙ্গের মতো। নানান আকৃতির এই শুঙ্গগুলো দেখতেও খুব সুন্দর, মাগেও চমৎকার। এগুলোর বর্ণনা দেওয়ার বদলে এখানে আমি পুরুষ ও স্ত্রী-পতঙ্গ উভয়েরই কিছু উল্লেখযোগ্য শুঙ্গের ছবি পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করছি (১৬, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০নং চিত্র)। স্ত্রী-পতঙ্গদের মধ্যে শুঙ্গটা সাধারণত প্রাথমিক অঙ্গের আকারে থাকে যেটাকে দেখতে হয় ছোট কোনও গাঁটের মতো। আবার কোনও কোনও স্ত্রী-পতঙ্গের শরীরে এই শুঙ্গটা একেবারেই থাকে না, এমনকি প্রাথমিক অঙ্গের আকারেও নয়। অত্যাধিক, ফ্যানিউস ল্যান্সিফার (*Phanoeus lancifer*) প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের শরীরেই সুবিকশিত শুঙ্গ দেখা যায়। এই বর্গের অত্যাধিক প্রজাতির মধ্যে এবং কপ্ৰি-দের (*Copris*) মধ্যেও স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরে শুঙ্গ থাকে, তবে সেগুলোর বিকাশ একটু কম হয়। মিঃ বেটস আমাকে জানিয়েছেন যে এই বর্গের বিভিন্ন উপ-বিভাগের পতঙ্গদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নানারকম গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে ঠিকই, কিন্তু সেইসব পার্থক্যের সঙ্গে শুঙ্গগত পার্থক্যের কোনও সম্পর্ক নেই। যেমন, অন্থোফ্যাগাস (*Onthophagus*) বর্গের বিভিন্ন প্রজাতির দিকে তাকালে দেখা যায় কোনও-কোনও প্রজাতির পতঙ্গদের একটিমাত্র শুঙ্গ থাকে, আবার কোনও-কোনও প্রজাতির পতঙ্গরা দুটি শুঙ্গের

অধিকারী হয়।

প্রায় সবক্ষেত্রেই এই শুদ্ধগুলো অত্যন্ত পরিবর্তনশীল ধরনের হয়ে থাকে। সবাইকে ধরলে পুরো একটা ক্রম সাজানো যায়—অত্যন্ত সুবিকশিত শুদ্ধবিশিষ্ট পুরুষ-পতঙ্গদের থেকে শুরু করে একেবারে অল্পমত ধরনের শুদ্ধ-বিশিষ্ট পুরুষ-পতঙ্গ পর্যন্ত যাদেরকে স্ত্রী-পতঙ্গদের থেকে আলাদা করেই



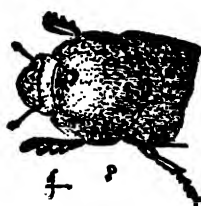
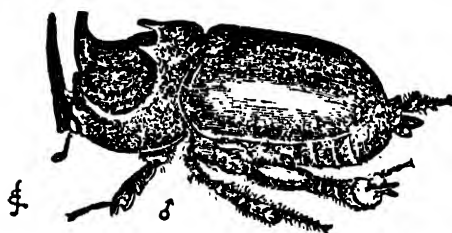
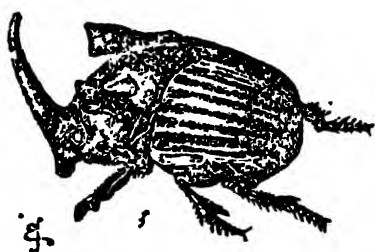
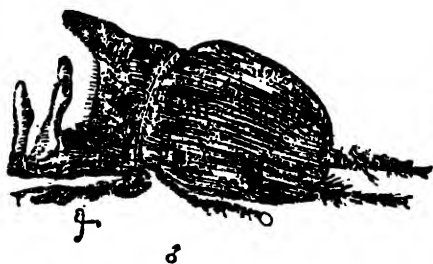
১৬নং ছবি—চালকোসোমা অ্যাটলাস (*Chalcosoma atlas*)।

ওপরের ছবিটি পুরুষ-পতঙ্গের (ছোট করে দেখানো হয়েছে),

নীচের ছবিটি স্ত্রী-পতঙ্গের (স্বাভাবিক আকারেই দেখানো হয়েছে)।

চেনাই দুঃসাধ্য। মিঃ ওয়ালশ্ দেখেছেন যে ফ্যানিউস কারনিফেক্স (*Phanoeus carnifex*) প্রজাতির কয়েকটি পুরুষ-পতঙ্গের শুদ্ধ ওই প্রজাতির অন্য পুরুষ-পতঙ্গদের শুদ্ধের চেয়ে প্রায় তিনগুণ লম্বা হয়। অন্থোফ্যাগাস র্যাংগিফার (২০নং চিত্র) প্রজাতির প্রায় একশোটি পুরুষ-পতঙ্গকে পরীক্ষা করে মিঃ বেটস ভেবেছিলেন যে অবশেষে তিনি এমন একটি প্রজাতির সম্ভান পেয়েছেন যাদের পুরুষ-পতঙ্গদের শুদ্ধের মধ্যে কোনওরকম ফারাক থাকে না। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় তাঁর ধারণাটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

শুদ্ধগুলোর অস্বাভাবিক মাপ এবং ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শুদ্ধের উপস্থিতি—এই দুটো ঘটনা থেকে মনে হয় বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল শুদ্ধগুলো। আবার একই প্রজাতির পুরুষদের মধ্যে শুদ্ধের ব্যাপারে ব্যাপক পার্থক্য থাকে আর তা থেকে মনে হয় যে ওই উদ্দেশ্যটা কোনওভাবেই সুনির্দিষ্ট কোনও উদ্দেশ্য নয়। শুদ্ধগুলোতে কোনওরকম বর্ষণের চিহ্ন থাকে না, দেখলে মনে হয় নিতান্ত



১৭নং ছবি—কোপ্ৰিস আইসিডিস (*Copris isidis*) ।

ব'াদিকের ছবি পুরুষ-পতঙ্গের, ডানাদিকের ছবি স্ত্রী-পতঙ্গের ।

১৮নং ছবি—ফ্যানিউস ফনাস (*Phanaeus faunus*) ।

ব'াদিকের ছবি পুরুষ-পতঙ্গের, ডানাদিকের ছবি স্ত্রী-পতঙ্গের ।

১৯নং ছবি—ডাইপেলিকাস ক্যান্টোরি (*Dipelicus cantori*) ।

ব'াদিকের ছবি পুরুষ-পতঙ্গের, ডানাদিকের ছবি স্ত্রী-পতঙ্গের ।

২০নং ছবি—অন্থোফ্যাগাস র্যাংগিফার (*Onthophagus rangifer*—বড় করে দেখানো হয়েছে) ।

ব'াদিকের ছবি পুরুষ-পতঙ্গের, ডানাদিকের ছবি স্ত্রী-পতঙ্গের ।

সাধারণ কিছু কাজেই ব্যবহৃত হয় ওগুলো। কাকর কাকর মতে, পুরুষ-পতঙ্গদেরকে জ্বী-পতঙ্গদের চেয়ে বেশি ঘুরে বেড়াতে হয় বলে শত্রুদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য শত্রুদের দরকার হয় তাদের। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই এই শত্রুগুলো ভোঁতা ধরনের হয়, ফলে এগুলোকে আত্মরক্ষার উপযুক্ত অস্ত্র হিসেবে মেনে নেওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। আবার অন্য অনেকের মতে, নিজেদের মধ্যে মারামারি করার জন্যই পুরুষদের শরীরে এই শত্রুগুলো থাকে। কিন্তু এইসব পুরুষ-পতঙ্গদেরকে কখনোই নিজেদের মধ্যে মারামারিতে লিপ্ত হতে দেখা যায়নি। এদের অসংখ্য প্রজাতিকে সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করেছেন মিঃ বেটস, কিন্তু নিজেদের মধ্যে মারামারির ফলে এদের শুঙ্গ ছিঁড়ে যাওয়ার বা ভেঙে যাওয়ার কোনও প্রমাণ তিনি খুঁজে পাননি। পুরুষ-পতঙ্গরা যদি স্বভাবগতভাবেই মারকুটে হত, তাহলে খুব সম্ভবত যৌন নিবাচন মারফত তাদের শরীরগুলো বড় হয়ে উঠত যাতে করে তারা জ্বী-পতঙ্গদের চেয়ে আকারে বৃহত্তর হতে পারে। কিন্তু কোপ্রাইডে (Copridae) বর্গের শতাধিক প্রজাতির জ্বী ও পুরুষ-পতঙ্গদের পরীক্ষা করে তাদের মধ্যে আকারগত কোনও পার্থক্যের নজির মিঃ বেটস খুঁজে পাননি। আবার, লেথ্রাস (Lethrus—ল্যামেলিকর্ন শ্রেণীর অন্তর্গত এক ধরনের গুবরে-পোকা) প্রজাতির পুরুষরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করলেও তাদের কোনও শুঙ্গ থাকে না, যদিও জ্বী-পতঙ্গদের তুলনায় তাদের চোয়াল অনেক বড় হয়।

এদের শুঙ্গগুলো অত্যন্ত সুবিকশিত হয় অথচ এই বিকাশ সবক্ষেত্রে একই নিয়ম মেনে ঘটে না, যার প্রমাণ পাওয়া যায় একই প্রজাতির মধ্যে নানা ধরনের শুঙ্গের উপস্থিতি থেকে এবং ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে পৃথক পৃথক ধরনের শুঙ্গের উপস্থিতি থেকে। এই তথ্যকে সামনে রেখে বিচার করলে সবথেকে সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত একটাই হতে পারে—শুঙ্গগুলো তারা অর্জন করেছিল অঙ্গসম্বন্ধ হিসেবেই। প্রথম দর্শনে এই মতটাকে একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয়, কিন্তু এদের চেয়ে অনেক উচ্চতর শ্রেণীর বিভিন্ন প্রাণী, যেমন মাছ, উভচর, সরীসৃপ ও পাখিদের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই যে এদের বিভিন্ন ধরনের ঝুঁটি, গাঁট, শুঙ্গ, চূড়া ইত্যাদিও ঠিক এই উদ্দেশ্যেই অর্জিত হয়েছে।

ওনাইটিস ফার্সিফার (Onitis fuscifer, ২:১৯ চিত্র) প্রজাতির এবং এই বর্গের আরও কয়েকটি প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের সামনের উর্বাংশে একটা বিচিত্র ধরনের অভিক্ষিপ্ত অংশ থাকে এবং বৃকের নীচের দিকে থাকে একটা বিশালাকার কাঁটা অথবা একজোড়া শুঙ্গ। অন্যান্য পতঙ্গদের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী বিচার করলে মনে হয়—জ্বী-পতঙ্গদেরকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরার কাজে এগুলো তাদের সাহায্য করে থাকে। পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরের উর্বাংশে শুঙ্গের

কোনও চিহ্নমাত্রও থাকে না, কিন্তু স্ত্রী-পতঙ্গদের মাথায় একটা প্রাথমিক ধরনের শুঙ্গ (২২নং চিত্র, a) এবং বৃকে একটা প্রাথমিক ধরনের চূড়া (b) থাকে। এই বিশেষ প্রজাতিটির পুরুষ-পতঙ্গদের বৃকে এই চূড়ার মতন অভিক্ষিপ্ত অংশটি থাকে না ঠিকই, কিন্তু এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের এই অংশটি যে আসলে পুরুষদের পক্ষে উপযুক্ত অভিক্ষিপ্ত অংশেরই একটি প্রাথমিক রূপ মাত্র, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যেমন, বুবাস বাইসন প্রজাতির (Bubas bison—ওনাইটিসদের ঠিক পরের প্রজাতি) স্ত্রী-পতঙ্গদের বৃকেও একইরকম চূড়া থাকে, কিন্তু তাদের পুরুষ-পতঙ্গদের বৃকের ওই জায়গায় থাকে একটা বিরাট অভিক্ষিপ্ত অংশ। একইভাবে, ওনাইটিস ফার্সিফার প্রজাতির এবং এদের সদৃশ আরও দু-তিনটি প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গদের মাথার ওই ছোট্ট বিন্দুটাও (a) যে আসলে পুরুষদের মাথার শুঙ্গেরই প্রাথমিক রূপ, সে-কথাও নিঃসন্দেহেই



২১নং ছবি—ওনাইটিস ফার্সিফার,
পুরুষ-পতঙ্গ (নীচে থেকে
দেখানো হয়েছে)।

২২নং ছবি—বাদিকের ছবিটি ওনাইটিস ফার্সিফার,
পুরুষ-পতঙ্গের (পাশ থেকে দেখানো হয়েছে)।
ডানদিকের ছবিটি ওই প্রজাতিরই স্ত্রী-পতঙ্গের।
a—মাথার শুঙ্গের প্রাথমিক রূপ।
b—বৃকের শুঙ্গ বা চূড়ার চিহ্ন।

বলা চলে। ল্যামেলিকর্ন বর্গের বহু পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যে, যেমন ফ্যানিউস-দের মধ্যে (১৮নং চিত্র), এই ধরনের শুঙ্গ সর্বদাই লক্ষ করা যায়।

একসময় মনে করা হত প্রকৃতির পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্যই প্রাথমিক অঙ্গগুলি সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সে-ধারণাটা একেবারেই প্রযোজ্য নয়, বরং এদের ক্ষেত্রে সাধারণ অবস্থার একটা সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রই খুঁজে পাই আমরা। যথেষ্ট যুক্তিসম্মতভাবেই আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে এদের পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরে একসময় শুঙ্গের অস্তিত্ব ছিল এবং সেটাই প্রাথমিক অঙ্গের আকারে সঞ্চারিত হয়েছে স্ত্রী-পতঙ্গদের মধ্যে—যেমনটা ঘটতে দেখা গেছে ল্যামেলিকর্ন বর্গের অন্য বহু পতঙ্গদের ক্ষেত্রেও। পরবর্তীকালে পুরুষ-পতঙ্গরা কেন তাদের শুঙ্গ হারিয়ে ফেলল, তা আমাদের জানা নেই। তবে এটাকে এক ধরনের ক্ষতিপূরণের নীতির ফল হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে

পারে। অর্থাৎ, শরীরের নীচের অংশে বড় বড় শুষ্ক ও অভিক্রিষ্ট অংশের উদ্ভবের দৃশ্যই তারা তাদের মাথার শুষ্ক হারিয়ে ফেলেছিল। আর এই ব্যাপারটা যেহেতু শুধুমাত্র পুরুষ-পতঙ্গদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, সেহেতু স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরের উর্বাংশে শুষ্কের প্রাথমিক রূপটুকু বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

এতক্ষণ আমরা শুধু ল্যামেলিকর্ন বর্গের পতঙ্গদেরই উদাহরণ দিয়েছি, কিন্তু দুটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর গুবরে-পোকাদের কথাও এখানে বলা দরকার। এই শ্রেণী দুটি হল কারকিউলায়োনিডে (Curculionidae) ও স্ট্যাফাইলিনিডে (Staphylinidae)। এই দুটি শ্রেণীর পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরেও শুষ্ক থাকে। প্রথমোক্তদের শুষ্ক থাকে শরীরের নীচের অংশে আর শেষোক্তদের থাকে মাথার ওপর দিকে ও বৃকে। স্ট্যাফাইলিনিডে শ্রেণীর কিছু কিছু প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের শুষ্কগুলো অত্যন্ত পরিবর্তনশীল ধরনের হয়ে থাকে—ঠিক যেমনটা আমরা দেখেছি ল্যামেলিকর্ন বর্গের ক্ষেত্রেও। সায়াগোনিয়াম-দের (Siagonium) মধ্যে এক ধরনের দ্বিরূপতা লক্ষ করা যায়। এদের পুরুষ-পতঙ্গদেরকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। এই দু-ভাগের পতঙ্গদের শরীরের আকার এবং শুষ্কের বিকাশ পরস্পরের থেকে একেবারেই আলাদা ধরনের হয়, অথচ এই দু-ভাগের অন্তর্বর্তী স্তরের কোনও পুরুষ-পতঙ্গ থাকে না। স্ট্যাফাইলিনিডে শ্রেণীর ব্রেডিয়াস বর্গের (Bledius, ২৩নং চিত্র) একটি



২৩নং ছবি—ব্রেডিয়াস ট্রাস (বড় করে দেখানো হয়েছে)।

বাঁদকের ছবিটি পুরুষ-পতঙ্গের, ডানাদিকের ছবিটি স্ত্রী-পতঙ্গের।

প্রজাতির ব্যাপারে অধ্যাপক ওয়েস্টউড বলেছেন, “একই অঞ্চলে এদের এমন অনেক পুরুষ-পতঙ্গের দেখা মেলে যাদের বৃকের মাথানানের শুষ্কটা অত্যন্ত বড় অথচ মাথার শুষ্কগুলো নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের, আবার ওই একই অঞ্চলে এদের এমন অনেক পুরুষ-পতঙ্গের দেখা মেলে যাদের বৃকের শুষ্কটা যথেষ্টই ছোট কিন্তু মাথার উদ্গত অংশটা (protuberance) বেশ দীর্ঘ।”^{১৩} ওনাইটিসদের পুরুষ-পতঙ্গদের উর্বাংশের শুষ্ক হারানোর ব্যাপারটিকে ক্ষতিগ্রণের যে নীতির সাহায্যে কিছুক্ষণ আগেই আমরা ব্যাখ্যা করেছি, সেই একই নীতি বোধহয় এদের ক্ষেত্রেও তার নিজস্ব নিয়মে কাজ করে গেছে।

১৩। “মডার্ন ক্র্যাশিফিকেশন অফ ইনসেক্টস”, খণ্ড ১, পৃঃ ১৭২ : সায়াগোনিয়াম, পৃঃ ১৭২। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আমি সায়াগোনিয়ামদের একটি পুরুষ-পতঙ্গের নমুনা দেখেছি যেটি অন্তর্বর্তী অবস্থার ছিল। অর্থাৎ এদের পুরুষপতঙ্গটা কোনও বাধাধরা নিয়ম নয়।

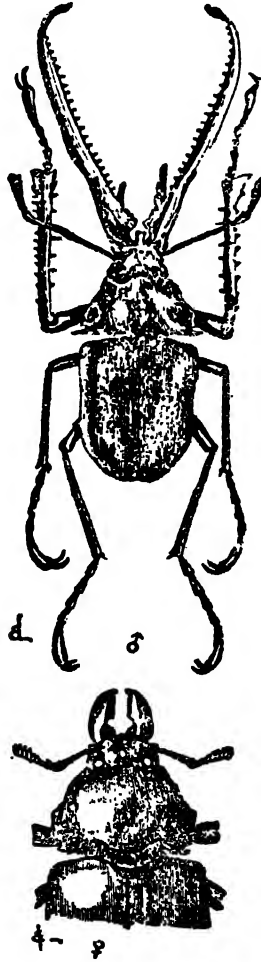
যুদ্ধের নীতি। কিছু কিছু পুরুষ-শুবরেপোকা মারামারি করার ব্যাপারে তেমন পটু না-হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী-পতঙ্গদের দখল করার জন্য অল্প পুরুষ-পোকাদের সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত হয়। মিঃ ওয়ালেস একবার দেখেছিলেন লেপ্টোরিন্থাস অ্যাংগাস্ট্যাটাস (*Leptorhynchus angustatus*—লম্বা ঠোঁটবিশিষ্ট এক ধরনের শুবরে-পোকা, শরীরটা অনেকটা রেখার মতো) প্রজাতির দুটি পুরুষ-পতঙ্গ “একটি স্ত্রী-পতঙ্গকে দখল করার জন্যে নিজের মধ্যে মারামারি করছে আর স্ত্রী-পতঙ্গটি পাশেই দাঁড়িয়ে আপন মনে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে চলেছে। পুরুষ-পতঙ্গ দুটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ঠোঁট দিয়ে পরস্পরকে গোঁতা দিচ্ছে, ঝাঁচড়াচ্ছে, আঘাত করছে।” তবে এদের মধ্যে আকারে ক্ষুদ্রতর পুরুষ-পতঙ্গটি অবশ্য “কিছুক্ষণের মধ্যেই হার মেনে নিয়ে রণে ভঙ্গ দিল।” কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরুষ-শুবরেপোকাদের বড় বড় দাঁতওয়ালা চোয়াল থাকে যা স্ত্রী-পতঙ্গদের চোয়ালের চেয়ে অনেক বড় এবং তাঁর সাহায্যেই তারা নিজের মধ্যে মারামারি করে। সাধারণ স্ট্যাগ-বিটলদের (*Lucanus cervus*) মধ্যে এই ব্যাপারটা লক্ষ করা যায়। এদের পুরুষ-পতঙ্গরা স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে অস্তুত এক সপ্তাহ আগেই পুত্তলি (*pupa*) অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে, ফলে প্রায়শই বেশ কিছু পুরুষ-পতঙ্গকে একটিই স্ত্রী-পতঙ্গের পিছনে ধাওয়া করতে দেখা যায়। এই সময়টায় এরা নিজের মধ্যে কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মিঃ এ. এইচ. ডেভিস একবার দুটি পুরুষ-পতঙ্গকে একটি স্ত্রী-পতঙ্গের সঙ্গে একই বাস্কে রেখে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন আকারে ক্ষুদ্রতর পুরুষ-পতঙ্গটি হার মেনে সরে না-যাওয়া পর্যন্ত আকারে বৃহত্তর পুরুষ-পতঙ্গটি তাকে ক্রমাগত খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল। জর্নৈক বন্ধু আমাকে জানিয়েছেন যে অল্প বয়সে তিনি হামেশাই বেশ কিছু পুরুষ-পতঙ্গকে এক জায়গায় জড়ো করে তাদের মারামারি দেখতেন। সেইসময় তিনি লক্ষ করেছিলেন যে স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে পুরুষ-পতঙ্গরা অনেক বেশি সাহসী ও হিংস্র হয়ে থাকে—যা আমরা উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও লক্ষ করে থাকি। পুরুষ-পতঙ্গদের সামনে তিনি নিজের আঙুল বাড়িয়ে দিলে তারা সেটাকে চেপে ধরত, কিন্তু স্ত্রী-পতঙ্গদের চোয়াল আরও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তারা কখনোই তাঁর আঙুল চেপে ধরার চেষ্টা করত না। লুকানিডে (*Lucanidae*) বর্গের এবং উপরোল্লিখিত লেপ্টোরিন্থাস বর্গের বেশ কিছু প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গরা স্ত্রী-পতঙ্গদের চেয়ে আকারে বড় ও অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। লেথ্রাস সেফ্যালোটাস (*Lethrus cephalotes*—ল্যামেলিকর্ন বর্গের অন্তর্গত একটি প্রজাতি) প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গরা একই গর্তে বসবাস করে এবং এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের তুলনায় পুরুষ-পতঙ্গদের চোয়াল অনেক বড় হয়। সঙ্গের মরসুমে অল্প কোনও পুরুষ-পতঙ্গ ওই গর্তে ঢোকার চেষ্টা

করলে তাকে এক ভয়ংকর আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়। স্ত্রী-পতঙ্গটিও চূপচাপ বসে থাকে না। সে গর্তের মুখটা বন্ধ করে দিয়ে তার সঙ্গীটিকে পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে উৎসাহ যুগিয়ে চলে। হানাদার পুরুষটি নিহত না-হওয়া পর্যন্ত অথবা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত লড়াই বন্ধ হয় না। ল্যামেলিকর্ন বগের আর-একটি প্রজাতি, যাদের নাম হল অ্যাটিউথাস সিকাট্রিকোসাস (*Ateuchus cicatricosus*), তারাও স্ত্রী-পুরুষে জোড় বেঁধে বসবাস করে এবং পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে অচ্যুত হয়ে থাকে। স্ত্রী-পতঙ্গটির মলশিঙের মধ্যে ডিম্বাণুটি সংরক্ষিত থাকে এবং সেই পিণ্ডটি গুটিয়ে তোলার জন্য পুরুষ-পতঙ্গটি তাকে উত্তেজিত করে তোলে। স্ত্রী-পতঙ্গটিকে সরিয়ে নিলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পুরুষটি। আবার পুরুষ-পতঙ্গটিকে সরিয়ে নিলে স্ত্রী-পতঙ্গটি সমস্ত কাজকর্ম ত্যাগ করে, এবং, মিংকলেরির মতে, মারা না-যাওয়া পর্যন্ত ওই একই জায়গায় সে বসে থাকে চূপচাপ।

পুরুষ-লুকানিডেদের বড় বড় চোয়াল থাকে এবং এই চোয়ালগুলোর আকার ও গঠনকাঠামো উভয়ই অত্যন্ত পরিবর্তনশীল ধরনের হয়—ঠিক ল্যামেলিকর্ন ও স্ট্যাফাইলিনিডে বগের বহু প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের মাথার ও বৃকের শুঙ্গের মতোই। এদের সবথেকে বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত পুরুষ-পতঙ্গদের থেকে শুরু করে সবথেকে কম সুবিধাপ্রাপ্ত পুরুষ-পতঙ্গ পর্যন্ত সবাইকে পরপর সাজালে নিখুঁত একটা ক্রম রচনা করা যায়। সাধারণ স্ট্যাগ-বিটলদের এবং সম্ভবত অল্প আরও কিছু প্রজাতির পতঙ্গদের চোয়ালগুলো যুদ্ধ করার পক্ষে খুব উপযুক্ত অস্ত্র ঠিকই, কিন্তু সেইজন্যই চোয়ালগুলোর আকার অত বড় কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমরা আগেই দেখেছি যে উত্তর আমেরিকার লুকানাস ইলেকাস প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের চোয়ালটা কাজে লাগে স্ত্রী-পতঙ্গদের আঁকড়ে ধরার জন্য। এই চোয়ালগুলো অত্যন্ত নজরকাড়া ধরনের এবং অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিভক্ত হয় এবং বেশি লম্বা হওয়ার জন্য এগুলো চাপ দেওয়ার পক্ষে খুব উপযুক্ত হয় না। এইসব তথ্য থেকে বিচার করে আমার মনে হয়েছে যে এগুলো হয়তো তাদের অঙ্গসজ্জা হিসেবেও কাজ করে থাকে—ঠিক যেমনভাবে বিভিন্ন প্রজাতির পতঙ্গদের মাথার ও বৃকের শুঙ্গগুলো তাদের অঙ্গসজ্জা হিসেবে কাজ করে। এই একই বগের অন্তর্ভুক্ত আর-একটি চমৎকার পতঙ্গের কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। এরা হল দক্ষিণ চিলির চিয়াসোগ্নাথাস গ্রান্টি (*Chiasognathus grantii*)। এদের পুরুষ-পতঙ্গদের বিশাল মাপের চোয়াল থাকে (২৪নং চিত্র)। এরা রীতিমতো সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয় হয়। কেউ ভয় দেখালে এরা ঘুরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোয়ালগুলো ফাঁক করে দেয় এবং সেইসঙ্গেই জোরে জোরে শব্দ করতে থাকে। তবে মাহুঘের আঙুলে চাপ দিয়ে ব্যথা সৃষ্টি করার মতো জোর এদের চোয়ালে

থাকে না। এটা আমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখেছি।

যৌন নির্বাচন, যার জন্য প্রয়োজন হয় উপলব্ধির পর্যাপ্ত শক্তি ও প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তা গুবরে-পোকাদের অন্য যে-কোনও বর্গের তুলনায় ল্যামেলি-কর্নদের মধ্যেই সবথেকে বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। কয়েকটি



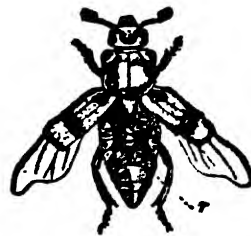
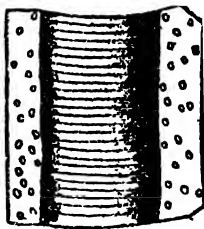
২৪নং ছবি—চিয়ানোগ্‌ন্যাথাস গ্র্যান্ডি (ছোট করে দেখানো হয়েছে)।

ওপরের ছবিটি পুরুষ-পতঙ্গের, নীচের ছবিটি স্ত্রী-পতঙ্গের।

প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরে বৃদ্ধ করার অস্ত্র থাকে, কিছু প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী-পতঙ্গরা জোড় বেঁধে বাস করে এবং পরস্পরের প্রতি অস্থির হয়, অনেক প্রজাতির পতঙ্গরা উত্তেজিত হয়ে উঠলে শব্দ সৃষ্টি করতে পারে, বেশ কিছু প্রজাতির 'পতঙ্গদের শরীরে অত্যন্ত বিষ্ময়কর ধরনের শুদ্ধ থাকে যা আপাতভাবে তাদের' অঙ্গসজ্জা হিসেবেই কাজ করে, আবার শুধু দিনের

আলোয় চলাচলকারী কিছু প্রজাতির পতঙ্গদের শরীরে নানারকম জেজ্বাদার রঙ থাকে। শেষত, গুবরে-পোকাদের মধ্যে আকারে বৃহত্তম বেশ কিছু প্রজাতির পতঙ্গরা এই বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত। লিনিয়াস এবং ফ্যাব্রিসিয়াস এই বর্গটিকে এই শ্রেণীটির একবারে প্রথমে স্থান দিয়েছিলেন।

শব্দসৃষ্টিকারী অঙ্গ। পৃথক পৃথক বর্গের অন্তর্ভুক্ত বহু ধরনের গুবরে-পোকাদের শরীরেই এই অঙ্গের অস্তিত্ব থাকে। এদের এই শব্দ অনেক সময় বেশ কয়েক ফুট, এমনকি বেশ কয়েক গজ দূর থেকেও শোনা যায় বটে, তবে তা কিছুতেই অর্ধোপ্টেরা বর্গের পতঙ্গদের দ্বারা সৃষ্ট শব্দের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এদের শরীরের উথার মতো অংশটায় থাকে একটা সরু ও ঈষৎ-উঁচু তল এবং তার ওপর আড়াআড়িভাবে থাকে খুব সূক্ষ্ম ও সমান্তরাল কিছু পঞ্জরাস্থি (rib)। কখনও-কখনও এই পঞ্জরাস্থিগুলো এতই সূক্ষ্ম হয় যে তা থেকে নানারকম রঙ দেখা যায় এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এই পঞ্জরাস্থিগুলোকে দেখতেও খুব চমৎকার লাগে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, সেমন টাইফিউস মাইনিউট (Typhoeus minute) প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে, দেখা যায় যে ওই উখাতুল্য অঙ্গের পঞ্জরাস্থিগুলোর মধ্যে দিয়ে সরু সরু চুল বা আঁশের মতো কিছু অভিক্ষিপ্ত উপাদান চলে গেছে এবং ওই চুল বা আঁশগুলো দিয়েই ওই অঙ্গের চারপাশের সবটা অঞ্চল প্রায় সমান্তরাল রেখার মতো করে ঢাকা পড়ে থাকে। এই চুল বা আঁশগুলো একত্রে মিলিত ও সোজা হয়ে ওঠার ফলে এবং সেইসঙ্গেই আরও অভিক্ষিপ্ত ও মসৃণ হয়ে ওঠার ফলেই এগুলোর পক্ষে ওই পঞ্জরাস্থিগুলোর মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব হয়। এদের শরীরের সংলগ্ন অংশে একটা শক্ত অঞ্চল থাকে যেটা ওই উখাটির বর্ষক হিসেবে কাজ করে, তবে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে এই বর্ষকটিকে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষভাবে পরিবর্তিত হতেও দেখা গেছে। এই বর্ষকটি দ্রুত উখাটির ওপর দিয়ে চলে যায় অথবা উখাটিই দ্রুত চলে যায় বর্ষকটির ওপর দিয়ে।



২৬নং ছবি—নেকোফোরাস (ল্যান্ডোয়ার গ্রন্থ থেকে নেওয়া)।

r—দাঁট উখা।

বান্দকের ছবিটিতে উখার একটি অংশকে অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে।

বিভিন্ন প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে এই অঙ্গুলো শরীরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত থাকে। শবভোজী বা ক্যারিয়ন-বিটলদের (*Necrophorus*) শরীরে পেটের পঞ্চম অংশের পৃষ্ঠতলের ওপরে দুটো সমান্তরাল উখাতুল্য অঙ্ক (১—২৫নং চিত্র) থাকে, প্রতিটি উখায় ১২৬ থেকে ১৪০টি পর্বন্ত স্তম্ভ পঞ্জরাঙ্ক থাকে। এই পঞ্জরাঙ্কগুলো সামনের ডানার পিছনের দিকে বসিত হয়, যে ডানাগুলোর একটা ছোট অংশ এদের সাধারণ দেহরেখা থেকে একটু বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে। ক্রিওসেরিডে (*Crioceridae*) বর্গের বহু পতঙ্গদের মধ্যে এবং ক্লাইথ্রা ৪-পাংকুটাটা (*Clythra 4-punctata*)—গ্রাইসোমেলিডে বর্গের একটি প্রজাতি) প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে এবং টেনেব্রায়োনিডে (*Tenebrionidae*) ইত্যাদি বর্গের^{১৪} কিছু প্রজাতির পতঙ্গদের শরীরে উখাটি থাকে পেটের পৃষ্ঠদেশীয় চূড়ায়, পাইজিডিয়াম (*Pygidium*) বা প্রো-পাইজিডিয়াম-এর ওপরে, এবং এটিও একইভাবে সামনের ডানার ওপরে বসিত হয়। অত্র একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হেটেরো-সেরাস-দের (*Heterocerus*) শরীরে উখাটি থাকে পেটের প্রথম অংশের পাশে এবং সেটি উর্বাহির প্রান্তরেখার সঙ্গে বসিত হয়। কারকিউলায়োনিডে (*Curculionidae*) ও ক্যারাবিডে (*Carabidae*)^{১৫} বর্গের কিছু পতঙ্গের শরীরে এই অঙ্গুলো সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে থাকে। এদের উখাতুল্য অঙ্কটা থাকে সামনের ডানার নীচের দিকে, তাদের চূড়ার কাছাকাছি অঞ্চলে অথবা তার বাইরের কিনারা বরাবর, এবং পেটের অংশগুলোর প্রান্তসমূহই এই উখাটির বর্ষক হিসেবে কাজ করে থাকে। পেলোবিয়াস হারমানি-দের

১৪। এই তিনটি বর্গের এবং অন্যান্য শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের গুবরে-পোকাদের বহু নমুনা পাঠিয়ে সাহায্য করার জন্য মিঃ জি. আর. ক্রচ-এর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। নানারকম মূল্যবান তথ্য বৃগিরেও তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। মিঃ ক্রচ-এর মতে, ক্লাইথ্রা-দের যে শব্দ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে, সেটা এর আগে আর কেউ লক্ষ করেননি। মিঃ ই. ডারউইন-এর জ্যানসন-ও আমাকে বহু তথ্য ও নমুনা বৃগিরে সাহায্য করেছেন। এইসঙ্গে আমার পুত্র মিঃ এফ. ডারউইন-এর নামটাও উল্লেখ করা যায়। সে দেখেছিল ডারমেস্টেস মিউরিনাস (*Dermestes murinus*) প্রজাতির পতঙ্গরা শব্দ সৃষ্টি করতে সক্ষম, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে তাদের শরীরের শব্দসৃষ্টির অঙ্কটা আবিষ্কার করতে পারেনি। ডঃ চ্যাপম্যান সম্প্রতি জানিয়েছেন যে স্কোলিটাস-রাও (*Scolytus*) শব্দ সৃষ্টি করতে সক্ষম (দ্রষ্টব্য, “এনটো-মোলজিস্ট”স্, মার্চাল ম্যাগাজিন”, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৩০)।

১৫। এই দুটি শ্রেণীর এবং অন্যান্য শ্রেণীর পতঙ্গদের শব্দসৃষ্টিকারী অঙ্গের বর্ণনা দিচ্ছেন ওরেন্ডার (ক্রায়, “*Naturhist Tidskrift*”, খণ্ড ২, ১৮৪৯, পৃঃ ৩০৪)। মিঃ ক্রচ আমার কাছে ক্যারাবিডে বর্গের অন্তর্ভুক্ত ইলফ্রাস ইউলিগিনোসাস (*Elaphrus uliginosus*) ও ব্লেথিসা মাল্টিপাংকুটাটা (*Blethisa multipunctata*) প্রজাতির পতঙ্গদের নমুনা পাঠিয়েছিলেন। আমি তাদের পরীক্ষা করে দেখেছি। ব্লেথিসাদের ক্ষেত্রে পেটের অংশের খাঁজ-কাটা পার্শ্বদেশে অবস্থিত আড়াআড়ি প্রান্তরেখাগুলো উখাটিকে সামনের ডানার ওপরে ঘষার ব্যাপারে কোনও কাজে লাগে না—অন্তত আমি সে-রকম কিছু লক্ষ করিনি।

(*Pelobius Hermannii*—ডাইটিসকিডে বা জলচর গুবরে-পোকাদের একটি প্রজাতি) ক্ষেত্রে একটি শক্ত প্রান্তরেখা তাদের সামনের ডানার অস্থিসন্ধির (sutural) কিনারার কাছ দিয়ে এবং তার সমান্তরালে লম্বালম্বিভাবে এগিয়ে যায়, তার ওপরে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত থাকে পঞ্জরাস্থিগুলো। এই পঞ্জরাস্থিগুলোর মধ্যভাগ একটু স্থূল হয় কিন্তু উভয় প্রান্তেই ক্রমান্বয়ে হৃদয় থেকে হৃদয়তর হয়ে যায়—বিশেষত ওপরের দিকটায়। এই পতঙ্গটিকে জলের নীচে বা ওপরের বাতাসে চেপে ধরলে এরা শব্দ করতে শুরু করে। পেটের অত্যন্ত শক্ত প্রান্তভাগটা উথার সঙ্গে ঘষিত হওয়ার ফলেই এই শব্দটা সৃষ্টি হয়ে থাকে। দীর্ঘ শুষ্কবিশিষ্ট গুবরে-পোকাদের (*Longicornia*) অনেকের শরীরেই শব্দসৃষ্টির অঙ্গটা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এদের উথাটা থাকে বৃকের মধ্য অংশে এবং সেটি ঘষিত হয় বৃকের একেবারে সামনের অংশের ওপরে। ল্যাণ্ডোয়া গুনে দেখেছিলেন—সেরাম্বিক্স হেরস (*Cerambyx heros*) প্রজাতির পতঙ্গদের উথায় মোট ২৩৮টি অতি হৃদয় পঞ্জরাস্থি থাকে।

ল্যামেলিকর্ন বর্গের অনেক পতঙ্গেরই শব্দ সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে এবং এদের বিভিন্ন প্রজাতির শব্দসৃষ্টির অঙ্গের অবস্থানে ব্যাপক পার্থক্য থাকে। কয়েকটি প্রজাতির পতঙ্গরা খুব উঁচু পর্দার শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। মিঃ এফ. স্মিথ একবার ট্রক্স স্টাবুলোসাস (*Trox sabulosus*) প্রজাতির একটি পতঙ্গকে ধরেছিলেন। সেটি এত জোরে শব্দ করতে শুরু করেছিল যে থানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা জর্নৈক বনরক্ষী ভেবেছিল মিঃ স্মিথ বোধহয় একটা ইঁদুরকে ধরেছেন। তবে এই প্রজাতির পতঙ্গদের শব্দসৃষ্টির অঙ্গটা আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। জিওট্রুপেস (*Geotrupes*) ও টাইফিউস-দের



২৬নং ছবি—জিওট্রুপেস স্টারকোরারিয়াস প্রজাতির পতঙ্গদের পিছনের পা (ল্যাংডোরার গ্রন্থ থেকে নেওয়া)।

r—উথা ; c—নিতম্ব ; f—উর্বাস্থি ;

t—জঘাস্থি ; tr—গুলাফ।

(Typhoeus) ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিটি পিছনের পায়ের (জিওট্রুপেস স্টারকোরারিয়াস-দের এই পা-গুলোতে ৮৪টি করে অস্থি থাকে) নিম্নভাগের ওপর দিয়ে একটা সরু প্রান্তরেখা তির্যকভাবে এগিয়ে গেছে (১, ২৬নং চিত্র)। এই প্রান্তরেখাটির সঙ্গে পেটের একটি অত্যধিক অভিক্ষিপ্ত অংশের বর্ষণ হওয়ার ফলেই শব্দ সৃষ্টি হয়। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত কোপ্রিস লুনারিস (Coprion lunaris) প্রজাতির পতঙ্গদের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা অত্যন্ত সরু ও হৃৎ উখাতুল্য অঙ্গ সামনের ডানার অস্থিসন্ধির কিনারা বরাবর এগিয়ে গেছে, সেইসঙ্গেই শরীরের নীচের দিকের বহিঃস্থ কিনারা বরাবর রয়েছে আর-একটা ছোট উখাতুল্য অংশ। লেকন্টে (Leconte) বলেছেন—কোপ্রিনি বর্গের কিছু প্রজাতির পতঙ্গদের শরীরে এই উখাটা পেটের পৃষ্ঠতলে অবস্থিত থাকে। ওরিক্টেস-দের (Oryctes) ক্ষেত্রে এই উখাটা থাকে প্রো-পাইজিডিয়াম-এর (pro-pygidium) ওপরে। পতঙ্গবিজ্ঞানী লেকন্টে আরও জানিয়েছেন যে ডাইনাসটিনি (Dynastini) বর্গের কিছু পতঙ্গের এই উখাটা থাকে সামনের ডানার নীচের দিকে। শেষত, ওয়েস্টরিং বলেছেন যে ওমালোপ্লিয়া ব্রুনিয়া (Omaloplia brunnea) প্রজাতির পতঙ্গদের উখাটা থাকে সামনের বক্ষাস্থির (pro-sternum) ওপরে এবং বর্ষকটি থাকে মাঝের বক্ষাস্থির (meta-sternum) ওপরে। অর্থাৎ এদের এই অঙ্গগুলো থাকে শরীরের নীচের দিকে, লংগিকর্নদের মতো শরীরের ওপরদিকে থাকে না।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোলিওপ্টেরা শ্রেণীর বিভিন্ন বর্গের পতঙ্গদের শব্দসৃষ্টির অঙ্গগুলো শরীরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকে ঠিকই, কিন্তু সেগুলোর গঠনকাঠামোর মধ্যে খুব-একটা পার্থক্য থাকে না। একই শ্রেণীর কিছু কিছু পতঙ্গ এইসব অঙ্গগুলোর অধিকারী হয়, আবার অনেকের শরীরে এই অঙ্গ আদৌ থাকে না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে একেবারে প্রথমে বিভিন্ন ধরনের গুবরে-পোকারা তাদের শরীরের কোনও-কোনও শক্ত ও কক্কশ অংশকে (যেগুলো একে অপরের স্পর্শসীমার মধ্যে থাকত) পরস্পরের সঙ্গে ঘষে এক ধরনের খসখস বা হিসহিস শব্দ সৃষ্টি করত এবং এইভাবে সৃষ্ট শব্দটা তাদের পক্ষে কোনও-না-কোনও ভাবে উপযোগী ছিল বলে শরীরের ওই কক্কশ অংশগুলোই ক্রমাগত শব্দসৃষ্টিকারী অঙ্গে পরিণত হয়েছে—তাহলে এদের এই অঙ্গের বিভিন্নতার কারণটা বুঝে নিতে কোনও অসুবিধে হয় না। অনেক ধরনের গুবরে-পোকারদের শরীরে শব্দসৃষ্টির যথাযথ অঙ্গ না-থাকা সত্ত্বেও চলাফেরা করার সময় তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে এক ধরনের খসখস শব্দ সৃষ্টি করে থাকে। মিঃ ওয়ালেস আমাকে জানিয়েছেন যে ইউচিরাস লংগিম্যানাস (Euchirus longimanus) —ল্যামেলিকর্ন বর্গের একটি পতঙ্গ, এদের পুরুষদের সামনের পা-গুলো

অত্যন্ত দীর্ঘ হয়) প্রজাতির পতঙ্গরা “চলাফেরা করার সময় পেটের সঙ্কোচন ও প্রসারণের সাহায্যে এক ধরনের নিচু হিস্‌হিস্‌ শব্দ সৃষ্টি করে থাকে। এদেরকে চেপে ধরলে এরা পিছনের পা-গুলোকে সামনের ডানার কিনারায় ঘষে এক ধরনের খরখর শব্দ করতে থাকে।” সামনের প্রতিটি ডানার অস্থিসন্ধির কিনারা দিয়ে একটি সরু উখাতুল্য অঙ্গ চলাচল করে বলেই যে ওই হিস্‌হিস্‌ শব্দটা সৃষ্টি হয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। উৰাছির খস্‌খসে উপরিতলটিকে সন্নিহিত সামনের ডানার কণাময় কিনারায় ঘষলে খরখর শব্দটাও উৎপন্ন হবে। তবে এদের শরীরে ওই উখাটির অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি আমি। এত বড় মাপের একটা পতঙ্গের শরীরে ওই অঙ্গটা থাকলে সেটা কিছুতেই আমার নজর এড়িয়ে যেতে পারত না। সাইচ্রাস (Cychrus) বর্গের পতঙ্গদের পরীক্ষা করার পর এবং এদের সম্বন্ধে ওয়েস্টরিং-এর রচনাটি পড়ার পর আমার মনে গভীর সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে এদের শরীরে কোনও উখাতুল্য অঙ্গ আদৌ থাকে কিনা। তবে এরাও যে এক ধরনের শব্দ সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

অর্থোপ্টেরা এবং হোমোপ্টেরা-দের দৃষ্টান্ত সামনে থাকার দরুন আমি আশা করেছিলাম যে কোলিওপ্টেরা-দের মধ্যেও স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গদের শব্দসৃষ্টির অঙ্গগুলো পৃথক পৃথক ধরনের হবে। কিন্তু এদের বেশ কিছু প্রজাতিকে পরীক্ষা করে দেখার পরেও এ ধরনের কোনও পার্থক্যের অস্তিত্ব ল্যাণ্ডোয়ার চোখে পড়েনি। ওয়েস্টরিং-ও এ-রকম কোনও পার্থক্য লক্ষ করেননি। মিঃ জি. আর ক্রচ, যিনি অল্পগ্রহ করে বহু প্রজাতির পতঙ্গদের নমুনা পাঠিয়ে আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন, তিনিও এ ধরনের কোনও পার্থক্যের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। তবে এইসব অঙ্গের মধ্যকার পার্থক্যটা খুব সামান্য হলে সেটা খুঁজে পাওয়া নিতান্তই দুর্লব, কারণ এই অঙ্গগুলো অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। যেমন, নেক্রোফোরাস হিউমেটর (Necrophorus humator) এবং পেলোবিয়াস-দের প্রথম যে দুটি জোড়াকে আমি পরীক্ষা করেছিলাম, তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পতঙ্গটির তুলনায় পুরুষ-পতঙ্গটির শরীরের উখাতুল্য অঙ্গটি অনেক বড় ছিল, কিন্তু এই দুটি প্রজাতির অল্প জোড়াগুলির ক্ষেত্রে এ-রকম কোনও পার্থক্য আমার নজরে পড়েনি। জিওটুপেস স্টারকোরারিয়াস প্রজাতির তিনটি স্ত্রী-পতঙ্গের তুলনায় তিনটি পুরুষ-পতঙ্গের উখাতুল্য অঙ্গগুলিকে স্থূলতর, অনচ্ছতর ও অধিক অভিক্ষিপ্ত বলে মনে হয়েছিল আমার। এদের স্ত্রী-পুরুষের শব্দসৃষ্টির ক্ষমতায় কোনও পার্থক্য আছে কিনা খুঁজে দেখার জন্য আমার পুত্র মিঃ এফ. ডারউইন এদের সাতাশটি জীবন্ত নমুনা সংগ্রহ করেছিল। এদেরকে একইভাবে চেপে ধরলে এরা একটা শব্দ করত। সেই শব্দের জোর কম না বেশি, সেই অল্পস্বাভাবিক

এদেরকে সে দু'ভাগে ভাগ করে। অতঃপর ওই সাতারটি নমুনাকে পরীক্ষা করে সে দেখে যে দুটো ভাগেই স্ত্রী আর পুরুষ-পতঙ্গের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। মিঃ এফ. স্মিথ মোনোইন্থাস সিউডাকোরি (*Monoyncbus pseudacori*—কারকিউলায়োনিডে বর্গের অন্তর্ভুক্ত) প্রজাতির অসংখ্য পতঙ্গকে জীবন্ত অবস্থায় ধরেছেন। তাঁর মতে, এদের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই শব্দ সৃষ্টি করে এবং সেই শব্দের জোরও প্রায় একইরকম।

তা সত্ত্বেও এটা নিশ্চিত যে কোলিওপ্টেরা বর্গের কিছু কিছু পতঙ্গদের ক্ষেত্রে এই শব্দসৃষ্টির ক্ষমতাটা একটা লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য হিসেবেই বিद्यমান থাকে। মিঃ ক্রচ দেখেছিলেন যে হেলিওপ্যাথেস (*Heliopathes*—টেনেত্রায়োনিডে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত) বর্গের দুটি প্রজাতির শুধুমাত্র পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরেই শব্দসৃষ্টিকারী অঙ্গ থাকে। এইচ. গিব্বাস (*H. gibbus*) প্রজাতির পাঁচটি পুরুষ-পতঙ্গকে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম আমি। এদের প্রত্যেকেরই পেটের একেবারে শেষ অংশটার পৃষ্ঠতলে একটা করে স্রবিকশিত উখা ছিল এবং প্রত্যেকেরই উখাটা কিছুটা দু'ভাগে ভাগে ভাগ হওয়া অবস্থায় ছিল। আবার এই প্রজাতিরই পাঁচটি স্ত্রী-পতঙ্গকে পরীক্ষা করে তাদের কারুর শরীরেই উখার চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাইনি আমি, বরং দেখেছিলাম তাদের পেটের ওই অংশের ঝিল্লিগুলো স্বচ্ছ এবং পুরুষ-পতঙ্গদের তুলনায় অনেক পাতলা। এইচ. ক্রিট্রাটোস্ট্রিয়াটাস (*H. Cribratostriatus*) প্রজাতির পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরেও ওই উখাটা থাকে, তবে সেটা দু'ভাগে ভাগ হওয়া অবস্থায় থাকে না, আর এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরে এই অঙ্গটা আদৌ থাকে না। তাছাড়াও এদের পুরুষ-পতঙ্গদের সামনের ডানাগুলোর চূড়ার দিকে, অস্থিসন্ধির উভয় দিকে, তিন-চারটি ছোট ছোট ও লম্বালম্বি শক্ত প্রান্তরেখা থাকে, তার ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে চলে যায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিছু পঞ্জরাস্থি যেগুলো তাদের পেটের উখায় থাকা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অস্থিগুলোর সমতুল ও সমান্তরাল। এই প্রান্তরেখাগুলো একটা আলাদা উখা হিসেবে কাজ করে নাকি পেটের উখাটির ঘর্ষক হিসেবে কাজ করে, তা আমি নির্ণয় করে উঠতে পারিনি। এদের স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরে এই ধরনের কোনও প্রান্তরেখার চিহ্নমাত্রও থাকে না।

আবার, ল্যামেলিকর্ন বর্গের ওরিক্টেস-দের (*Oryctes*) তিনটি প্রজাতির মধ্যেও প্রায় একইরকম ঘটনা লক্ষ করা যায়। ও. গ্রাইফাস (*O. gryphus*) এবং ন্যাসিকরনিস (*Nasicornis*) প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গদের প্রো-পাইজিডিয়ামে অবস্থিত উখার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অস্থিগুলো পুরুষ-পতঙ্গদের অস্থির মতো অতটা ঘনসংবদ্ধ নয় এবং অতটা স্পষ্টভাবে সেগুলোকে বোঝাও যায় না। তবে প্রধান পার্থক্যটা অঙ্গ—উপযুক্ত আলোয় ধরলে দেখা যায় যে স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরের

এই অংশের পুরো উপরিতলটা রোমে ঢাকা, অল্পদিকে পুরুষ-পতঙ্গদের শরীরে এ-রকম কোনও রোম থাকে না অথবা থাকলেও তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধরনের হয়ে থাকে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, কোলিওপ্টেরা বর্গের কোনও পতঙ্গেরই উথার সক্রিয় অংশে রোমের চিহ্নমাত্রও থাকে না। ও. সেনেগালেন্সিস (*O. Senegalensis*) প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গদের মধ্যকার পার্থক্যটা আরও সুস্পষ্ট। এদের পেটের ওই অংশটাকে পরিষ্কার করে একটি স্বচ্ছ বস্তু হিসাবে দেখলে এই পার্থক্যটা সবথেকে ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়। স্ত্রী-পতঙ্গদের শরীরের এই গোটা অঞ্চলটা জুড়ে ছোট ছোট ও পৃথক পৃথক চূড়া থাকে এবং তাতে কিছু কীটা জাতীয় অংশ থাকে। অল্পদিকে, পুরুষ-পতঙ্গদের এই চূড়াগুলো যতই আগা-র দিকে এগোয় ততই বেশি বেশি করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়, সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে এবং তাতে কীটা জাতীয় কোনও বস্তু থাকে না। এদের এই অংশের তিন-চতুর্থাংশই ঢাকা থাকে অতি সূক্ষ্ম ও সমান্তরাল কিছু অস্থির ঝারা, অল্পদিকে স্ত্রী-পতঙ্গদের এই অংশে আদৌ কোনও অস্থি থাকে না। তবে ওরিক্টেস-দের এই তিনটি প্রজাতিরই স্ত্রী-পতঙ্গদের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে থেকে একটু নরম শরীরবিশিষ্ট স্ত্রী-পতঙ্গদের বেছে নিয়ে তাদের পেটে সামনে-পেছনে চাপ দিলে এক ধরনের খরখরে বা কর্কশ শব্দ উৎপন্ন হয়—অবশ্য সে শব্দটা নিতান্তই ক্ষীণ।

হেলিওপ্যাথেস এবং ওরিক্টেস-দের ব্যাপারে একটা কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে—এদের পুরুষ-পতঙ্গরা শব্দ সৃষ্টি করে স্ত্রী-পতঙ্গদের ডাকার জন্য অথবা তাদের উত্তেজিত করে তোলার জন্য। কিন্তু অল্প অধিকাংশ গুবরে-পোকাদের ক্ষেত্রে এই শব্দটা উভয় লিঙ্গের সদস্যদের কাছেই পরস্পরকে আহ্বান করার উপায় হিসেবেই কাজ করে থাকে। গুবরে-পোকারা তাদের বিভিন্ন ধরনের আবেগের প্রেরণায় শব্দ সৃষ্টি করে, ঠিক যেমন পাখিরা তাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের গান শোনানোর পাশাপাশি আরও নানান উদ্দেশ্যে নিজেদের কর্ণকে ব্যবহার করে থাকে। চিয়াসোগ্‌থাথাস-রা শব্দ করে ফুঁদে হলে কিংবা কাউকে যুদ্ধে আহ্বান করার জন্য। অনেক প্রজাতির পতঙ্গরা পালানোর পথ বন্ধ বলে বুঝতে পারলে ভয়ে অথবা মর্মপিড়ায় শব্দ করতে শুরু করে। ক্যানারি ঝাঁপপুঞ্জ গিয়ে মিঃ ওলান্টন ও মিঃ ক্রচ শব্দ শুনে গাছের ফাঁপা গুঁড়িতে আশ্রয় করেছিলেন এবং সেখানে তাঁরা অ্যাকালেস (*Acalles*) বর্গের গুবরে-পোকাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। শেষত, অ্যাটিউথাস (*Ateuchus*) বর্গের পুরুষ-পতঙ্গরা তাদের স্ত্রী-পতঙ্গদেরকে কাজে উৎসাহ যোগানোর জন্য এবং স্ত্রী-পতঙ্গটিকে ওখান থেকে সরিয়ে নিলে হতশায় শব্দ করে থাকে। কিছু কিছু প্রকৃতিবিজ্ঞানীর মতে, গুবরে-পোকারা এই শব্দটা করে থাকে তাদের শত্রুদের ভয় দেখিয়ে দূরে সরানোর জন্য। কিন্তু

কোনও চতুষ্পদ প্রাণী অথবা পাখি, যারা যে-কোনও বৃহদাকার গুবরে-পোকাকেও অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারে, তারা এই সামান্য শব্দে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করার কোনও কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। এই শব্দটা যে আসলে একটা যৌন আহ্বান হিসেবেই কাজ করে, এই মতটি সমর্থিত হয় একটি বিশেষ তথ্যের সাহায্যে—মরণ-পোকা বা ডেথ-টিক-রা (*Anobium tessellatum*) পরস্পরের টিক্‌টিক্‌ শব্দের উত্তর দেয়, এবং আমি নিজের কানে শুনেছি যে এরা একটা কৃত্রিম শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। মিঃ ডাব্লুডে-ও আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি অনেক সময় এদের কোনও স্ত্রী-পতঙ্গকে টিক্‌টিক্‌ শব্দ করতে শুনেছেন^{১৬} এবং দু-এক ঘণ্টা পরে দেখেছেন সেই স্ত্রী-পতঙ্গটি কোনও পুরুষ-পতঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, এমনকি একবার তিনি দেখেছিলেন স্ত্রী-পতঙ্গটির চারপাশে বেশ কিছু পুরুষ-পতঙ্গ এসে জুটেছে। অবশেষে বলা যায় যে বিভিন্ন ধরনের গুবরে-পোকাদের স্ত্রী ও পুরুষ-পতঙ্গরা হয়তো প্রথমে পরস্পরকে খুঁজে বার করত তাদের শরীরের সংলগ্ন শব্দ অংশগুলোর পারস্পরিক ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট ক্ষীণ শব্দটুকুর সাহায্যেই, এবং যে-সব পুরুষ বা স্ত্রী-পতঙ্গরা সবথেকে বেশি শব্দ সৃষ্টি করতে পারত তাদের বরাতেই সবথেকে ভাল সঙ্গিনী বা সঙ্গী জুটত, অতঃপর তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের কুঞ্জনগুলো যৌন নির্বাচন মারফত ক্রমাগত সত্যিকারের শব্দ-সৃষ্টিকারী অঙ্গে পরিণত হয়েছে—এমনটা হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়।

১৬। মিঃ ডাব্লুডে-র মতে, “পতঙ্গটি প্রথমে পারে ভর দিয়ে বতটা সম্ভব উঁচুতে তোলে নিজেকে, তারপর যে জিনিসটার ওপরে সে বসে আছে সেই জিনিসটার গায়ে নিজের বুক দিয়ে পরপর পাঁচ-ছ’বার আঘাত করে। এর ফলেই সৃষ্টি হয় শব্দটা।” এ বিষয়ে আরও জানার জন্য দ্রুটবা, ল্যাডেভার, “*Zeitschrift für wissen. Zoolog.*”, খণ্ড ১৭, পৃঃ ১৮১। অলিভেরের বলেছেন (কার্ণি এবং স্পেন্স কর্তৃক “*Introduct.*”, খণ্ড ২, পৃঃ ৩৯৫-তে উদ্ধৃত) যে পিমেলিয়া স্ট্রিয়াটা (*Pimelia striata*) প্রজাতির স্ত্রী-পতঙ্গরা কোনও শব্দ জিনিসের ওপর নিজেকে পেট দিয়ে আঘাত করে বেশ উচ্চ শব্দ সৃষ্টি করে থাকে, “আর তাদের এই ডাকে সাড়া দিয়ে দ্রুতই ছুটে আসে পুরুষ-পতঙ্গরা। অতঃপর তারা মিলিত হয়।”

